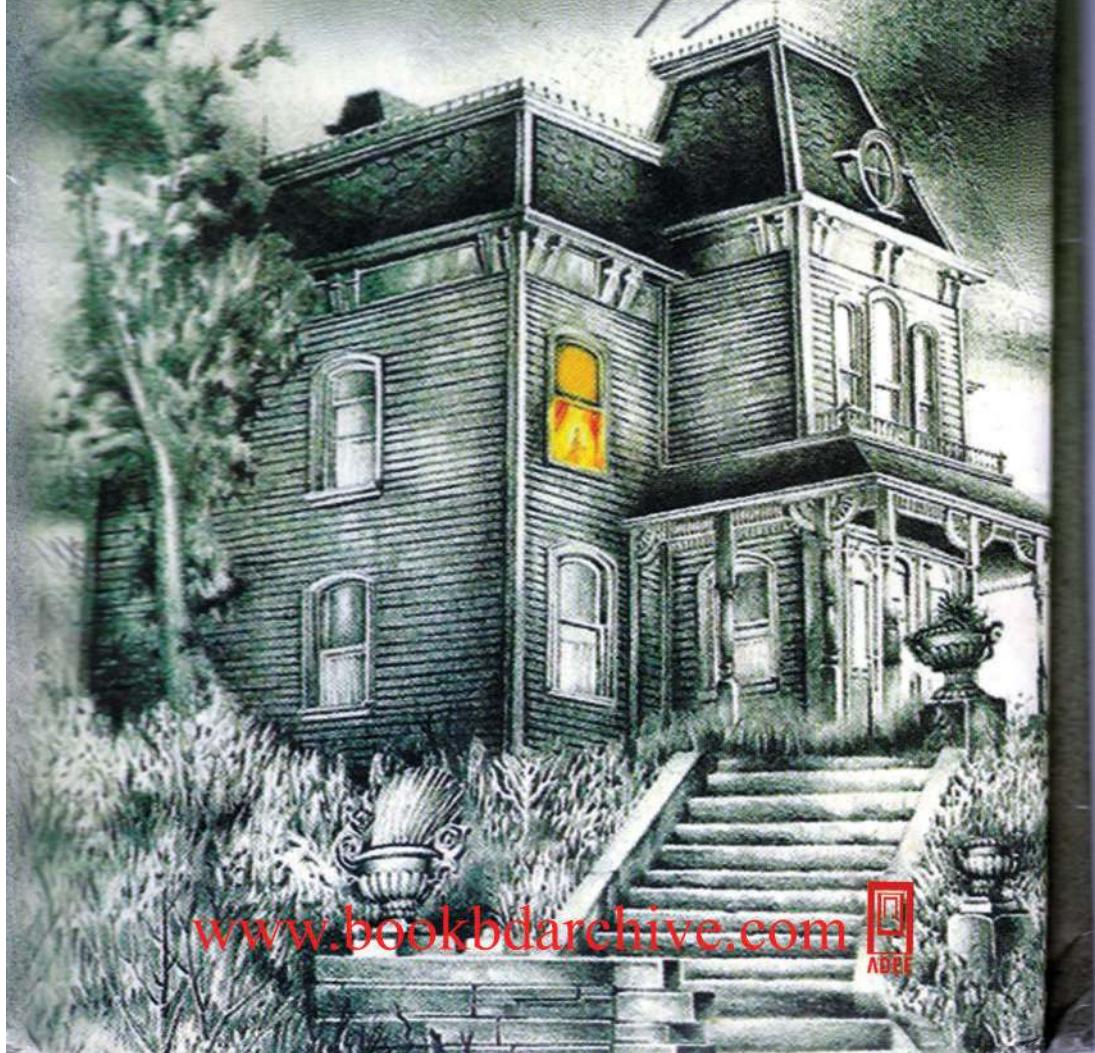


রবার্ট ব্লক

সাইকো ২

রূপান্তর- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাই



www.bookbdarchive.com



সাহিকো ২

মূলং রবাট লুক
রূপান্তরং মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ



ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার , ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৬
© মারজিয়া সুলতানা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আদনান আহমেদ রিজন
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ২৫০ টাকা

Psycho II By Robert Block
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 250 Tk. U.S. : 10 \$ only
ISBN : 978 984 92437 2 4

উৎসর্গঃ

স্টেলা লোয়েব ব্রককে

আদী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই:

অনুবাদঃ
ট্রিল মাউন্টেন
স্টোরিজ
স্যান্ড স্টর্ম
রামেশ্বর সান অফ লাইট
আর্টেমিস ফাউল

মৌলিকঃ
রাত এগারোটা

তুমিকা

সাইকো-বইটা পড়েছিলাম সম্ভবত বছর দশকে আগে। রবার্ট ব্লকের লেখা ক্লাসিক এই বইটি যে পড়েছে, সে-ই মুঝ আর শিহরিত হতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম বইয়ের প্রায় বিশ বছর পর বের হয়েছিল সাইকো ২।

যাই হোক, সাইকো পড়ার পর থেকেই, সাইকো ২ পড়ার আগ্রহ জন্মেছিল মনে। ভাবিনি কখনও নিজেই রূপান্তর করার জন্য পড়া। সাজিদ ভাইয়ের আগ্রহে সেটাও সম্ভব হলো।

বইটা রূপান্তর করার সময়, সহযোগিতা পেয়েছি বেশ কয়েকজনের। তাদের মাঝে মার্ক আর ওয়াসি আহমেদের নাম বিশেষভাবে না বললেই না। এই দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আশা করি বইটা পড়ে আপনাদের ভালোই লাগবে।

ডা. মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
নভেম্বর, ২০১৬

।
।
।
এক

ঝঁঝাগারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে নরম্যান বেটস, চেষ্টা করছে জানালার গরাদটাকে অগ্রাহ্য করে বাইরের দৃশ্য দেখার। ওগুলো যে ওখানে আছে, তা মন্তিক জানে, কিন্তু পাত্তা দিলে চলবে কী করে? কথায় আছে না, অজ্ঞানতার মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে শান্তি!

তবে আজ কেন জানি অজ্ঞানতা ওকে শান্তি দিতে পারছে না। স্টেট হাসপাতালের জানালার গরাদগুলো না চাইলেও নজরে পড়ে যাচ্ছে বারবার। আগে এই জায়গাটার নাম ছিল ভিন্ন-স্টেট হসপিটাল ফর দ্য ড্রিমিনালি ইনসেন। আইনের চোখে অপরাধী যে সমন্ত রোগী মানসিকভাবে অসুস্থ, কেবলমাত্র তাদেরকেই পাঠানো হতো এই হাসপাতালে। তবে যুগ পরিবর্তনের হাওয়া আজ এখানেও লেগেছে, তাই এখন আর অমন নামে ডাকা হয় না এই স্থাপনাকে। কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়ার ক্ষমতা নামেই শেষ। জানালার গরাদগুলো এখনও আছে, আর সেই গরাদের পেছনে রয়েছে ও। বাইরের পৃথিবীর এক চিলতে দৃশ্যই কেবল জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায়।

কেবল পাথুরে দেয়াল বানায় না জেলখানা, যেমন কেবল-ই গরাদ বানায় না পাখির খাঁচা-কবি রিচার্ড লাভলেস অনেক...অনেক দিন আগে, সতেরশো শতাব্দীতে কবিতাটা লিখেছিলেন। নরম্যান অনেকক্ষণ ধরে জানালার ধারেই বসে আছে। কবি মারা গিয়েছেন তিনশ বছর আগে। নিজে অতটা লম্বা সময় বসে না থাকলেও, তেমনটাই মনে হচ্ছিল।

চুপচাপ বসে থাকার জন্য ঝঁঝাগারের চেয়ে ভালো আর কোনও জায়গা হয় না। ঝঁঝাগারের পরিচালক হিসেবে কাজও বেশি একটা করতে হয় না তাকে। হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র রোগী বই পড়তে আসে। তাই বলতে গেলে অখত অবসর নরম্যানের হাতে। নিজের ফাঁকা সময়টা বই পড়েই কাটায়। রিচার্ড লাভলেস আর অন্যান্য কবিদের সাথে সেভাবেই পরিচয় হয়েছে লোকটার। কর্তৃপক্ষ ওকে একটা ডেক্স পর্যন্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে! বোঝাতে চাইছে, কতটা বিশ্বাস করে এখন তারা নরম্যানকে। আকারে ছোট হলেও, জিনিসটার জন্য কৃতজ্ঞ নরম্যান। কিন্তু মাঝে মাঝে...যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর বাইরে যখন পাখি গান গেয়ে ওঠে, তখন নিজেকে বন্দি বলে মনে হয় তার। পাখিগুলো মুক্ত, আর সে? আটকা পড়া এক হতভাগা!

অবশ্য ডা. ক্লেইবর্নকে এসব বলেনি নরম্যান। যদি তিনি মন খারাপ করেন তো! কিন্তু অনুভূতিকে তো আর দমিয়ে রাখা যায় না। আসলে পুরো পরিস্থিতিটাই

কেমন যেন অযৌক্তিক আর অন্যান্য। যেসব কাজ করার অভিযোগে ওকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে-সে সব যদি সত্য হয়েও থাকে-তবুও তা অনেক আগের কথা। ওসব ঘটেছে অনেক আগে, অন্য কোনও দেশে। আর তারচেয়ে বড় কথা, ডাইনি বুড়িটা মারা গিয়েছে। এখন সে জানে, ওর নাম নরম্যান বেটস। আর এ-ও জানে, পাগল নয় ও।

অবশ্য আজকাল কাউকে আর পাগল বলে ডাকা হয় না। কেউ যদি পাগলামী করেও, তাহলে তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন আখ্যা দেখা হয়। তবে একগাদা মানসিক ভারসাম্যহীনের সাথে কোথাও আটকে রাখা হলে, কে না পাগল হবে! ডা. ক্লেইবর্ন-ও এখানকার রোগীদের পাগল বলেন না। তাই বলে বোকা বনেনি নরম্যান, উন্নাদ কাউকে দেখতে পেলে সাথে সাথে চিনতে পারে।

আগে সবাই পাগলদের ডাকত ‘পাগল’ বলেই। কিন্তু টেলিভিশন আজকাল নতুন নাম দিয়েছে তাদেরঃ উন্নাদ, খেপা, পাগলা ইত্যাদি। তাই বলে সহজ সরল রোগের গালভরা নামে ভুলতে রাজি নয় নরম্যান। সত্যকে কেন যেন সবাই বাজে কথা দিয়ে চেপেচুপে রাখতে চায়। এই ‘মৃত্যু’ শব্দটার কথাই ধরা যাক-মহাপ্রয়াণ, দেহত্যাগ, পঞ্চতৃপ্তাণ্তি।

অবশ্য নামে আর কী যায় আসে? গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন, সে তার সুগন্ধ ছড়াবেই!

কথাটা মা প্রায়শই বলতেন। কিন্তু নাহ, মা’র কথা চিন্তা করবে না সে। মহিলা মৃত, আর সে জীবিত। জীবিত কিন্তু খাঁচায় বন্দি! এই কথাটা জানা, সত্যের মুখোমুখি হতে পারা-এই দুটোই প্রমাণ করে যে নরম্যান বেটস সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন কর্তৃপক্ষ সেটা বুঝলেই হয়।

খুন সে করেছে বটে, কিন্তু সেই সময় তো আর সুস্থ ছিল না। তাই বড়জোর সাত বা আট বছরের জেল হবে। একসময় না একসময় ঠিক বের হয়ে আসবে। তবে কর্তৃপক্ষ সেটা মানলে তো। এখনও ওকে ‘সাইকোটিক’ বা মানসিকভাবে অসুস্থ বলে এখানে আটকে রেখেছে।

অথচ অসুস্থ তো ওরাই! সুস্থ-সবল একটা মানুষকে পাগল আখ্যা দিয়ে আটকে রেখেছে! উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল নরম্যান। গরাদের একদম সাথে মাথা লাগিয়ে দাঁড়ালে, দৃষ্টির সীমায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ওগুলো।

এখান থেকে প্রাঙ্গনটা পরিষ্কার দেখা যায়। বাইরের দৃশ্য প্রায়শই ওকে অভিভূত করে তোলে। বসন্তের উজ্জ্বল আলো থাকলে রবিবারের বিকালটা আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। পাখির গান আরও পরিষ্কারভাবে শোনা যায়, শান্ত করে তোলে মন। সৃষ্টি আর পাখির গান, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!

প্রথম প্রথম যখন এখানে আসে, তখন না ছিল সূর্যের আলো...আর না ছিল কোনও পাখির গান! ছিল শুধু অন্ধকার আর চীৎকার! অন্ধকারটা ছিল ওর

অন্তরেই, এমন একটা জায়গা ছিল সেটা, যা বাস্তবতা থেকে ওকে আড়াল করে রাখত। আর চীৎকার? চীৎকারটা ছিল ওকে খুঁজতে থাকা দানবদের! ডা. ক্লেইবন কীভাবে কীভাবে যেন সেই অন্ধকার থেকে ওকে বের করে এনেছেন। আর ওই দানবদের এমন জায়গায় পাঠিয়েছেন, যেখান থেকে তাদের আর ফিরে আসার উপায় নেই। ডাঙ্কারের ভরাট কষ্ট যেন নরম্যানের মতিঝিঁরতার প্রতিভূ।

* অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে অনেক সময় লেগেছে নরম্যান বেটসের। শান্ত একটা কর্ষ্ণরের কথা অবশ্যে শুনতে পেয়েছে সে। কষ্টটা ওকে বলেছে, নরম্যান আসলে নরম্যান। ওর মা নয়। নরম্যান এমন একজন মানুষ, যে অন্যদের ক্ষতি করেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে না। তাই শুধু শুধু নিজেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই কথাটা মেনে নেয়া ছিল সুস্থ হবার পথে প্রথম ধাপ।

এখন ওকে কোনও জ্যাকেট বা কোনও সেল অথবা ঘুমের ওষুধ আটকে রাখে না। গৃহগারিক হিসেবে পছন্দের বইগুলো পড়ার সুযোগ পায় সে। টেলিভিশন নতুন এক দুনিয়াকে তুলে ধরে ওর সামনে। চারকোনা ওই বাক্সটা যেন বাইরের দুনিয়া দেখার একটা জানালা। পার্থক্য কেবল এতটুকু, এই জানালায় কোনও গরাদ নেই!

জীবন এখানে আরামদায়ক। এখানে আসার আগেও সে একা একা থাকতে পছন্দ করত। তবে মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে সে। রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গ। কোনও বইয়ের চরিত্র বা পর্দার ছবি না। ক্লেইবন ছাড়া অন্যান্য ডাঙ্কার, নার্স বা আর্দালিলা যেন বাতাস দিয়ে তৈরি। তাদের উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায় না। তাছাড়া এখন ও প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে বলে, ডা. ক্লেইবন অন্যান্য রোগীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বেশি।

নরম্যান অন্যান্য রোগীদের সাথে মিশতে পারে না। ওইসব পাগল-ছাগলদের বিড় বিড় করে কথা বলা, অর্থহীনভাবে নড়াচড়া দেখতে বিরক্ত লাগে তার। ওদের সাথে মেলামেশা করার চাইতে, নিঃসঙ্গতাই অধিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। ডা. ক্লেইবন অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু এই একটা বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনতে পারেননি।

চেষ্টা করেছেন অনেক। তিনিই নরম্যানকে বলেছিলেন এখানকার নাটকে অভিনয় করতে। কিছুদিন কাজটা নিয়ে ব্যস্তও ছিল সে। অন্তত স্টেজে ওঠার পর নিজেকে নিরাপদ মনে হয়েছিল। পরিস্থিতি ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। দর্শকদের হাসাচ্ছিল, কাঁদাচ্ছিল। চার্লির আন্তি হিসেবে অভিনয় করেছিল, এত ভালো করেছিল যে দর্শকরা হাততালি না দিয়ে পারেনি।

পরবর্তীতে ডা. ক্লেইবনের কাছে জানতে পারে, নরম্যানের জন্য নাটকটা ছিল একটা পরীক্ষা। তোমার নিজেকে নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত, বলেছিলেন তিনি। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারেননি ডাঙ্কার ক্লেইবন, নরম্যান তাকে জানায়নি।

নাটকের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে। নাহ, ঠিক নাটকের মাঝে না...
নাটকের চরিত্রের মাঝে। একদম শেষ মুহূর্তে নরম্যান পরিণত হয়েছিল চার্লির
আন্তিমে, যখন তার হাতে পাখা ছিল না। ছিল একটা ছুরি!

এখন...এই মুহূর্তে...জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে গিয়ে সে টের পেল,
দিগন্তে সূর্যের পাশাপাশি কালো মেঘের ছায়াও দেখা যাচ্ছে! ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে
উঠছে পার্কিং লটের গাছগুলোও। একমনে দেখছিল সে, ঘোর ভাঙল পাখির ডানা
ঝাপটানোতে। এক মুহূর্ত পর, ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসতে থাকা আকাশে
উড়তে দেখা গেল তাদের। নাহ, আসন্ন ঝড়ের ভয়ে নয়। ওরা উড়ে যাচ্ছে,
কারণ অনেকগুলো গাড়ি এগিয়ে আসছে এদিকে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, পার্কিং লট থেকে গাড়িগুলোর আরোহীরা বেরিয়ে
হাসপাতালের দিকে এগোচ্ছে। এই দৃশ্যটা একদম স্বাভাবিক, প্রতি রবিবার
বিকালেই তা দেখা যায়। সঙ্গে এই দিনটাতে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের
দেখতে আসে তার পরিবারের সদস্যরা।

দেখো আস্মু, লোকটা কেমন অঙ্গুত!

বাবু, তোমাকে না বলেছি, ওসব বলতে নেই!

মাথা নাড়ুল নরম্যান। এভাবে ভাবাটা ঠিক হচ্ছে না। এই অতিথিরা রোগীদের
বন্ধু, পরিবারের সদস্য। ভর্তি রোগীকে ভালবাসে বলেই দেখতে আসে তারা।
কিন্তু আফসোস, ওর সাথে দেখা করতে আসে না কেউ।

বহু বছর আগে রিপোর্টাররা আসত, কিন্তু ডা. ক্লেইবর্ন তাদেরকে দেখা করার
অনুমতি দিতেন না। এমনকি নরম্যান সুস্থ হবার পরেও দেননি। এখন আর কেউ
আসে না। আসবে-ই বা কে? যাদেরকে ও চেনে, তারা এতো দিনে মারা
গিয়েছে। মা, ক্রেন মেয়েটা আর ওই গোয়েন্দা, আরবোগাস্ট-ও। এখন চুপচাপ
অপরিচিতদের আসা যাওয়া করতে দেখে শুধু। বিরক্ত লাগে নরম্যানের। এই
অতিথিরা এসে কেবল পাখিদেরকে বিরক্ত করে, তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

খারাপ, খুব খারাপ। আশেপাশে পাখি থাকলে তার খুব ভালো লাগে। অনেক
আগে, মৃত পাখি স্টাফ করত সে। যখন ট্যাক্সিডর্মি পছন্দ করত, তখনকার
কথা। তখনও পাখি ভালবাসত।

চোখ ছোট ছোট করে পার্কিং লটের দিকে তাকাল সে। এখন থেকে লেখা
পড়তেও পারছেও স্যাকরেড অর্ডার অফ দ্য লিটল সিস্টারস অফ চ্যারিটি। ওর
চোখের সামনেই পেঙ্গুইনের মতো ভঙিতে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এগিয়ে আসতে
দেখল দুজনকে। কে জানে, হয়তো দক্ষিণ মেরু থেকে ওকে অত্যাচার করতেই
এসেছে তারা।

নাহ, কী সব পাগলের মতো ভাবছে সে।

অথচ সবাই জানে, নরম্যান পাগল না।



দুই

নরম্যানের পেঙ্গুইন দুটো হাসপাতালে প্রবেশ করে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল।
সামনে সামনে চলা চশমা পরিহিত খাটো মহিলার নাম সিস্টার কুপারটাইন। লম্বা,
কম বয়সী জন হলো সিস্টার বারবারা।

সিস্টার বারবারা নিজেকে পেঙ্গুইন ভাবে না। অবশ্য এই মূহূর্তে সে নিজেকে
নিয়েই ভাবছে না। এখানকার অধিবাসীদের চিন্তাতেই ব্যস্ত তার মন।

এখানে যারা বাস করে, তারা-ও ওর মতোই মানুষ। সাইকোলজি ক্লাসে এই
ব্যাপারটার উপরে সবসময় জোর দেয়া হতো। আর ধর্মীয় সব শিক্ষার ভিত্তিমূল-ই
তো এই ধারণা।

তবে নিজের কাছে হলেও সিস্টার বারবারা দ্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, এই
মূহূর্তে সে খুব একটা স্বচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। হাজার হলেও, সিস্টারদের এই
দলটার সাথে নতুন যোগ দিয়েছে ও। এর আগে কোনও চ্যারিটি মিশনেও আসেনি,
পাগলাগারদে তো দূরে থাক!

সিস্টার কুপারটাইনের কথা মতো আসতে হয়েছে ওকে। বয়স্কা সিস্টার আবার
গাড়ি চলাতে পারেন না। বিগত বছু বছু ধরে সিস্টার কুপারটাইন, সিস্টার
লরেটাকে সাথে নিয়ে এখানে আসা যাওয়া করছেন। কোনও মাস বাদ পড়ে না। কিন্তু
সিস্টার লরেটার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। তাই এই মূহূর্তে কোথাও যাবার মতো অবস্থা
নেই তার।

ঈশ্বর তাকে দ্রুত সুস্থিতা দান করুন। তসবীটাকে হাতে জড়িয়ে নিয়ে প্রার্থনা করল
সিস্টার বারবারা। সেই সাথে নিজের শারীরিক সুস্থিতার জন্য ধন্যবাদও জানালো।

তোমার মতো এক সুস্থ, সবল মেয়ের স্বামী পেতে কোনও কষ্টই হবে না। মা
প্রায়শই বলতেন। কিন্তু ভুল হয়েছিল মাঁর। মেয়েলি সৌন্দর্যের ছিটে ফেঁটাও ছিল না
ওর মাঝে। হয়তো সেজন্যই কোনও পুরুষ ওর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। তাই যখন
সিস্টারদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের দলের একজন হবার সুযোগ এল, সাথে সাথে
রাজি হয়ে গেল সে। ঈশ্বরকে সেজন্য ধন্যবাদ।

সিস্টার কুপারটাইনকে সঙ্গি হিসেবে দেবার জন্যও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই মূহূর্তে
তিনি ছোট খাটো রিসেপশনিষ্টের সাথে আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছেন। এই
পাগলাগারদের সুপারিনটেডেন্ট আসার আগে, ওর সাথে মেয়েটাকে পরিচয়ও করে
দিলেন। হলের ওমাথায় অবস্থিত অফিস থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছেন
সুপারিনটেডেন্ট। পরনে একটা হালকা রঙের কোট আর বাঁ হাতে একটা ব্যাগ।

ডা. স্টাইনার ছোট খাটো, টাক মাথার একজন মানুষ। উপরের দিকে চুলের

অভাবটা ঢাকার জন্য, জুলপি বড় করে রেখেছেন। খাটো অবয়বটাকে যেন অতটা খাটো না মনে হয়, সেজন্য সোজা হয়ে হাঁটছেন। অবশ্য সিস্টার বারবারার এসব ভাবা উচিত হচ্ছে না। লোকটাকে কতোটুকুই বা চেনে ও? তার উদ্দেশ্য বা ধারনার ব্যাপারে মন্তব্য করার মতো তো আর না। হ্যা, মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হলে হয়তো পারত। গত বছর মা মারা যাবার পর, লেখাপড়াই বাদ দিয়ে দিয়েছে।

বেশ আন্তরিক ব্যবহার করলেন ডা. স্টাইনার। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলে, সিস্টার বারবারার ইতস্ততভাবটা একদম সাথে সাথে ধরে ফেললেন। চেষ্টাও করলেন সেটা দূর করার। তবে কাজটা সফলভাবে করতে পারলেন তার সাথে অফিস থেকে বের হওয়া দ্বিতীয় লোকটা। তাকে দেখামাত্র বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল অশান্তিটুকু।

‘ডা. ক্লেইবর্নকে নিশ্চয় চেনেন আপনি?’ সিস্টার কুপারটাইনকে জিজ্ঞাসা করছিলেন ডা. স্টাইনার। নড় করে সিস্টার জানালেন যে ডাঙ্গার সাহেবকে তিনি চেনেন। ‘আর ইনি হচ্ছে সিস্টার বারবারা।’ কোকড়নো চুলের ডাঙ্গারের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডা. স্টাইনার। ‘আর সিস্টার, ইনি আমার সহকর্মী, ডা. ক্লেইবর্ন।’ কম বয়সী সিস্টারের সাথে হাত মেলালেন ডাঙ্গার।

‘দেরি হয়ে যাচ্ছে,’ রিসেপশন ডেস্কের পেছনে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন ডা. স্টাইনার। ‘এতক্ষণে বিমানবন্দরের কাছাকাছি থাকার কথা! হাতের ব্যাগটা ডান হাতে নিতে নিতে ঘুরলেন তিনি। ‘আমাকে ক্ষমা করবেন। এই স্টেটের বোর্ডের সাথে আমার সকালে একটা মিটিং আছে। এই বিমানটা ছাড়া যাবে না। তাই আপনাদেরকে ডা. ক্লেইবর্নের হাতে ছেড়ে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনিই দায়িত্বে থাকবেন।’

‘কোনও অসুবিধা নেই।’ মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন সিস্টার কুপারটাইন। ‘আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান।’

ডা. স্টাইনারকে এগিয়ে দেবার জন্য, সাথে গেলেন কম বয়সী ডাঙ্গার। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা বিনিময় হলো তাদের মাঝে। দ্রুত লয়ে কয়েকটা কথা বলে বিদায় নিলেন ডা. স্টাইনার। তাকে বিদায় দিয়ে সিস্টারদের কাছে ফিরে এলেন যুবক ডাঙ্গার।

‘আপনাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হলো বলে দুঃখিত।’ বললেন তিনি।

‘ওসব নিয়ে ভাববেন না তো।’ গলায় আন্তরিকতার সুর থাকলেও, চশমার পেছনের চোখ জোড়ায় তিরক্ষার দেখতে পেল সিস্টার বারবারা। ‘আমরা নাহয় পরে কোনও একদিন আসি। এমনিতেই অনেক কাজ আছে বলে মনে হচ্ছে।’

‘কোনও অসুবিধা নেই।’ জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট নোটপ্যাড বের করে আনতে আনতে বলল ডা. ক্লেইবর্ন। ‘ফোনে কয়েকজন রোগীর ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। এই যে তাদের সব তথ্য।’ বলে একদম উপরের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন ডাঙ্গার। এগিয়ে দিলেন বয়স্ক সিস্টারের দিকে।

নামগুলো পড়তে পড়তে চোখ থেকে তিরকার হাওয়া হয়ে গেল কুপারটাইনের।
টাকার, হফম্যান আর শ-কে তো চিনলাম। কিন্তু এই জ্যাভার কে?’

‘নতুন এসেছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ইনভেলিউশনাল মেলানকোলিয়া-এর
রোগী।’

‘মানে কী, তা ইশ্বর-ই জানেন!’

নিজেকে সামলে নেবার আগেই, সিস্টার বারবারার কঠ যেন নিজে থেকেই বলে
উঠল, ‘তীব্র মন খারাপ। সেই সাথে অপরাধবোধ, দুশ্চিন্তা, শারীরিক কিছু অসুবিধা-’
নিজের উপর ডা. ক্লেইবর্নের কৌতুহলী দৃষ্টি টের পেয়ে থেমে গেল সে।

তার সঙ্গনী ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন। ‘সিস্টার বারবারা সাইকোলজি নিয়ে
লেখা পড়া করত।’

‘ভালো ছাত্রী ছিলেন বলেই তো মনে হচ্ছে-’

কথাটা শোনামাত্র লজ্জা পেল বারবারা। ‘আসলে তা না। মানুষজনের মানসিক
অবস্থার এই হেরফের আমাকে সবসময় আকর্ষণ করেছে। এতো এতো সমস্যা-’

‘কিন্তু এতো অল্প সমাধান।’ নড় করতে করতে বললেন ডাক্তার।

‘সেজন্যই আমি এখানে।’ চেহারা শক্ত করে বললেন সিস্টার কুপারটাইন। কম
বয়সী নানের মনে হলো, মুখ না খুললেই মনে হয় ভালো করত।

‘যা বলছিলাম,’ বলেই চলছেন বয়স্ক নান। ‘সেজন্যই আমি এখানে এসেছি।
সাইকোলজির ব্যাপারে আমি অনেক কিছু জানি, তা বলব না। কিন্তু আমার ধারনা,
কখনও কখনও দয়ালু কঠে বলা কয়েকটা বাক্য অনেক কাজে আসতে পারে।’

‘অবশ্যই,’ ডা. ক্লেইবর্নের হাসি বয়স্ক মহিলার কঠিন চেহারাটাকে নরম করে
তুলল। ‘আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে আসা মানুষ
এখানকার রোগীদের উপর এমন প্রভাব ফেলেন, যা আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা খেটেও
পারি না। সেজন্যই চাচ্ছিলাম, যদি পারেন তো একটু জ্যাভারকে দেখে যাবেন।
চাইলে ওর রোগ সংক্রান্ত সব ইতিহাসও দেখতে পারেন।’

‘তার আর দরকার পড়বে না।’ এখন হাসছেন সিস্টার কুপারটাইন। ‘ওর মুখ
থেকেই সব শুনে নেব। আছে কোথায়?’

‘চোদ্দ নাম্বারে, টাকারের ঘরের ঠিক উল্টোপাশের ঘরটায়। ওখানকার নার্সকে
বললেই নিয়ে যাবে।’

‘ধন্যবাদ,’ কাপড় দিয়ে ঢাকা মাথাটা ঘুরে গেল। ‘এসো, সিস্টার।’

ইত্তত করল সিস্টার বারবারা, কী বলতে চায় তা জানে ও। এখানে আসার পথে
অনেকবার মনে মনে আউড়ে নিয়েছে। কিন্তু সিস্টার কুপারটাইনকে খেপিয়ে তোলাটা
কি বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে? না হলে না হোক, এমন সুযোগ তো আর বারবার
মিলবে না। ‘আমি যদি ডা. ক্লেইবর্নের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি, তাহলে কি খুব
অসুবিধা হবে? এখানে কীভাবে থেরাপি দেয়া হয়, তা জানার আমার খুব অগ্রহ-’

সিস্টার কুপারটাইনের চোখে তিরঙ্গার দেখে, সাথে সাথে খেমে গেল ও। তীক্ষ্ণ কঢ়ে জবাব এল, ‘শুধু শুধু ভদ্রলোকটার ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী? অন্য কোনও দিন হবে। দেখছ না, তিনি কতটা ব্যস্ত?’

‘আরে না,’ ডা. ক্লেইবন মাথা নাড়লেন। ‘ভিজিটিং আওয়ারটায় আমরা সবাই ফাঁকাই থাকি। আপনি অনুমতি দিলে, সিস্টার বারবারাকে সময় দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।’

‘সে তো আপনার দয়া,’ বললেন সিস্টার কুপারটাইন। ‘কিন্তু তাই বলে—’

‘আমার ভালোই লাগবে।’ ডাঙ্কার সাহেব তাকে খামিয়ে দিলেন। ‘আর যদি আপনাকে উপরের তলায় খুঁজে নাও পান সিস্টার বারবারা, তাহলে পাঁচটার সময় নাহয় লবিতেই অপেক্ষা করবেন।’

‘ঠিক আছে।’ বলে ঘুরে দাঁড়ালেন সিস্টার। কিন্তু তাই বলে সিস্টার বারবারাকে তীরঙ্গার মিশ্রিত দৃষ্টিটা দেখিয়ে দিতে ভুললেন না। বোঝালেন, এতে সহজে এই ঘটনার সমাপ্তি ঘটছে না।

এক মুহূর্তের জন্য সিস্টার বারবারা ভাবল, ঝামেলা করে লাভ কী! কিন্তু পরমুহূর্তেই ডা. ক্লেইবনের বলা কথাটা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল, ‘তাহলে সিস্টার, ঘুরিয়ে দেখাব? নাকি সরাসরি কাজের কথায় চলে যেতে চান?’

‘কাজের কথা?’

‘আহা, শুরুতেই নিয়ম ভাঙ্গলেন তো! হেসে বললেন ডাঙ্কার সাহেব। ‘এখানে প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন কেবলমাত্র একজন সার্টিফিকেটখারী মনোবিদই করতে পারবেন।’

‘দুঃখিত।’ সিস্টার বারবারা, বয়ঙ্কা নান এলিভেটরে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এরপর নিজেও হাসল।

‘দুঃখ পাবার মতো কিছু হয়নি। যে প্রশ্নটা করতে চান, সেটা করে ফেলুন?’

‘আমি যে আপনাকে বিশেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা জানলেন কী করে?’

‘প্রশিক্ষণের ফল বলতে পারেন।’ আরও চওড়া হয়ে উঠল হাসিটা। ‘বলে ফেলুন।’

আবারও ইত্তেত করল সিস্টার বারবার। প্রশ্নটা কী করবে? উচিত হবে? এরপর বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বললেন। ‘আপনার এখানে নরম্যান বেটস নামের এক রোগী আছে না?’

‘আপনি সে খবর রাখেন?’ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে হাসিটা। ‘অধিকাংশই অবশ্য ব্যাপারটা জানে না, সেজন্য আমি খুশি।’

‘খুশি?’

‘কথার কথা।’ শ্রাগ করলেন ডাঙ্কার ক্লেইবন। ‘আসলে সত্যি কথা বলতে কি, নরম্যান আমার বইতে একটা বিশেষ জায়গা ধারণ করে আছে। তাই...’

‘আপনি ওকে নিয়ে বই লিখছেন?’

‘লিখছি বলতে, লেখার ইচ্ছা আছে। ডা. স্টাইনারের কাছ থেকে ওর চিকিৎসার

দায়ভার বুঝে নেবার পর, নানা তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করে চলছি।'

কথা বলতে বলতে লবি হেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। এই মুহূর্তে ডা. ক্লেইবন্স সিস্টারকে পথ দেখিয়ে ডান দিকে করিউর ধরে এগোচ্ছে।

'কোন ধরনের চিকিৎসা চালাচ্ছেন ওর উপর? বৈদ্যুতিক শক?'

মাথা নাড়লেন ডা. ক্লেইবন্স। 'ডা. স্টাইনারের অবশ্য তা-ই ইচ্ছা ছিল। আমি রাজি হইনি। রোগী যখন প্রায় ক্যাটাটোনিয়ায় চলে গিয়েছে, তখন আর শক দিয়ে লাভ কী?'

'তাহলে নরম্যানকে সুষ্ঠু করার নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন আপনি?'

'নরম্যানকে ঠিক সুষ্ঠু বলা যাবে না। তবে আমরা রোগের উপসর্গগুলোর একটা ব্যবহাৰ কৰতে পেরেছে। তা-ও কোনও ধরনের কড়া ঔষধ-পত্র ব্যবহার না করেই! প্রশ্ন করেছি, উত্তর শুনেছি। বিগত কিছু দিনে মনোরোগের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানও অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার-এর ব্যাপারে।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, নরম্যান এখন আর নিজেকে ওর মা ভাবে না?'

'নরম্যান...নরম্যান-ই। আমার ধারনা, কথাটা ও নিজেও এখন বিশ্বাস কৰতে শুরু করেছে। খুন সে করেছে। কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্ৰেই নিয়ন্ত্ৰণে ছিল ওর মায়ের সত্ত্বটা। মেয়েদের মতো কাপড় পড়েই সে খুনগুলো করেছে। আগে ব্যাপারটা মানতে পারেনি, কিন্তু এখন মানতে শুরু করেছে। ঘটনাগুলো ও কখনওই মনে কৰতে পারবে না। আসলে এখন আর নরম্যান বাস্তবতাকে অঙ্গীকার কৰে না। ক্যাথার্সিস যাকে বলে।'

'ক্যাথার্সিস...তবে অ্যাবৱিঅ্যাকশন ছাড়া, তাই না?'

'ঠিক,' তীক্ষ্ণ চোখে সিস্টারের দিকে তাকালেন ডা. ক্লেইবন্স। 'আসলেই দেখি আপনি মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন।'

নড় কৰল মেয়েটা। 'শেষ পর্যন্ত কী হবে বলে আশা কৰছেন?'

'আগেই বলেছি আপনাকে। আমরা এখন আৱ কল্পনাতাতি কোনও কিছু কৰার আশা নিয়ে কাজ কৰছি না। নরম্যানকে বেঁধে রাখতে হচ্ছে না, স্বাভাৱিক মানুষের মতোই আচৰণ কৰতে পারছে সে-আপাতত এতেটুকুই যথেষ্ট। ওকে আমরা বাইৱে বেৱোতে দিব না। তবে এখনকাৰ গ্ৰহণারিকেৰ দায়িত্বে রাখা হয়েছে তাকে। কিছুটা স্বাধীনতা আৱ দায়িত্ব পেয়েছে। বেশিৰভাগ সময় এখন বই পড়েই কাটিয়ে দেয়।'

'একাকীত্বে ভৱা জীবন বলে মনে হচ্ছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু এৱে চাইতে বেশি কিছু ওৱ জন্য কৰা সম্ভব না। নরম্যানের কোনও আত্মীয় নেই, নেই কোনও বন্ধু-বন্ধব। এখন রোগীৰ চাপ বেশি হওয়ায়, আমি নিজেও আগেৰ মতো ওৱ সাথে সময় কাটাতে পাৰি না।'

তসবীৰ দানা চেপে ধৰে ফস কৰে প্ৰশ্নটা কৰেই বসল সিস্টার বারবাৱা, 'আমি কি ওৱ সাথে দেখা কৰতে পাৰি?'

থমকে দাঁড়ালেন ডা. ক্লেইবন্স। 'কেন?'

‘আপনি-ই কেবল বললেন, ওর জীবনটা একাকীত্বে ভরপুর। কারণ হিসেবে কি এটাই যথেষ্ট না?’

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। ‘বিশ্বাস করুন, আপনার সহমর্মিতাটুকুর প্রতি সম্মান আমার আছে—’

‘শুধু সহমর্মিতা ধরে নিলে ভুল করবেন। আমার আর সিস্টার কুপারটাইনের জীবনের উদ্দেশ্যই এটা। অসহায়দের সাহায্য করা, বন্ধুহীনদের বন্ধু হওয়া।’

‘বুবলাম, কিন্তু তাই বলে আমার রোগীদেরকে কোনও—’

‘রোগী? বানের জলের মতো কথা বেরিয়ে এলো সিস্টারের মুখ দিয়ে। আপনার মাঝে যদি কোনও সহমর্মিতা থেকে থাকত, তাহলে আপনি নরম্যান বেটসকে রোগী ভাবতেন না! সে একজন মানুষ-এক হতভাগা, একাকীত্বে ভোগ বিভ্রান্ত মানুষ! যে কিনা কেন তাকে একা থাকতে হবে, তা-ও বোঝে না! শুধু জানে, ওকে নিয়ে কেউ ভাবে না।’

‘আমি ভাবি!’

‘আসলেই কী ভাবেন? তাহলে ওকে একটা সুযোগ দিন, নরম্যান যেন বুঝতে পারে যে অন্য মানুষও ওকে নিয়ে ভাবে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডা. ক্লেইবর্ন। ‘ঠিক আছে, চলুন। নিয়ে যাচ্ছি।’

‘ধন্যবাদ।’

কিছুক্ষণের মাঝেই দুজনে গ্রাহাগারের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

একই দিনে, তৃতীয়বারের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিস্টার বারবারা। বন্ধু, আর্দ্ধ বাতাস প্রবেশ করল তার ফুসফুসে। ঘোড়ার গতিতে ছুটতে শুরু করেছে হাদপিণ্ড।

‘আপনি ঠিক আছেন তো?’ জানতে চাইলেন ডাক্তার।

‘একদম।’ বলল বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিজেকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে সিস্টার বারবারার। এতো চাপাচাপি করার কী দরকার ছিল? আসলেই কি সহমর্মিতার কারণে এসেছে ও? নাকি অহংকার বসত?

‘দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।’ আশ্চর্ষ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘আমি সাথে থাকব।’

বলতে বলতেই নব ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন দরজাটা। ভেতরের সারি সারি তাকে সাজিয়ে রাখা বইয়ের স্তুপ থেকে বারবারার মনে হলো, মাকড়সার জালের ভেতরে চলে এসেছে!

পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে গেলেন ডা. ক্লেইবর্ন, পিছু নিল বারবারা।

কয়েক পা এগোতেই দেখা গেল, ডেক্সের উপর একটা বাতি জুলিয়ে বসে আছে এই বিশাল মাকড়সার জাল সৃষ্টিকরী মাকড়সাটা।

আবার শুরু হলো সিস্টার বারবারার হাদয়ের ধুকপুকানি। এতো জোরে যে তার মনে হলো, আওয়াজটা বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে!

আর সেই আওয়াজ ভেদ করে সে শুনতে পেল ডা. ক্লেইবর্নের কষ্ট।

‘সিস্টার বারবার-এই যে নরম্যান বেটস।’



তিন

ঘরে দুই পেঞ্চাইনের একজনকে প্রবেশ করতে দেখে নরম্যানের মনে হলো, আসলেই আবার পাগল হয়ে যেতে চলেছে ও। কিন্তু কেবলমাত্র এক মুহূর্ত স্থায়ী হলো অনুভূতিটা। সিস্টার বারবারা যে পাখি নয়, তা দেখেই বুঝতে পারল ও। সেই সাথে তো ডা. ক্লেইবর্ন আছেন-ই। তিনি নিশ্চয় ওর মানসিক সুস্থিতা নিয়ে ঠাণ্ডা করবেন না! নিশ্চয় এরা ওর সাথে দেখা করতে এসেছেন।

‘দয়া করা বসুন’ একেবারে আদর্শ গৃহস্থের মতো অনুরোধ করল নরম্যান। যদিও একটা পাগলাগারদে, কোনও পাগল গৃহস্থ হতে পারে না। ওর অনুরোধ মেনে বসলেন দুজনেই। বিব্রতকর এক নীরবতা ভর করল উপস্থিত সবার মাঝে।

আচমকা নরম্যান বুঝতে পারল, আগন্তক দুজন-ও ওর মতোই ইতস্তত বোধ করছে। কীভাবে কথা শুরু করবে, তা নিজেরাও বুঝে উঠতে পারছে না! আবহাওয়ার উপর দিয়েই চালিয়ে দেই, ভাবল নরম্যান।

‘একটু আগে কত আলো ছিল, আর এখন! বাড় আসবে মনে হচ্ছে!'

‘বসন্তের দিনে যা হয়। আগে থেকে কিছুই আঁচ করা যায় না!’ বললেন ডা. ক্লেইবর্ন। কিন্তু নান মেয়েটা তখনও চুপ করে রাইল।

আবহাওয়ার প্রতিবেদন তো শেষ হলো, এবার কী নিয়ে কথা বলা যায়? ভাবল নরম্যান।

ঠিক তখনই কথা বলে উঠল সিস্টার বারবারা। টেবিলে রাখা বইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, ‘আশা করি বিরক্ত করছি না!'

‘একদম না, সময় কাটাচ্ছিলাম কেবল।’ বইটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল নরম্যান।

‘কী পড়ছিলেন?’

‘মরেনো’র জীবনী?’

‘মরেনো? রোমানিয়ার সেই মনোবিদ?’

সিস্টার বারবারার মুখ থেকে এই প্রশ্নটা আশা করেনি নরম্যান। ‘আপনি তার নাম শুনেছেন?’

‘শুনেছি মানে! তিনি-ই তো সাইকোড্রামা পদ্ধতির উভাবক!'

মুচকি হেসে নড় করল নরম্যান। ‘ঠিক বলেছেন। তবে এখন আর ওসব প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার হয় না।’

‘ঠিক বলেছে নরম্যান।’ প্রায় সাথে সাথেই বলে উঠলেন ডা. ক্লেইবর্ন। ‘এখন আর আমরা ওসব পদ্ধতি খাটাই না। তবে কেউ যদি তার কল্পনাকে নাটকে অভিনয় না করে মুখে বলতে চায়, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই।’

‘এমনকি কোনও রোগীকে স্টেজে তুলে তাকে বোকা বনতে দিতেও আপত্তি নেই।’ একটু খোঁচাই দিল নরম্যান।

‘ওসব কথাও এখন অতীত।’ হাসলেন ডাঙ্গার, কিন্তু চেহারায় কিছুটা দুশ্চিন্তার ছাপ পরিষ্কার দেখতে পেল ও। ‘তবে এখনও বলি, তোমার অভিনয় কিন্তু দারূণ হয়েছিল।’

অবাক চোখে দুজনের দিকে তাকালো সিস্টার বারবারা। ‘আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।’

‘আমাদের এখানে নাটক অনুষ্ঠিত হয়।’ মেয়েটাকে বোৰ্বাৰার চেষ্টা কৰল নরম্যান। ‘বলতে পারেন, ডা. ক্লেইবর্ন মরেনোৰ প্রস্তাবনাকে একটু ঘষামাজা করে এই পদ্ধতি খাটিয়ে থাকেন। যাই হোক, তিনি আমাকে প্রায় ধরে বেঁধে একটা নাটকে অভিনয় করিয়েছেন।’

‘ধরে বেঁধে? কীভাবে?’

‘বিৱৰণ কৰাৰ জন্য দুঃখিত।’

সিস্টার বারবারার কথার মাঝে বাঁধা পড়ায়, বিৱৰণিৰ সাথে চোখ তুলে বিৱৰণিৰ উৎসের দিকে তাকালো নরম্যান। ওটিস, চতুর্থ তলার ছেলে নার্সদের একজন ঘরে এসে প্ৰবেশ কৰেছে। ডা. ক্লেইবর্নেৰ কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

‘বলো, ওটিস?’ বললেন ডাঙ্গার সাহেব।

‘ডা. স্টাইনারেৰ জন্য একটা লং ডিস্ট্যাস কল এসেছে।’

‘ডা. স্টাইনার তো শহৰেই নেই। মঙ্গলবাৰ সকালেৰ আগে তাকে পাওয়া যাবে না।’

‘আমি তো তা বলেইছি। কিন্তু যে লোক ফোন কৰেছে, সে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে। খুব নাকি জৱণৰী ব্যাপার।’

‘নাম জিজ্ঞাসা কৰেছে?’

‘মি. ড্রিসকল।’

‘নাম-ই শুনিনি কখনও।’

‘বলছে, সে নাকি হলিউডেৰ কোন স্টুডিওৰ প্ৰযোজক।’

চেয়াৰ ঠিলে উঠে দাঁড়ালেন ডা. ক্লেইবর্ন। ‘ঠিক আছে, আমি আসছি।’ সিস্টার বারবারার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। ‘হয়তো আমাদেৱ দিয়ে কোনও সাইকোড্রামা কৰাতে চায়।’ মেয়েটাৰ একদম কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, উঠতে সাহায্য কৰতে চান। ‘আজকেৰ মতো তাহলে এতোটুকুই থাক।’

‘থাকতেই হবে?’ অনুনয়ের সুরে জানতে চাইল সিস্টার বারবারা। ‘আপনি আসা পর্যন্ত নাহয় আমি এখানেই থাকি।’

নরম্যান টের পেল, একটু আগের সেই বন্দির মতো অনুভূতিটুকু আবার ফিরে আসছে ওর মাঝে। কিন্তু কোনও কথা বলল না সে; আসলে ভেতর থেকে উঠে আসা একটা কষ্ট ওকে মুখ খুলতে নিষেধ করছে।

‘চাইলে থাকতে পারেন। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।’ এই বলে ওটিসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু নরম্যান বুঝতে পারল, দরজার ওপাশে গিয়েই লোকটাকে নিচু গলায় কয়েকটা নির্দেশ দিলেন ডাঙ্গার। কিছুক্ষণ এক হয়ে থাকার পর, আলাদা হয়ে গেল ছায়া দুটো। একটা এগোল করিডরের দিকে, অন্যটা দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়ে রাইল।

অর্থাৎ, ওটিস দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

হালকা একটা আওয়াজ শুনে, সিস্টার বারবারার দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল নরম্যান। মেয়েটা তসবী টানছে।

আচ্ছা, এই নান থাকতে চাইল কেন?

‘আপনি সাইকোড্রামা সম্পর্কে কী করে জানেন, সিস্টার?’

‘কলেজে একটা কোর্স ছিল।’

‘বুঁঝলাম। কলেজেই কি আমার ব্যাপারে জানতে পেরেছেন?’

বৃদ্ধ হয়ে গেল তসবী টানার আওয়াজ। মনে মনে খুশী হয়ে উঠল নরম্যান। মেয়েটার পুরোপুরি মনোযোগ দখল করতে পেরেছে সে। পুরো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এখন ওর হাতে। অনেক... অনেক বছর পর পরিস্থিতি নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে সে। অসাধারণ এক অনুভূতি। এতো দিন অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়েছে ওকে। এখন নিজেই বানিয়েছে অন্যকে তার হাতের পুতুল! সামনে বসা মেয়েটা দশাসই হতে পারে, হতে পারে মেয়েলি সৌন্দর্য বিবজিত। কিন্তু মানুষ তো!

মানুষ! নানরাও মানুষ! হঠাৎ ওই আপাদমন্তক ঢেকে রাখা কাপড়ের নিচে যে দেহটা আছে, সেটা দেখার সুতীব্র ইচ্ছা জেগে উঠল ওর মনে। নানরা মাথার চুল কামায়। কিন্তু নিচে? নিচের দিকটাও কি কামিয়ে রাখে?

‘হ্যাঁ।’ বলল সিস্টার বারবারা।

চমকে উঠল নরম্যান। এই নান আবার মন পড়তে সক্ষম না তো! পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, একটু আগে করা প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছে সিস্টার। ‘কী শিখেছেন আমার ব্যাপারে?’

নিজের চেয়ারে নড়ে চড়ে বসল সিস্টার বারবারা। ‘বেশি কিছু না। আমাদের পাঠ্য বইয়ের একটা ফুটনোটে আপনার নাম ছিল।’

‘পাঠ্য বইয়ে? হ্রম। আমার কেসটা তাহলে একদম সাধারণ।’

‘আমি...আমি আসলে আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি-’

‘কী ভেবেছিলেন? কথাটা শুনে আমি কেমনবোধ করব?’ অন্য কাউকে সঠিক
উত্তর খুঁজে বের করার কাজে হাবুড়ুর খেতে দেখে ভালোই লাগছে নরম্যানের।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে সে জানতে চাইল, ‘এখানে এসেছেন কেন সিস্টার?
রবিবার কি চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে?’

চোখ তুলে চাইল সিস্টার বারবারা। ‘ভেবেছিলাম, আপনার সাথে কথা বলার
সুযোগ পাব। আসলে আপনার নাম ওই বইতে পড়ার পর, আমি অনেকগুলো
খবরের কাগজ ঘেঁটে দেখেছি। অগ্রহ জন্মেছে আমার মনে-’

‘অগ্রহ?’ নরম্যানের কষ্ট যেন বিদ্রোহ করে বসল। ‘ভয় পাননি? ঘৃণা জন্মায়নি
মনে? মনে হয়নি, নরকের কোনও কীটের ব্যাপারে পড়ছেন?’

ফিসফিসিয়ে জবাব দিল সিস্টার বারবারা, ‘হয়েছে। যেসব অনুভূতির কথা
বললেন, তার প্রত্যেকটাই হয়েছে। আপনাকে মনে হয়েছে কোনও দানব। মনে
হয়েছে, প্রতিটা অঙ্কুর ছায়ার আড়ালে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি।
পরবর্তী কয়েকটা মাস আমি আপনাকে মন থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়েছি। বারবার
আমার দৃঢ়ত্বে হানা দিয়েছেন আপনি। কিন্তু এখন? এখন পরিবর্তন হয়েছে সেসব
কিছুর।’

‘কীভাবে?’

‘ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এই অর্ডারের সদস্য হবার সাথে সাথে
যেন আমার মাঝে অঙ্গুত এক শক্তি এসে ঠাই নিয়েছে। সদস্য হবার আগে
আমাদেরকে আলাদাভাবে ধ্যান করতে হয়। নিজেদের গোপন চিন্তা, গোপন পাপ
নিয়ে চিন্তা করতে হয়। হয়তো সেজন্যই।’

‘সাইকিয়াট্রিক কিন্তু পাপে বিশ্বাস করে না।’

‘কিন্তু নিজের কৃতকর্মের দায়ভার নেয়ায় তো বিশ্বাস করে? অনেক দিন ধরে
চিন্তা করার পর, আমি একটা সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আপনি সজ্ঞানে কোনও
অপরাধ করেননি। তাহলে কীভাবে আপনাকে সেসব অপরাধের জন্য দায়ী বলা
যায়? বরঞ্চ আপনাকে না বুঝেই অপবাদ দেবার অপরাধে আমি অপরাধী। পরে
যখন জানতে পারলাম যে আজ এখানে আসছি, ঠিক সেই মুহূর্তে সিন্ধান্ত নিয়ে
ফেলেছিলাম, আপনার সাথে দেখা করব-ই করব।’

‘ক্ষমা চাইতে?’ নরম্যান মাথা নাড়ুল। ‘সত্যি কথাটা অন্তত নিজেকে বলুন।
আপনি এখানে এসেছেন কৌতুহলবশত। আপনি এসেছেন দানবটাকে দেখার
জন্য। কষ্ট করে এসেছেন যখন, তখন মন ভরে দেখে নিন।’

বাতির আলোয় দীর্ঘক্ষণ নরম্যানের দিকে তাকিয়ে রইল সিস্টার বারবারা।
তারপর আগুত কঢ়ে বলল, ‘আমি ধূসর হতে শুরু করা চুল দেখতে পাচ্ছি,
দেখতে পাচ্ছি কপালের ভাঁজ। এই চেহারা যার, সে বড় অশান্তির মাঝে দিন

কাটাচ্ছে। তুমি কোনও দানব নও,’ আবেগে প্রায় বদ্ধ হয়ে এল গলা।
‘তুমি...তুমি একজন পুরুষ।’

‘শুনে ভালো লাগল?’

‘মানে?’

‘এর আগে কেউ কখনও আমাকে পুরুষ বলেনি।’ বলল নরম্যান। ‘এমনকি আমার মা-ও না। সে ভাবত, আমি দুর্বল, মেয়েলি এক মানুষ। আর অন্য ছেলেদের কথা কী বলব-’ বুজে আসতে চাইল নরম্যানের কঠ।

‘বলো, পিল্জ বলো। আমি শুনতে চাই।’ সিস্টার বারবারা আবার ওর দিকে ঢেয়ে আছে।

আসলেই শুনতে চায় এই মেয়েটা!

‘আমি জন্ম থেকেই ভঙ্গের স্বাস্থ্যের ছিলাম।’ কঠ ফিরে পেল যেন নরম্যান। ‘এই কয়েক বছর আগেও, বই পড়ার জন্য চশমা ব্যবহার করতে হতো। খেলাধূলাতেও ভালো ছিলাম না। ক্ষুলের পড়া শেষ হলে, মাঠে বেসবল খেলতে যেতাম। বয়স্ক ছেলেরা ক্যাপ্টেন হতো। একজন একজন করে নিজের দলের জন্য ছেলেদের বাছতো তারা। আমি সব সময় শেষে...’ ঢোক গিলল সে। ‘বাদ দাও, তুমি বুঝবে না।’

এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিল সিস্টার বারবারা। এবার নড় করল। ‘আমার সাথেও ঠিক এমনটা হয়েছে।’

‘তোমার সাথেও?’

‘হ্যাঁ,’ তসবীর উপর থেকে কখন যেন হাত সরিয়ে নিয়েছে সিস্টার। ‘আমি বাঁ হাতি। মেয়েরাও তো বেসবল খেলে। বাঁ হাতি হবার জন্য বল খুব ভালো ছুঁড়তে পারতাম আমি। তাই আমাকে সব সময় সবার প্রথমে বেছে নেয়া হতো।’

‘তাহলে মিল হলো কোথায়? পুরো উল্টো হলো না?’

‘উল্টো, কিন্তু একদম মিলে যায়।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল বারবারা। ‘তোমাকে সময়ে মেয়েমানুষ মনে করা হতো। আর আমাকে? পুরুষালী। শেষে বেছে নেবার জন্য তোমার যে কঠ হতো, প্রথমে বেছে নেবার জন্য সেই একই কঠ হতো আমারও।’

বদ্ধ, আঠালো হয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে যেন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইছে ছায়ারা। নাকি বাইরে বেরোতে? কে জানে!

‘সম্ভবত আমার অনেক সমস্যার একটা ছিল এটা,’ বলল নরম্যান। ‘অন্য সমস্যার কথাও তো জানো। আমি...আমি ট্রান্সভেস্টাইট, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরতাম। অস্তত তোমার তো নিজের সত্ত্বাকে হারাতে হয়নি। ভুলে যেতে হয়নি নিজ লিঙ্গকে।’

‘হয়নি?’ হাত থেকে তসবীটাকে ছেড়ে দিল সিস্টার বারবার। ‘নান-এর লিঙ্গ কী জানো? ঝীব! এমনকি আমার আসল নামটাও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া

হয়েছে।' হাসল মেয়েটি। 'আমার অবশ্য তাতে কোনও আপত্তি নেই। যাই হোক, যেটা বলছিলাম। তোমার আমার মাঝে তেমন কোনও পার্থক্য নেই কিন্ত।'

নরম্যান তীব্রভাবে চাইছিল মেয়েটার কথা বিশ্বাস করতে। কিন্তু না, বাতির আলোয় দুজনের মাঝে পার্থক্য টেনে দেয়া বস্তুর ছায়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ও। জানালার গরাদের ছায়া।

'একটা পার্থক্য আছে।' বলল সে। 'তুমি এখানে আসতে চেয়েছ বলে এসেছ। যখন চলে যেতে চাইবে, চলে যাবে। কিন্তু আমি? আমার ইচ্ছার কোনও মূল্য নেই।'

'ইচ্ছা?' মাথা নাড়ুল সিস্টার বারবারা। 'মানুষের ইচ্ছার আবার কী মূল্য? আমি এসেছি, কারণ দুশ্শর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। চলে যাব, যখন দুশ্শর আমাকে এখানে আর রাখতে চাইবেন না, তখন।' আচমকা একটা ঝলক আলো ঘরের ভেতরে প্রবেশ করায় থেমে গেল সিস্টার।

জানালার দিকে তাকিয়ে এই আচমকা এসে পড়া আলোর উৎস খুঁজতে চাইল নরম্যান, পরমুহূর্তেই বজ্রপাতের শব্দে কেঁপে উঠল জানালার গরাদ।

'ঝড় এসে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।' জ্ঞ কুঁচকে সিস্টারের দিকে তাকাল নরম্যান। 'কী হলো?'

উত্তরের অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, নিজেই সেটা বুঝতে পারছে। বাতির আলোয় কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছে মেয়েটার চেহারা। ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। ঐশ্বরিক আভা, এমনকি পুরুষালীভাবটাও উধাও হয়ে গিয়েছে চেহারা থেকে। ভয় জায়গা করে নিয়েছে সেখানে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল নরম্যান। জানালার কাছে গিয়ে সবুজাত পর্দাটা টেনে দিল। 'এখন ঠিক আছে?'

'হ্যা, ধন্যবাদ।' ভয়ের চোটে অবচেতন মনেই কখন যেন তসবীটা হাতে তুলে নিয়েছিল সিস্টার বারবারা। এখন আবার সেটা হাত গলে খসে পড়ল।

তসবীর গুটিগুলো বাড়ি খেল একটা আরেকটার সাথে। একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইল নরম্যান। এসব সাইকোলজির বুলি কপচানো, দুশ্শরের গুণগান গাওয়া-সব ভাঁওতাবাজি। বজ্রপাতের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে ওসব হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। ওর সামনে বসে থাকা মেয়েটা আর দশটা মেয়ের মতোই। এমনকি নিজের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছে এখন।

ছায়া...ওদের চারপাশে এখন শুধু ছায়াবাজি চলছে। হঠাৎ দরজার দিকে নজর গেল ওর, সাথে সাথে বুঝতে পারল-সামনের করিডরটা একদম খালি পড়ে আছে। কারণটাও বুঝতে পারল। ঝড় শুরু হলে, উপরের উন্মাদগুলোর উন্মাদনা আরও বেড়ে যায়।

দুশ্শর নিশ্চয় ওটিসকে উপরে পাঠিয়েছেন।

সিস্টার বারবারার দিকে তাকালো নরম্যান। ‘ঠিক আছো তো?’
‘একদম ঠিক আছি।’ বলল বটে মেয়েটা, কিন্তু গলার কম্পন থামাতে ব্যর্থ
হলো।

বজ্রপাতের ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা, আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতোই।

সাধারণ মেয়ে-শব্দ দুটো মাথায় আসার সাথে সাথে নরম্যানের মনে হলো,
শরীরের সব রক্ত যেন নিজের দিকে ধাবিত হয়েছে। দুর্বল...সাধারণ এক মেয়ে।
নিজেকে সামলাবার একটা মাত্র উপায়ই জানে সে। সেটাই খাটোলো, তিক্ত কথা
উচ্চারণ করল, ‘আমাকে একটু আগে কী বললে, তা মনে আছে তো? ঈশ্বর যদি
তোমাকে এখানে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় ঝড়টাকেও তিনিই পাঠিয়েছেন।’

মুখ তুলে চাইল সিস্টার বারবারা। ‘এসব কথা বলতে নেই। তুমি কী ঈশ্বরের
ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখো না?’

মুহূর্ত বজ্রপাত হচ্ছে, সেই শব্দগুলো যেন সরাসরি ধাক্কা মারছে নরম্যানের
মন্তিকে। আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ। ঈশ্বরের ইচ্ছা! ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করেছিল ও, সেই প্রার্থনার ফল মিলেছে।

‘করি, বিশ্বাস করি।’

উঠে দাঁড়াল নান। ‘যেতে হয় এখন। সিস্টার কুপারটাইন নিশ্চয় দুশ্চিন্তা
করবেন।’

‘দুশ্চিন্তার কিছু নেই।’ বলল বটে নরম্যান, কিন্তু নিজেকে উদ্দেশ্য করে।
বহুবছর আগে...যখন সব কিছুর শুরু...তখনও এমন বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এখন
আবার হচ্ছে। নিশ্চয় স্বর্গ থেকে আসছে এই বারিধারা।

ঈশ্বরের ইচ্ছাই আদেশ।

আবারও বজ্রপাতের আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ। কিন্তু সে শব্দ নরম্যানের
কানে ঢুকলে তো! ওর শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সবটা জুড়ে এখন কেবল সিস্টার বারবারার
তসবী থেকে আসা শব্দ!

মেয়েটার পিছু পিছু বইয়ের তাকের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল নরম্যান বেটস।



চার

নতুন রোগীর সাথে দেখা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি সিস্টার কুপারটাইনের। টাকারের রুমে থাকা অবস্থায় বড় শুরু হয়ে গেল বলে, আর দেরি করেননি তিনি। যখন নিচে নেমে এসেছেন, তখন অবিরাম বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে!

যতটা দ্রুত স্বত্ব, করিডরের গোলক ধাঁধাঁ পার হয়ে যাবার প্রয়াস পেলেন তিনি। তার সাথে যোগ দিয়েছে রোগীদের আত্মীয় স্বজনও। পঞ্চম তলার এলিভেটরের সামনে এসে দেখতে পেলেন, দরজার সামনে ভিড় জমে গিয়েছে। এলিভেটর থামার সাথে সাথে হড়মুড় করে ভেতরে প্রবেশ করল সবাই। সিস্টার কুপারটাইন চুকে পড়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কিন্তু ভেতরে এমন অবস্থা হয়েছে যে এক চুল নড়ার অবকাশ নেই! বয়ঙ্কা সিস্টারকে পাতাই দিল না কেউ! যারা উঠতে পারল না, তাদের মাঝেও কোনও ঝঁকেপ দেখা গেল না।

নেই, এখন আর সম্মান নেই। মানীকে সম্মান দেবার মতো মানসিকতা সম্পন্ন মানুষও নেই। কী যে দিন কাল এল!

মি. টাকারও আজ কেমন যেন অন্যরকম আচরণ করছিলেন। একসাথে প্রার্থনা করার আহ্বানে কান তো দেনইনি, উল্টো বাজে সব গালাগাল দিয়ে বসেছেন! অবশ্য মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের কাছ থেকে এমন আচরণ পেলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। যেখানে সিস্টার বারবারা সুষ্ঠু-স্বাভাবিক মানুষ হয়ে তাকে অসম্মান করেছে, সেখানে অসুস্থ মি. টাকারের আচরণ তো কিছুই না! কনভেন্টে ফিরেই মাদার সুপেরিয়রের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন সিস্টার।

এলিভেটরটা ফিরে আসতে আসতে আরও কয়েকবার বজ্জ্বাত হলো। এবার সিস্টার কুপারটাইন সবার প্রথমেই চুকে পড়লেন। চতুর্থ তলা...আর তৃতীয় তলাতেও উঠল করেকজন। সবার চাপে এলিভেটরের একদম পেছনের দিকে চলে গেলেন সিস্টার কুপারটাইন। লবিতে এসে যখন থামল ওটা, তখনও সবার বের হবার জন্য অপেক্ষা করতে হলো তাকে।

এলিভেটর থেকে নেমে, চারপাশে একবার নজর বুলালেন তিনি। রিসিপশন এলাকা প্রায় জনশূন্য। সিস্টার বারবারা-কেও দেখা যাচ্ছে না। ডেক্সের পেছনে রাখা দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। পাঁচটা বেজে দশ। বাইরে অন্ধকার রাজত্ব করছে। এমনভাবে বৃষ্টি পড়ছে, যেন বহুদিন সে মাটিকে সম্পর্শ করার সুযোগ পায়নি।

হে দৈশুর, ভ্যানে যাবার আগেই তো ভিজে একসা হয়ে যাব! মেয়েটা গেল কোথায়? ডেক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, সাথে সাথে চোখ তুলে চাইল রিসিপশনিষ্ট মেয়েটা। 'আমি কীভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারি?'

কোনওক্রমে হাসলেন সিস্টার কুপারটাইন। ‘আমি আসলে সিস্টার বারবারাকে—’
বজ্রপাতের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল সিস্টারের প্রশ্ন আর রিসিপশনিস্টের জবাবের
অংশবিশেষ।

‘এক মিনিট আগেই বেরোতে দেখলাম।’

‘বের হয়ে গিয়েছে! আপনি নিশ্চিত?’

‘জু, সিস্টার।’ চিন্তিত মনে হলো মেয়েটাকে। ‘কেন, কোনও অসুবিধা?’

‘না, না। অনেক অনেক ধন্যবাদ।’ শুধু শুধু মেয়েটাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেবার কোনও
মানে হয় না। কিন্তু অসুবিধা তো আছেই! এমনভাবে আদেশ অমান্য করার সাহস
সিস্টার বারবারা পেল কোথায়! রাত পোহাবার আগেই, মাদার সুপেরিয়র এই ঘটনার
ব্যাপারে শুনতে পাবেন।

অবশ্য যদি সহি-সালামতে কলভেন্টে পৌছাতে পারেন তবেই। এমন ভয়াবহ বড়ের
মাঝে অতটা পথ পাড়ি দিতে হবে, ভাবতেই ভয় লাগছে!

এক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে, দরজার কাঁচ লাগানো অংশটা দিয়ে বাইরে
তাকালেন সিস্টার কুপারটাইন। ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ঈশ্বর পাঠিয়ে দিলেন আরেকটা
বজ্রপাত। এক বলক আলোয় পার্কিং লটের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যান্টা পরিষ্কার
দেখা গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সেই সাথে মাথার ভারী কাপড়টার জন্যও ধন্যবাদ!

দরজা খুলে বাইরে বের হলেন তিনি। পানির ধারা এসে তার ভারী জুতা আর দেহের
পোশাক ভিজিয়ে দিল। ভ্যান পর্যন্ত অর্ধেক দূরত্ব পাড়ি দেবার আগেই দেখা গেল, পানির
ফেঁটা তার চশমার কাঁচ একদম ভিজিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে প্রায় অঙ্ক তিনি এখন!
কাঁচ পরিষ্কার করার জন্য চশমা খুলতেই, হোঁচট খেলেন নান। তীব্র এক বলক ব্যথা
তার মুখ দিয়ে চিৎকার বের করে আনল। ব্যথার বালকটা শেষ হয়ে যেতে সিস্টার
কুপারটাইন বুঝতে পারলেন, চোখের উপরে নেই সেই চশমা। অন্ধকারের মাঝে খুঁজে
পাওয়া অসম্ভব জেনেও, চেষ্টা চলালেন। কিন্তু না, মিল না সেগুলো। ঈশ্বরের কৃপায়
অবশ্য কলভেন্টে আরেক জোড়া আছে। তাই এই মুহূর্তে আর সময় নষ্ট না করে, বৃষ্টির
হাত থেকে বাঁচার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত।

অন্দের মতোই এগিয়ে গেলন তিনি। কয় পা এগিয়েছেন বলতে পারবেন না, আচমকা
একটা ইঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ কানে এল তার। চোখ তুলে দেখতে পেলেন, ভ্যানটা
এগোতে শুরু করেছে! মানে কী! সিস্টার বারবারা কি ওকে এখানেই ফেলে রেখে যেতে
চায়?

‘দাঁড়াও!’ আলোর উৎসের দিকে চিৎকার করতে করতে এগোলেন তিনি। ভ্যানটা
দাঁড়িয়ে গেলে, হাচড়ে পাচড়ে সিস্টার প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে এলেন।

ইঞ্জিন আবার গর্জন করতে শুরু করার সাথে সাথে কথার তুবড়ি ছোটালেন বয়স্ক
নান। ‘কোথায় ছিলে তুমি? লবিতে দেখলাম না যে? বিচারবুদ্ধি এখনও জন্মায়নি? গাড়ির

কাছে যদি একা একা আসতেই হতো, তাহলে তো এটা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে
আমাকে তুলে নিতে পারতে?

‘আমি দুঃ-’ তার সঙ্গীর কর্তৃপাত্রের আড়ালে তালিয়ে গেল। অবশ্য না গেলেও
তেমন কিছু যেত-আসত না। কেননা সিস্টার কুপারটাইনের কথা এখনও শেষ হয়নি।

‘ভিজে একসা হয়ে গিয়েছি! চশমাটা যে কই পড়ল, স্টশুর জানেন! কী আর
বলব...এই, দেখে শুনে চালাও!’

ভ্যান্টা আরেকটু হলেই খাদে পড়ে যেত, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল সিস্টার বারবারা।

‘দয়া করে দেখে চালাও-’ বলতে বলতে থেমে গেলেন বয়ক্ষা নান। তার বকারকা যে
এই মুহূর্তে কেবল সঙ্গীর মনস্থংযোগে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করবে, তা এতোক্ষণে বুঝতে
পারলেন। চুপ হয়ে গেলেন সাথে সাথে।

বৃষ্টির পানি মুছে সুবিধা করতে পারছে না ওয়াইপার দুটো। সামনের রাঙ্গা একদম^১
আবছা দেখা যাচ্ছে। সিস্টার বারবারা তার দিকে একবার তাকাল বটে, কিন্তু কিছু বলল
না। অন্ধকারে কমবয়সী সঙ্গীর মনের ভাব একদম বুঝতে পারলেন না সিস্টার
কুপারটাইন। এক মুহূর্ত পরেই, সামনের দিকে নজর দিল সিস্টার বারবারা। ভেজা,
পিছিল রাঙ্গায় গাড়িটার নিয়ন্ত্রণ রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন সিস্টার কুপারটাইন। একগাদা গাছের অবয়ব
নজরে পড়ল তার, ওগুলোর পাশ দিয়ে একটা পার্শ্ব-রাঙ্গা চলে গিয়েছে। সেই পার্শ্ব-রাঙ্গা
দিয়েই ভ্যান্টাকে ঢুকিয়ে দিল সিস্টার বারবারা।

‘ভুল পথে যাচ্ছ তো!’ বাড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে বলে উঠলেন বয়ক্ষা নান। কিন্তু
সিস্টার বারবারা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, বা শুনলেও পাতা দিল না। ভ্যান্টা
আঁকা বাকা হয়ে থাকা গাছের নিচ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল।

‘শুনতে পাচ্ছ না?’ সঙ্গীর পোশাকের হাতা ধরে টান দিলেন সিস্টার কুপারটাইন।
‘ভুল পথে যাচ্ছ তো!’

এবার নড় করল সিস্টার বারবারা, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। ডান হাতে
ইগনিশন থেকে চাবীটা তুলে নিয়ে, বাঁ হাত চালিয়ে দিল ভ্যান্টের ফ্লারের দিকে। এক
মুহূর্তের জন্য সিস্টার কুপারটাইনের মনে হলো, চোখের সামনে যেন কোনও শিকারী
পাখি এসে উপস্থিত হয়েছে!

কেবলমাত্র এক মুহূর্তের জন্য মেঝের দিকে ঝুঁকে রইল সিস্টার বারবারার অবয়ব।
এরপরই সোজা হয়ে বসল সে। আর ঠিক সেই ক্ষণটাতেই দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠল
বিদ্যুত চমকে!

সেই আলোতে অড্রুত দর্শন, বিকৃত চেহারাটা দেখতে পেলেন সিস্টার কুপারটাইন।
সেই সাথে সামনের থাকা মানুষটার হাতে ধরা লোহার রডটাও! এমনকি তার দিকে
ওটার তীব্রগতিতে এগিয়ে আসাও পরিষ্কার বুঝতে পারলেন!

তবে বজ্রপাতার আওয়াজ আর শোনা হলো না তার!



পাঁচ

হাঁপাতে হাঁপাতে কোমর দুলিয়ে চলছে নরম্যান। ভ্যানের পেছন দিকটায় অনেকটুকু ফাঁকা জায়গা। পোশাকের আবরণ সরিয়ে, মৃত পা জোড়াকে খুব সহজেই ছড়িয়ে দেয়া গেছে। অন্য নান, মানে সিস্টার বারবারার নিচের দিকটা নির্মল ছিল। কিন্তু এর আবার অভ্যাস অন্য। ওই কমবয়সীটাকেই মনে মনে চাঞ্চিল নরম্যান। তবে আফসোস, কিছু করার সময় পায়নি। এমনকি ভালোভাবে যে দেখবে, সে সুযোগও হয়নি।

এই মালটা আবার বয়স্ক, কিন্তু এখন তার হাতে সময় আছে। অবশ্য ঢোক মুদলে যখন কিছু দেখা যায় না, তখন অনুভূতিটাই আসল হয়ে দাঁড়ায়।

ঈশ্বর...হায়, ঈশ্বর...

হাঁপাতে হাঁপাতেই একদিকে সরে বসল নরম্যান। সারা দেহ ঘামে ভিজে চুপসে আছে। কিন্তু শেষ হয়েছে কাজটা। ঈশ্বর...ঈশ্বরই ওকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে এই নানদেরকে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী এখন তার স্ত্রী। অনেক বছর আগে যেমন নরম্যান জাতি ইংল্যান্ড জয় করেছিল, আজ তেমনি নরম্যান বেটস জয় করে নিয়েছে ঈশ্বরের স্ত্রীকে!

অন্ধকারে মুচকি হাসতে হাসতে মাথার কাপড়টা জায়গামতো বসিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ও। নিখুঁত ছদ্মবেশ। সিস্টার কুপারটাইনকে সে বোকা বানিয়েছে। শুধু তাকেই না, সবাইকেই বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছে ও। অবশ্য মেয়ে মানুষের চরিত্রে অভিজ্ঞতার ঝুলি কম ভারী নয় তার।

বিশ্বাস একটা রঙমঞ্চ। এখানে নানা চরিত্রে অভিনয় করে যেতে হয়।

এই যেমন আজ রাতেই প্রথমে একবার নারীর চরিত্রে, আর পরে আবার পুরুষের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে ওকে। আপনমনেই হাসছিল সে, কিন্তু বজ্রপাতের আওয়াজে সম্পত্তি ফিরল। আরেকবার যখন বিদ্যুত চমকালো, পাশে শুয়ে থাকা ভূতুড়ে দেহটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল বেচারা। তাড়াতাড়ি লাশটার স্কার্ট নামিয়ে উরু আর পা ঢেকে ফেলল। এই দেহের আর কোনও দরকার নেই ওর, এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা ব্যবস্থা করতে পারলে হয়।

কিন্তু ব্যবস্থা করবে কী ভাবে?

বৃষ্টিম্বাত উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকালো নরম্যান। রাস্তার আর গাছের মাঝখানে একটা ছোট গর্ত মতো আছে। ওখানে লাশটাকে পাতা-পুতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখা যাবে না। অতিসত্ত্ব কেউ না কেউ

এদিকে এসে জিনিসটাকে আবিষ্কার করে ফেলবে। তবে যদি কবর খোঁড়া যায় তো...

ঘুরে তাকাল নরম্যান। আরেকটা বিদ্যুত চমকের আলোয়, ভ্যানে কী কী জিনিস আছে তা পরিষ্কার দেখতে পেল। লোহার রডটা তো আছেই, কিন্তু কোনও বেলচা নেই, থাকার কথাও না। এদিকে খালি হাতে তো আর কবর খোঁড়া সম্ভব না! চমকে উঠে নরম্যান টের পেল, কাঁপছে ও! এর জন্য ঠান্ডার সাথে সাথে, আরও অন্য কিছুও দায়ী।

আরেকটা উপায় নিশ্চয় আছে। হে টিশুর... থাকতেই হবে!

ভ্যানের সামনের দিকে এগোল নরম্যান, হঠাৎ ওর পাশে কিছু একটা যেন নড়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে দিতেই, ধাতব একটা কন্টেইনারের স্পর্শ পেল ও। চোখের কাছে ওটাকে তুলে ধরতেই ভেতর থেকে ভেসে আসা আওয়াজে বুঝতে পারল, তরল কিছু একটা দিয়ে ভর্তি ওটা। কন্টেইনারের গাঁয়ে লেখা কাগজটা পড়ার আগেই নরম্যানের নাক জানিয়ে দিল, গ্যাসোলিন হাতে ধরে রেখেছে সে। নিশ্চয় জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য এটাকে রাখা হয়েছে।

সমস্যার সমাধান পেয়ে গিয়েছে নরম্যান।

লাশটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, সেই সাথে ভ্যানটাকেও। এরচাইতে ভালো বুদ্ধি আর হয় না!

অন্ধকারেই হাতড়াতে শুরু করল ও, ম্যাচ বাক্স খুঁজছে। কিন্তু না, একটাও নেই! ভ্যানের ভেতরে কোনও ম্যাচ বাক্স নেই। অস্বাভাবিক না ব্যাপারটা। সাধারণত, বেলচার মতো ম্যাচ বাক্সও নানদের ভ্যানে রাখার মতো জিনিস না। তবে গোত্তুল কম্পার্টমেন্টে থাকলেও থাকতে পারে।

কোনওমতো ড্রাইভিং সীটে পৌঁছে, কম্পার্টমেন্টটা খুলে ফেলল নরম্যান। ভেতরের জিনিসগুলো ওর কোলে গড়িয়ে পড়ল। একটা খালি টিসু বক্স, ছোট ক্ষুড়াইভার, রাস্তার ম্যাপ, ছোট ফ্ল্যাশ লাইট। কিন্তু ম্যাচ বাক্স নেই! আবারও কাঁপতে শুরু করল লোকটা। সেই দানবীয় কঠিন গুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে।

সাহায্য...কেউ আমাকে সাহায্য করো! নিজের কঠটা নিজের কানেই বড় অপরিচিত ঢেকল।

শান্ত হও, কোথেকে যেন ডা. ক্লেইবর্নের শান্ত, সমাহিত কঠ ভেসে এল। মনে রেখো, আমি তোমার হয়ে কাজ পূরো করে দিতে পারব না। শেষ পর্যন্ত তোমার নিজেকেই শেষ করতে হবে। নিজেকে সাহায্য করা শিখতে হবে।

বড় করে শুস নিল নরম্যান। যেটাকে দানবীয় কঠিন বলে মনে করেছিল, সেটা আসলে ভ্যানের ছাদে পড়তে থাকা বৃষ্টির ফেঁটার আওয়াজ! ঠিক বলেছেন, ডা. ক্লেইবর্ন। নিজেকে ওর নিজের-ই সাহায্য করতে হবে। শান্ত থাকতে হবে

এখন। সামনে যে যে কাজ করতে হবে, তার জন্য চাই শান্ত মন আর নিষ্পত্তি হাত।

ওর মনে পড়ে গেল, পেছনে একটা কম্বল দেখেছিল। অতিরিক্ত চাকাটা দেকে রাখা হয়েছে ওটা দিকে। ফিরে চলল নরম্যান। ভেতরে পড়ে থাকা জিনিসটাকে-ওই নান জিনিসটাকে ভয় পাচ্ছে কেন জানি। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগে...

চোখ বন্ধ করেই হাত বাড়িয়ে দিল সে, কোনওক্রমে কম্বলটা দিয়ে লাশটাকে দেকে দিল। আবার যখন চোখ খুলল, তখন অপার্থিব লাশটা কম্বল দিয়ে ঢাকা। ওটার নিচে যে কিছু আছে, তা বলে না দিলে কেউ আন্দাজই করতে পারবে না। আর যদি কেউ নাক গলাতে চায়, তাহলে...

ড্রাইভিং সিটের পেছনে ছুঁড়ে দেয়া লোহার রডটা আঁকড়ে ধরল নরম্যান। সীটে বসে জিনিসটাকে দুই পায়ের ফাঁকে ফেলে দিল। বিপদে পড়লে, আত্মরক্ষা করা যাবে।

তবে সাবধানে কাজ করতে পারলে সম্ভবত তার আর দরকার হবে না। এই যে...হাতের কাঁপাকাঁপি থেমে গিয়েছে। এখন আবার গাড়ি চালানো যায়। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে ওকে। ইগনিশনে চাবি ঢেকাতেই, খকখক করে কেশে উঠল যন্ত্রটা। সাবধানতার সাথে গাড়িটাকে আবার রাস্তায় ফিরিয়ে আনল নরম্যান। এই ছোট একটা কাজই, ওকে শান্ত করে তুলল। ভ্যানটাকে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, তখন নিচয় নিজের জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সেই সাথে নিজের ভবিষ্যতকেও। এখন দরকার সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করা।

সামনে নিচয় কোনও স্টের বা কোনও সার্ভিস স্টেশন পড়বে। ওখানে ম্যাচ পাওয়া যাবে। তবে বাইপাস ধরে এগোলে, রাস্তার পাশে ওই দুই ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মিলবে বলে মনে হয় না। হাইওয়েতে থাকাই ভালো।

যেই ভাবা, সেই কাজ।

হাইওয়েতে উঠে আরেকটু শান্ত হয়ে এলো সে। এই রাস্তায় দোকানপাট পাবার সম্ভাবনা বেশি। মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল নরম্যানের। কিন্তু স্টিয়ারিং হইলের সাথে ওর হাতার ঘষা খাবার শব্দ সেই ফুরফুরে ভাবটাকে নিমিষে হাওয়া করে দিল। হাসপাতাল থেকে বেরোবার সময়, এই পোশাকটা ওকে অনেক সাহায্য করেছে। কেউ দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু এখন এই পোশাকটাই ওর জন্য শাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বেশে কোনও গ্রাম্য দোকানে প্রবেশ করা সম্ভব না। সিস্টার বারবারা নিজে চুকলেও, দোকানের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আবার কোনও সার্ভিস স্টেশনে এভাবে ঢোকাও বিপদজনক। চুকলে কী হতে পারে, সেই দৃশ্য খেলা করে গেল ওর মনেং।

বৃঞ্ছিত এক রাবিবারের সন্ধ্যা। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। অফিসে
নিজের বাবার সাথে বসে আছে কোনও কমবয়সী ছেলে। হয়তো কমিক দেখছে,
আর নয়তো শুনছে রেডিওর গান। হঠাৎ ওকে বিরক্ত করে দিয়ে একটা হর্ন বেজে
উঠল।

হায় স্টৈশুর! এ যে দেখি এক নান! আর সে কিনা গ্যাস না, ম্যাচ কিনতে
চাচ্ছে! ম্যাচ দিয়ে নান কী করবে? নিশ্চয় কোথাও কোনও ঘাপলা আছে। এই,
বাবা, বাইরে গিয়ে দেখতো!

নরম্যান নিশ্চিত, এভাবেই ঘটবে ঘটনা!

এখন উপায়? শাস্ত হও, নিজেকেই বলল। এগোতে থাকো।

কিন্তু এগিয়ে যাব কোথায়?

পোশাক যে খুলে ফেলবে, সে উপায়ও নেই। নিচে পরে থাকা হাসপাতালের
নীল ইউনিফর্ম দেখা মাত্র সবাই বুঝে ফেলবে যে ও পাগলাগারদ থেকে
পালিয়েছে!

ম্যাচের চাইতে, সাধারণ পোশাক এখন বেশি দরকারী হয়ে পড়েছে।

এদিকে বজ্রপাত কিন্তু থেমে নেই, প্রতি মুহূর্তে যেন ওকে বিদ্রূপ করে যাচ্ছে।
বজ্রপাত নাকি স্টৈশুরের কঠ। কিন্তু স্টৈশুর ওকে বিদ্রূপ করবেন কেন? তা-ও আবার
এতো দূর নিয়ে এসে? আরে নাহ, চিতার কোনও কারণ নেই। তিনি এতো দূর
নিয়ে এসেছেন, তিনিই উপায় বাতলে দিবেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকের আলোয়, হাইওয়ের পাশে দাঁড়ানো একটা
অবয়ব দেখতে পেল নরমান। মানুষটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে আছে। একটা
কার্ডবোর্ডে রক্ষ হাতে একটা শব্দ লিখে সেটা উঁচু করে ধরে আছে।

কী করতে হবে, স্টৈশুর সেই কার্ডবোর্ডের লেখার মাধ্যমে সেটা বুঝিয়ে
দিয়েছেন।

কেননা বড় বড় করে ওতে লেখা-

ফেয়ারভিল



ছয়

ডা. স্টাইনারের চামড়া দিয়ে হাতল মোড়ানো চেয়ারে বসার আগে, ডা. অ্যাডাম ক্লেইবর্ন টেরও পাননি যে তিনি কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মুহূর্তের জন্য যে আরামটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটার জায়গায় স্থান করে নিল বিরক্তি। কেননা নিজ অফিসের প্লাস্টিকের চেয়ার আর প্লাইটের আসবাবের কথা মনে পড়ে গিয়েছে তার। ক্লান্ত না হয়ে উপায় কী! প্রতি দিন দুই শিফটে কাজ করতে হয় তাকে। আর এদিকে স্টাইনার কেবল বসে বসে আদেশ দিয়েই খালাস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। এখন ওসব ভাবার সময় না।

‘হ্যালো, ডা. ক্লেইবর্ন বলছি। দেরি করার জন্য দুঃখিত।’

‘অসুবিধা নেই।’ ভরাট, উঁচু কঞ্চে জবাব এলো। ‘আমি মার্টি ড্রিসকল, এন্টারপ্রাইজ প্রোডাকশন থেকে বলছি। ছায়ছবিটার ব্যাপারে কথা বলা জন্য ফোন করেছি।’

‘ছায়াছবি?’

‘হ্যাঁ, চলচ্চিত্র। স্টাইনার আপনাকে বলেননি?’

‘না তো।’

‘আজব, আমি তো বৃহৎপতিবারেই ওর সাথে কথা বললাম। প্যাকেজটা পাননি?’

‘প্যাকেজ? কোন প্যাকেজ?’

‘দেরি যেন না হয়, সেজন্য তো রেজিস্ট্রি করে শুভ্রবার সকালেই জিনিসটা পাঠালাম।’

‘তাহলে তো পেয়ে যাবার কথা।’ নড় করতে করতে বললেন ক্লেইবর্ন। সাথে সাথে তার মনে হলো, কথা তো হচ্ছে ফোনে! তাহলে নড় করে কী লাভ! এমন কাজ এখানকার কোনও অতিথির শোভা পায়। এখানে কাজ করতে হলে, নিজেকেও অল্প বিস্তর পাগল হতে হয় আরকী!

‘আমি প্যাকেজের ব্যাপারে কিছু জানি না।’ বললেন তিনি। তারপরই যোগ করলেন, ‘একটু দাঁড়ান।’

ডেক্সের অন্য পাশে একটা বড় বাদামী রঙের এনভেলপ পড়ে আছে। সেটা নিজের দিকে টেনে এনে, উপরে লেখা ঠিকানাটা পড়লেন ক্লেইবর্ন। ‘আপনার প্যাকেজ এসেছে, ডেক্সেই ছিলো।’

‘ডা. স্টাইনার কী খুলেছেন?’

পরীক্ষা করে দেখল ক্লেইবন। ‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে কিছু জানালেন না যে? ক্রিপ্টটা পড়ার পর, সাথে সাথে জানাবার কথা-’ আরও কিছু কথা বললেন মার্টি, কিন্তু বজ্রপাতের আওয়াজে তা ঢাকা পড়ে গেল।

‘কষ্ট করে আরেকবার বলবেন? আমাদের এখানে প্রচল বড় বৃষ্টি হচ্ছে।’

‘চিত্রনাট্যের কথা বলছিলাম।’ কষ্ট উঁচু করে বললেন ড্রিসকল। ‘ভেতরে আছে নিশ্চয়। একটু দেখুন তো।’ অধৈর্য শোনাল গলাটা।

ক্লেইবন এনভেলপটা খুলে, ভেতরের সবকিছু টেবিলে ফেললেনঃ তিনটা আট বাই দশ আকৃতির ছবি, সেই সাথে চামড়ায় বাঁধানো অনেকগুলো কাগজ।

চামড়ার বইটার কান্ডারে, টাইপরাইটারে লেখা শব্দটা পড়লেন তিনি। ‘উন্মাদিনী।’

‘ওটোই। নাম পছন্দ হয়েছে?’

‘খুব একটা না।’

‘স্টাইনারেও পছন্দ হয়নি।’ ড্রিসকল আমুদে কঞ্চে বলল। ‘চিন্তা করবেন না, নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। হয়তো আপনি আর অ্যামেস এক হয়ে আরও ভালো কোনও নাম নির্বাচন করতে পারবেন।’

‘অ্যামেস?’

‘রয় অ্যামেস। আমার লেখক। ভাবছি, কয়েকদিনের মাঝেই ওকে আপনাদের সাথে দেখা করতে পাঠব। ঠিকঠাকভাবে সব কিছু লিখল কিনা, তা সারেজমিনে দেখে আসুক। সেই সাথে যদি বেটসের সাথে কথা বলার সুযোগ মেলে—’

‘আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কী নরম্যান বেটসের কথা বলছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু তার সাথে চিত্রনাট্যের কী—’

‘ওহ হো, ডাঙ্গার সাহেব, ভুলেই গিয়েছিলাম।’ মুচকি হাসল ড্রিসকল। ‘আপনি যে ওটা পড়েননি, তা একদম মনে ছিল না। আমরা বেটসের কাহিনীর উপর নির্ভর করে একটা ছবি বানাচ্ছি।’

ক্লেইবনের হাত থেকে চামড়ায় বাঁধানো বইটা ডেক্সে পড়ে গেল। উন্মাদিনী-লেখাটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি।

‘ডক-শুনতে পাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিছু তো বলুন। আপনার কী মত?’

‘আমার পেশাগত মত শুনতে চাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ।’

‘তাহলে কান খুলে শুনুন, আমার ধারনা-আপনার মাথায় সমস্যা আছে।’

ড্রিসকল হাসিতে যেন ফেটে পড়ল। ক্লেইবর্ন কিছু শুনে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ঠাট্টা করছি না। নরম্যান বেটসকে নিয়ে ছবি বানাবার কথা একমাত্র পাগলই ভাবতে পারে।’

‘আইনগত দিক থেকে কোনও বাঁধা নেই। আমরা চেক করে দেখেছি—’

‘আপনি বুঝতে পারছেন না—’

কিন্তু ড্রিসকলের তার কথায় মন নেই। ‘ধরুন যদি বসন্তের শেষের দিকে রিলিজ দেয়া যায়, সবার মাথা ঘুরে যাবে।’

‘খেলো একটা কাজ করতে যাচ্ছেন আপনারা—’

‘খেলো! কী যে বলেন না! প্রচুর টাকা ঢালতে যাচ্ছি আমরা। কম করে হলেও, দেড় মিলিয়ন তো হবেই।’

‘আমি পয়সার কথা বলছি না।’

‘ঠিক, বলে অবশ্য লাভও নেই। ওসব আমার মাথা ব্যথা।’

‘অর আমার মাথা ব্যথা হলো রোগীর ভালো মন্দ।’

‘এতে দুশ্চিন্তা করবেন না তো! আমরাও আপনার রোগীর ভালো চাই। সেজন্যই তো আগে আগে আমাদের লেখককে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি কোথাও কোনও ভুল-ভাস্তি হয়ে থাকে।’

‘পুরো ব্যাপারটাই তো একটা ভুল।’

‘আহ হা, ডক, আপনি তো এখনও চিরন্নাট্য পড়েই দেখেননি। আগে দেখে নিন। আর মনে রাখবেন, যদি কোথাও কোনও পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে এই সোমবারের এক সপ্তাহের মাঝেই করতে হবে। আপনার একটু সাহায্য দরকার শুধু। যদি মনে করেন যে অ্যামেস আসলে ভালো হবে, তাহলে বলুন শুধু। আমি সাথে সাথে ওকে পাঠিয়ে দিব।’

‘ডা. স্টাইনার কী এই ছবির ব্যাপারে কোনও আপত্তি জানিয়েছেন?’

‘বলেছিলেন, পড়া শেষ হলেই আমাকে জানাবেন। ভালো কথা, তিনি ফিরে এলে যদি আমাকে একটু কষ্ট করে জানান—’

‘জানাব।’

‘ধন্যবাদ। আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগল। দিনটা ভালো কাটুক।’

ফোন রেখে দিল ড্রিসকল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আরাম চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলেন ক্লেইবর্ন। দিনটা ভালো কাটুক! ভালো তো মার্টি ড্রিসকল আর ওর মতো লোকদের কাটে। এই ফোনটা ও সন্তুষ্ট কোনও রৌদ্রজ্ঞাল পরিবেশ থেকে করেছে।

এখানে নেই রোদের কোনও লক্ষণ, আছে কেবল অন্ধকারের রাজত্ব। নেই কোনও গান, আছে শুধু বজ্রপাত আর বৃষ্টির আওয়াজ। স্টাইনারের কথাও একবার ভাবলেন তিনি। লোকটা নিশ্চয় এখন তার ফাস্ট ক্লাস সীটে বসে নাক

ডাকাচ্ছে। যাবার আগে লোকটা ওকে এই চিত্রনাট্যের কথা বলে গেলেন না কেন? এর গুরুত্ব কি তিনি ধরতে পারেননি?

আসলে নরম্যান বেটসের কী হলো না হলো, তাতে ডা. স্টাইনারের কিছু যাই আসে না। তার দরকার সেন্ট লুইসের মিটিংটা ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়া।

এসব ভাবতে ভাবতেই, হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। তুমি কিছু না জেনেই, ডা. স্টাইনারের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মন্তব্য করে বসেছ, বললেন নিজেকে। আগে অন্তত চিত্রনাট্যটা তো পড়ে দেখ।

চামড়া মোড়ানো পানুলিপিটাকে টেনে নিলেন ক্লেইবর্ন। কিন্তু নজর ছবি তিনটার উপর পড়ামাত্র থমকে গেলেন। প্রথমটা হাস্যরত এক লোকের বুক পর্যন্ত ছবি। চিনতে বিদ্যুমাত্র কষ্ট হলো না তার, পল মরগ্যান। বর্তমান সময়ের স্টার লোকটা। একে নরম্যানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে নাকি!

অন্য দুই ছবিতে যেহেতু শুধু দুজন মেয়েকেই দেখা যাচ্ছে, তাই ধারনাটা আরও পোক্ত হলো তার মনে। অবশ্য এই দুই মেয়েকে তিনি চেনেন না, নাকি চেনেন?

হাস্যরত, বড় বড় চোখের চেহারাটাকে যে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে!

নিজের চোখও বড় বড় হয়ে গেল ক্লেইবর্নের। এই চেহারাটা যে অনেক আগে তিনি খবরের কাগজে দেখেছিলেন। এরপর আবার নরম্যান বেটসের ফাইলেও দেখেছেন। এ যে মেরি ক্রেন!

কিন্তু তা কী করে সম্ভব! মেরি ক্রেন তো মৃত! নরম্যান ওকে নিজ হাতে শাওয়ার স্ট্যান্ডে খুন করেছে।

তাহলে মেয়েটার মতো দেখতে একজনকে খুঁজে বের করেছে স্টুডিও!

‘ডা. ক্লেইবর্ন!’ ওটিস দরজার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে। হাঁপাচ্ছে লোকটা।

চোখ তুলে চাইলেন ডাক্তার, হাত থেকে ছবি গুলো ডেক্সের উপর পড়ে গেল। ‘কী হয়েছে?’

‘তাড়াতাড়ি আসুন...লাইব্রেরিতে...লাইব্রেরিতে একটা অ্যাটন-’

অ্যাটন! শব্দটা চমকে দিল ডাক্তারকে। দৌড়ে এগোলেন তিনি। তাড়াভংড়োয় লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে, সিঁড়ি বেয়েই উপরে ওঠা শুরু করে দিলেন।

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইলেন তিনি।

‘আমি জানি না, ওখানে ছিলাম না-’

‘ছিলাম না মানে? ওদেরকে একা রেখে গিয়েছিলে?’

‘ঝড় হচ্ছিল, সি ওয়ার্ডে গিয়ে ওখানকার রোগীদের যার যার ঘরে চুকিয়ে দিচ্ছিলাম। ওখানে অন্য কারও ডিউটি নেই আজ-’ হাঁপাচ্ছে ওটিস। ‘আমি যখন

ডাকাচ্ছে। যাবার আগে লোকটা ওকে এই চিনাট্যের কথা বলে গেলেন না কেন? এর গুরুত্ব কি তিনি ধরতে পারেননি?

আসলে নরম্যান বেটসের কী হলো না হলো, তাতে ডা. স্টাইনারের কিছু যাই আসে না। তার দরকার সেন্ট লুইসের মিটিংটা ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়া।

এসব ভাবতে ভাবতেই, হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। তুমি কিছু না জেনেই, ডা. স্টাইনারের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মন্তব্য করে বসেছ, বললেন নিজেকে। আগে অন্তত চিনাট্যটা তো পড়ে দেখ।

চামড়া মোড়ানো পান্তুলিপিটাকে টেনে নিলেন ক্লেইবর্ন। কিন্তু নজর ছবি তিনটার উপর পড়ামাত্র থমকে গেলেন। প্রথমটা হাস্যরত এক লোকের বুক পর্যন্ত ছবি। চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না তার, পল মরগ্যান। বর্তমান সময়ের স্টার লোকটা। একে নরম্যানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে নাকি!

অন্য দুই ছবিতে যেহেতু শুধু দুজন মেয়েকেই দেখা যাচ্ছে, তাই ধারনাটা আরও পোক্ত হলো তার মনে। অবশ্য এই দুই মেয়েকে তিনি চেনেন না, নাকি চেনেন?

হাস্যরত, বড় বড় চোখের চেহারাটাকে যে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে!

নিজের চোখও বড় বড় হয়ে গেল ক্লেইবর্নের। এই চেহারাটা যে অনেক আগে তিনি খবরের কাগজে দেখেছিলেন। এরপর আবার নরম্যান বেটসের ফাইলেও দেখেছেন। এ যে মেরি ক্রেন!

কিন্তু তা কী করে সম্ভব! মেরি ক্রেন তো মৃত! নরম্যান ওকে নিজ হাতে শাওয়ার স্ট্যান্ডে খুন করেছে।

তাহলে মেয়েটার মতো দেখতে একজনকে খুঁজে বের করেছে স্টুডিও!

‘ডা. ক্লেইবর্ন!’ ওটিস দরজার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছে। হাঁপাচ্ছে লোকটা।

চোখ তুলে চাইলেন ডাক্তার, হাত থেকে ছবি গুলো ডেক্সের উপর পড়ে গেল। ‘কী হয়েছে?’

‘তাড়াতাড়ি আসুন...লাইব্রেরিতে...লাইব্রেরিতে একটা অফটন-’

অফটন! শব্দটা চমকে দিল ডাক্তারকে। দৌড়ে এগোলেন তিনি। তাড়াতাড়িয়ে লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে, সিঁড়ি বেয়েই উপরে ওঠা শুরু করে দিলেন।

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইলেন তিনি।

‘আমি জানি না, ওখানে ছিলাম না-’

‘ছিলাম না মানে? ওদেরকে একা রেখে গিয়েছিলে?’

‘বাড় হচ্ছিল, সি ওয়ার্ডে গিয়ে ওখানকার রোগীদের যার যার ঘরে চুকিয়ে দিচ্ছিলাম। ওখানে অন্য কারও ডিউটি নেই আজ-’ হাঁপাচ্ছে ওটিস। ‘আমি যখন



সাত

বো কেলার কম করে হলেও, আধ ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তা-ও আবার এমন হতচাড়া বৃষ্টিতে! এতোক্ষণে মাত্র দুটো গাঢ়ি এসেছে এ রাস্তায়, থামেনি একটাও। তাড়াভূংড়ো ছিল, নাকি ভয় পেয়ে-তা নিয়ে সন্দেহ আছে ওর। হয়তো ওর এলোমেলো চুল-দাঁড়ি আর মাথার কিণ্টুতকিমাকার হ্যাটটা দেখে আর থামার সাহস পায়নি। কে জানে, পাগলও ভেবে বসতে পারে।

দুই বছর আগের কথা, টুলসার অ্যাঞ্জেল গ্যাঙ্গের সাথে ঘূরত তখন বো। সমস্যা হলো, ওর নিজের তখন কোনও বাইক ছিল না। বাইকার গ্যাঙ্গের সদস্য, আর তার কিনা বাইক নেই! তাই কী হয়! এই ছোটখাট বিচুতিটুকু ঠিক করার জন্য একদিন রেকি করে এল হোভার ডিলারের দোকান। ঠিক করল লেবার ডে-তে সবাই যখন ছুটিতে থাকবে, তখন কাজ সারবে।

পেছনের দরজার তালাটা মনে হয় দুধের শিশুও খুলে ফেলতে পারত। ভেতরে ঢুকে ঘরের সবচাইতে বড় বাইকটা নিজের জন্য পছন্দ করে ফেলেছিল বো। অসাধারণ ছিল যন্ত্রটা, চলার জন্য যেন ফুঁসছিল। কিন্তু ডিলার হারামজাদা যে নিষ্কব্দ অ্যালার্মের ব্যবস্থা করে গিয়েছিল, তা কে জানত? ব্যস, দুই বছরের জন্য সোজা জেল!

কেঁপে উঠে গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল ও, কার্ডবোর্ড দিয়ে বানানো সাইনটা শুকনো রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে চেষ্টায় কোনও ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আসলে বোকামিটা ওর-ই, বাসে চড়া উচিত ছিল। গতকাল ছাড়া পেয়েছে, আর ছাড়া পাবার সাথে সাথে একটা বাসের টিকিটও দেবার প্রস্তাৱ দেয়া হয়েছিল ওকে। কিন্তু তা না করে, নগদ টাকা নিয়েছিল। অবশ্য তাতে খুব একটা ক্ষতিও হয়নি, ছয়টা গাঁজার স্টিকে দম দিতে পেরেছে। নারী মাংসের স্বাদ নিতেও ভোলেনি।

সকালের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, লিফট চেয়ে চেয়েই পুরো রাস্তাটা পার করে দিতে পারবে। রাস্তায় নামার সাথে সাথে একটা বড় তেলবাহী ট্রাকে লিফট পেয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার বলেছিল, ফেয়ারভিলের ঠিক মাঝ দিয়েই যাবে ওর গাড়ি। চাইলে বো-কে একদম জ্যাকের বাড়ির সামনেই নামিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বাড় শুরু হয়ে গেলে, ভয় পেয়ে যায় লোকটা। দুঃখিত, বঙ্গু, ঝুঁকি নিতে চাইছি না। বাড় না থামা পর্যন্ত এই বুক সেন্টারেই পার্ক করে থাকব। তাই আবার দুই পায়ের উপর ভরসা করে পথে নেমে যেতে হয়েছিল বো-কে।

সমস্যা হলো, আজ রাতেই ফেয়ারভিলে পৌছাতে হবে ওকে। কেননা জ্যাক আগামীকালই বেরিয়ে পড়বে বাইরে। অন্তত গত মাসে তো তেমনটাই জানিয়েছিল। জ্যাক ওর কাছে কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞ, হয়তো সাথে করে নিয়ে যাবে। আসলে জ্যাক ছাড়া ওকে নিয়ে ভাববার মতো কেউ নেই। পয়সাও নেই পকেটে।

এখন ভুগতে হচ্ছে, এতো জোরে বাতাস বইছে যে বৃষ্টি সরাসরি না পড়ে তির্যকভাবে পড়ছে! গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েও লাভ হচ্ছে না। আত্মরক্ষার প্রয়াসে সাইনটা মুখের সামনে তুলে ধরল ও।

কিন্তু তাতে কী আর কাজ হয়! এখন বো'র দরকার একটা ছাতা। নাহ, ভুল হলো। তার চাইতে বেশি দরকার পয়সা কামাবার কোনও ফন্দি। কেননা ফেয়ারভিলে গেলে যে জ্যাক ওকে আশ্রয় দেবেই, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

হঠাতে ভান দিক থেকে এক টুকরা আলো ভেসে এলো। নাহ, বিদ্যুৎ চমক বলে মনে হলো না। অনেকক্ষণ ধরে ভুল হচ্ছে। গাড়ি, অবশ্যে একটা গাড়ি ঢুকেছে এই রাস্তায়! সাথে সাথে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে এলো বো, সাইনটা তুলে ধরেছে। আলোটা আরও কাছে এলে বুবাতে পারল, ওটা একটা ভ্যান।

থাম, থাম শালা-আসলেই থেমে গেল বাহনটা!

কালক্ষেপণ না করে প্যাসেঞ্জার সীটের দরজার কাছে চলে গেল বো। জানালার ওপাশ থেকে ওর দিকে উঁকি দিল চালক। ‘লিফট দরকার নাকি?’

লিফট না লাগলে, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাল ছিঁড়ছি নাকি গর্দভ?

মনে মনে বললেও, মুখে বলার ভুলটা করল না সে। ‘ফেয়ারভিলে যাচ্ছেন?’
‘হ্যাঁ।’

সাইনটা ফেলে দিয়ে, ভ্যানে চড়ে বসল বো। দরজা লাগিয়েছে কী লাগায়নি, চলতে শুরু করল গাড়ি। ভেতরটা বেশ আরামদায়ক। উষ্ণ আর শুষ্ক। আরামে গা এলিয়ে দিয়ে, চালকের দিকে তাকাল সে। প্রথম দেখায় নিজের চোখের উপর-ই সন্দেহ জন্মাল ওর মনে। কেউ ড্রাকুলার মতো এমন বড় আলখেল্লা আর মাথা ঢাকার ওড়না নিয়ে ভ্যান চালায় নাকি? পরমুহূর্তেই বুবাতে পারল, চালক আসলে একজন নান!

দুশ্মরে খুব একটা বিশ্বাস নেই বো'র। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে হট করে দুশ্মরে বিশ্বাস জন্মালেও, কেউ ওকে দোষ দিতে পারবে না। একজন একাকী নান...একটা ভ্যান...এমন নির্জন রাস্তায় চালাচ্ছে! আচ্ছা, ভ্যানের মালিকানা বদল করা যায় না? নানের একটা ব্যবহা করলেই তো...

তাড়াছড়ো করার দরকার নেই, ধীরে সুস্থে কাজ করো...

এক মুহূর্তের জন্য চালিকা ওর দিকে তাকাল। অঙ্ককারে তার চেহারা বুঝতে পারল না বো। তবে চালিকাকে উদ্দেশ্য করে হাসতে ভুলল না। কে জানে, হয়তো ওর পোশাক দেখে বেচারি ভয় পেয়ে যেতে পারে!

নানের দৃষ্টি অবশ্য অধিকাংশ সময় রাস্তার দিকেই রইল। তবে এরমাবেও যে কয়েকবার মহিলা ওর দিকে তাকিয়েছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল বো। একদম হঠাৎ করেই খসখসে কঠে কথা বলতে শুরু করল নান।

‘ফেয়ারভিলে থাকেন নাকি?’

‘না, সিস্টার। এমনি যাচ্ছি, আমার কয়েক বন্ধু থাকে ওখানে।’

‘শহরটাকে তো তাহলে ভালমতোই চেনেন?’

‘কিছুটা তো চিনিই। আপনি কি ওখানে জন্মেছেন?’

নড় করল নান। ‘বড়ও হয়েছি ওখানকার কাছেই একটা জায়গায়। তবে অনেকদিন হলো যাওয়া হয়নি।’

‘কনভেটে চুকলে সম্ভবত খুব একটা ঘোরাফেরার সুযোগ মেলে না, তাই না?’

খিলখিল করে হাসল নান, হাসির আওয়াজটা অশ্রীল শোনালো বো’র কানে। একজন নানের মুখে এমন হাসি মানায় না। ‘তা ঠিক বলেছেন।’

‘খুব একটা কিছু মিস করেছেন বলে মনে হয় না।’ বলল বো। ‘আমার তো মনে হয়, ফেয়ারভিল আপনি ছেড়ে যাবার সময় যেমন ছিল, তেমনি আছে।’

বৃষ্টির বেগ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, নানের সব মনোযোগ এখন রাস্তার দিকে। ‘ফেয়ারভিলে বন্ধু-বান্ধব আছে বললেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভাবছিলাম যে, তাদের একজন মি. লুমিস না তো? স্যাম লুমিস?’

‘আমার বন্ধু না, তবে নাম পরিচিত মনে হচ্ছে। হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক নাকি?’

‘লোকটা তাহলে এখনও ফেয়ারভিলেই আছে?’

নড় করল বো। ‘বললাম না, খুব একটা পরিবর্তন ফেয়ারভিলে আসেনি।’

ফেয়ারভিলে পরিবর্তন না আসলেও, এখানে আসবে...এখুনি আসবে। কথা বলতে বলতেই একটা পরিকল্পনা করে ফেলেছে ও। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা একটু বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ওকে। স্যাম লুমিসের নাম কে না শুনেছে? ওই হতচাড়াটা অনেক বছর আগেরকার একটা খুনের কেসে জড়িয়ে পড়েছিল। বেটস মোটেল না কী যেন নাম ছিল জায়গাটার...ওখানে কে জানি খুন হয়েছিল। মোটেলটা এখন আর নেই, তবে ওখানে যাবার পার্শ্ব রাস্তাটা এখনও আছে।

হাইওয়ে হবার পর, ও রাস্তার ছায়াও কেউ মাড়ায় না এখন। আর আজ এই বৃষ্টিত রাতে তো কেউ যাবে বলে মনেই হয় না। আচ্ছা, কতক্ষণ ধরে চলছে গাড়িটা? সামনেই সেই পার্শ্ব রাস্তার প্রবেশমুখ। উইন্ডশীল্ডের বাইরের দৃশ্য দেখার

জন্য, পিটপিট করে তাকাল ও। কিন্তু এমন হারে বৃষ্টি পড়ছে যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে কপাল ভালো, বিদ্যুৎ চমকের আলোতে মুহূর্তের জন্য পরিষ্কার হয়ে গেল চারপাশ। কান্ধিত প্রবেশমুখটা দেখতে পেল ও। সাবধানে এগোতে হবে এখন। ‘সিস্টার?’

‘বলুন।’

‘সামনের ছোট রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন? ডানের ওই রাস্তায় ঢুকে পড়ুন। শহরে যাবার শর্টকাট ওটা।’

‘ধন্যবাদ।’

বো’র মনে হলো, নান বেচারি যেন আবারও অশ্রীলভাবে হাসল। তবে সেটা ওর ভুলও হতে পারে। হয়তো কেশে উঠেছে মহিলা। ‘ঠাণ্ডা লেগেছে নাকিয়?’

মাথা নাড়ল সিস্টার। ‘নাহ, স্বাস্থ্য আমার ভালোই আছে।’

অসলেই মহিলা স্বাস্থ্যবঠী! গায়ে-গতরে বো’র প্রায় সমানই হবে। তবে চিন্তা নেই, সামলাতে পারবে সে। ভালমতো একটা বাড়ি বসাতে পারলেই হলো...অজ্ঞান দেহটাকে রাস্তার পাশে ফেলে, গড়িটা নিয়ে সোজা অন্য স্টেটের দিকে ছুটবে। হতচাড়া ফেয়ারভিল চুলোয় যাক!

রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো। বো’র ভয় হলো, বাজে রাস্তায় আমার জন্য নান আবার কিছু বলে না বসে। কিন্তু দেখা গেল, ভয়টা অমূলক। কিছুই বলল না মহিলা। এদিকে বাড়িটাও কমে আসতে শুরু করেছে। এখন কায়দা করে সিস্টারকে ভ্যান থামাতে বাধ্য করতে পারলেই...কেপ্লা ফতে। সামনেই গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি বড়...অঙ্ককার...একেবারে নিখুঁত জায়গা। কাজে নেমে পড়তে হয়।

কিন্তু যখন কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল, মনে হলো ওর গলা তুলোয় ভরে আছে। কথা বেরোতে চাচ্ছে না। তীরে এসে তরী ভুবাস নে, নিজেকেই বকল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিল সিস্টারের দিকে। ‘ধূমপান করলে কি খুব অসুবিধা হবে?’

এমনভাবে আঁতকে উঠল সিস্টার যে বো’র মনে হলো, কোনও বাজে কথা বলে বসেছে! কিন্তু হাঙ্কা আলোয় বুঝতে পারল, সিস্টার হাসছে!

‘ম্যাচ আছে আপনার কাছে?’ জানতে চাইল মহিলা।

হায় যিশু, কী বোকার মত প্রশ্ন! কথা না বলে, সরাসরি বের করে দেখিয়ে দিল ও। ‘একটু যদি গাড়ির গতি কমাতেন, তাহলে আগুন ধরাতে সুবিধা হতো-’

‘অবশ্যই।’ বলে একদম গাছ ঘেঁষে গাড়িটা থামাল নান। অসাধারণ সৌভাগ্য যাকে বলে!

আরেকবার মনে মনে কর্মপন্থা গুছিয়ে নিল বো’ কেলার-প্রথমে আগুন ধরাতে হবে, এক-দু টান দিয়েই মহিলার মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হবে শলাটা। চমকে

সরে যেতে চাইবে সিস্টার, এমনকি আত্মরক্ষার্থে হাতদুটো সামনেও নিয়ে আসতে পারে। ঠিক তখন পাকছলীর ওপর একটা বিরাশি সিঙ্কা বসিয়ে দিতে হবে। ব্যথায় যখন দূর্বল হয়ে আসবে মহিলার প্রতিরক্ষা, ঠিক তখন শেষ আঘাতটা হানবে চোয়ালে।

জলবৎ তরলৎ।

হাত দিয়ে আড়াল করে, আগুন ধরালো বো। আগুনের ঝলসানিতে এক মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। সিস্টারকেও তাই দেখতে পেল না। জানে না, ঠিক সেই মুহূর্তে একটু আগের শান্ত শিষ্ট নান দুই পায়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে লোহার একটা রড তুলে এনেছে...



আটি

সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছেন ক্লেইবর্ন। মনে হচ্ছিল, যুগ যুগ পর এসে উপস্থিত হলো হাইওয়ে পেট্রোল। ততক্ষণে অবশ্য বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি জনের একটা দল এসেছে। ড্রাইভারকে গাড়িতে রেখে নেমে এল অন্য দুজন। ক্লেইবর্নকে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেদিকেই এগোল। অল্প কথায় সারা হলো পরিচয়-পর্ব। বিশালদেহী, ধূসর চুলের লোকটা নিজের নাম জানালো ক্যাপ্টেন বেনিং, আর অন্য জনকে পরিচয় করিয়ে দিল নোভতনি বলে।

বেনিং লোকটাকে যথেষ্ট দক্ষ বলেই মনে হলো ক্লেইবর্নের। লবিতে প্রবেশের আগেই, প্রশ়াবাণে তিনি জর্জরিত করে ফেললেন ক্লেইবর্নকে। নোভতনিকে বলেছেন সে যেন রিসিপশনিষ্ট, যানে ক্লারার সাফ্কার্কার নিয়ে ফেলে। বেনিং আর ক্লেইবর্ন সরাসরি এলিভেটরের কাছে চলে গেলেন।

‘দেরি করার জন্য দুঃখিত।’ এলিভেটরে উপরে উঠতে উঠতে বললেন বেনিং।
‘অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনেছেন?’

‘অ্যাক্সিডেন্ট? কোন অ্যাক্সিডেন্ট?’

‘বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মন্ট্রোসের ঠিক বাইরে। এখন পর্যন্ত সাত জন মারা গিয়েছে, আরও বিশ জনের মতো হয়েছে আহত। এই কাউন্টির সব গুলো ইউনিট এখন ওখানে-শেরিফের ডিপার্টমেন্ট, অ্যাম্বুলেন্স, আমাদের লোক, সব ওখানে। তার উপর ঝাড়ের কারণে বিদ্যুৎ খালি আসছে আর যাচ্ছে। আমাদেরকে যে পেয়েছেন, তাই আপনার কপাল।’

মন দিয়ে শুনলেন ক্লেইবর্ন, জায়গামতো মাথাও দোলালেন। কিন্তু ক্যাপ্টেনের কথা কেন যেন উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তার কাছে এই মুহূর্তে এই লাইব্রেরি আর ওতে থাকা লাশটা ছাড়া আর কোনও কিছুর গুরুত্ব নেই।

জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটাও ওখান থেকেই শুরু হলো। ক্লেইবর্নের আদেশে ওটিস একটা চাদর এনে লাশটাকে ঢেকে রেখেছিল। এখন বেনিং তাদের দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করে দিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের মাঝামাঝি এসে, ওটিসকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন অ্যালেনকে ডেকে আনার জন্য। লোকটা এসে জানাল, পুরো হাসপাতাল এরিয়া ভালমতো খুঁজে দেখা হয়েছে। ক্লেইবর্নের আদেশ অনুসারে, পুরো চিরুনি অভিযান চলানো হয়েছে ভেতরে!

‘শুধু শুধু সময় নষ্ট হয়েছে।’ বললেন বেনিং। ‘আপনার রোগী এই ভিক্টিমের পোশাক পরে, সদর দরজা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে। সম্ভবত সিস্টাররা যে ভ্যানে এসেছে, সরাসরি ওটার দিকেই গিয়েছে।’

‘কিন্তু সিস্টার কুপারটাইনও তো ভ্যানে করেই চলে গিয়েছেন,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘তার তো অন্তত বুবতে পারার কথা।’

‘ক্যাপ্টেন-’ আরেক উর্দিপড়া অফিসার এসে বেনিংকে ডাকল। গাড়িতে রয়ে গিয়েছিল যে লোকটা, সে-ই এসেছে।

‘কী হয়েছে?’ জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন। একটু আড়ালে চলে গেলেন ওরা দুজন।

নতুন আসা অফিসারের উত্তরটা পরিষ্কার শুনতে পারলেন না ক্লেইবর্ন। কিন্তু বেনিং-এর প্রতিক্রিয়া একদম পরিষ্কার শোনা গেল। ‘জেসাস এইচ. কাইস্ট!

ক্লেইবর্ন তার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, ‘কী সমস্যা?’

‘ভ্যানটা পাওয়া গিয়েছে,’ জ্ঞ কুঁচকে জবাব দিলেন বেনিং। ‘একটা পার্শ্ব রাস্তার মুখে পরিত্যক্ত পড়ে আছে ওটা। এক আম্যমান সেলসম্যান ওটা দেখতে পেয়ে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ফোন দিয়েছে-’

‘ফায়ার ডিপার্টমেন্ট? কেন, ফায়ার ডিপার্টমেন্টে ফোন দিল কেন?’

‘আমি যখন জানতে পারব,’ উত্তর দিলেন বেনিং। ‘তখন নাহয় আপনাকে জানাব।’

‘আমি কি আপনার সাথে আসতে পারি?’ জানতে চাইলেন ক্লেইবর্ন। ‘গাড়ি বাইরেই আছে।’

‘ইচ্ছা হলে আসতে পারেন।’ বললেন বেনিং।

দুজন অফিসারকে রেখে যাওয়া হলো বাকিদের সাক্ষাৎকারের পালা শেষ করার জন্য। সেই সাথে সিস্টার বারবারার লাশ নিয়ে যাবার জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্সও ডাকা হলো।

তেজা, পিছিল রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালাবার পর, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌছলেন ক্লেইবর্ন। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কেন ডাকা হয়েছে, তা আর তাকে বলে দেবার কোনও দরকার রইল না। বৃষ্টির পর, সচারচর হাইওয়ের বাতাস পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু আজকে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পোড়া গন্ধ। সামনে তার উৎসও দেখা যাচ্ছে। দুটি গাড়ির আলোতে দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তৃতীয় আরেকটা গাড়ি। দেখার সাথে সাথে ভ্যানটাকে...নাহ, ভুল হলো...ভ্যানটার ধ্রংসাবশেষকে চিনতে পারলেন ক্লেইবর্ন। উইন্ডশীল্ড বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। ক্যাবের পোড়া ছাদে ইয়া বড় একটা গর্ত। দরজাগুলো আস্ত নেই। পেছনের দরজা মাটিতে ঠাই নিয়েছে। সামনের হৃত্তা যেন অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সে আর ইঞ্জিনকে রক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য ইঞ্জিনের মাঝে রক্ষা করার মতো কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই। গল গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওখান থেকে।

গাড়ী পার্ক করে ভ্যানের পাশে এসে ক্লেইবর্ন দেখতে পেলেন, বেনিং ভ্যানের সামনের দিক থেকে ফিরে আসছেন।

‘গ্যাস ট্যাঙ্ক বিফোরিত হয়েছে।’ ডাক্তারের কাছে এসে বললেন তিনি।

‘অ্যাস্বিডেন্ট?’

‘বলা মুশকিল, তবে ইচ্ছা করেও আগুন লাগানো হতে পারে। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিত করে বলতে পারবে, যদি এখানে আসার সুযোগ পায় আরকী।’

টায়ার পোড়া দৃঢ় নাকে যেতেই, ক্লেইবর্নের পাকস্থলী বিদ্রোহ করে উঠল। ‘আপনার কী মনে হয়?’

‘কোথাও কোনও গোলমাল আছে। আগুন যখন ধরে, তখন ভ্যানটা পার্ক করা ছিল। ব্রেকটা তখনও রিলিজ করা হয়নি। তাহাড়া দেখে মনে হচ্ছে, আগুনটার সূত্রপাত হয়েছিল সামনের দিকে। তাহলে এর আরোহীরা ট্যাঙ্ক ফাটার আগেই বেরিয়ে পড়ল না কেন?’

শক্ত হয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন। ‘আরোহীরা?’ সামনের দিকে যাবার জন্য পা ফেললেন তিনি, কিন্তু বেনিং হাত তুলে বাঁধা দিলেন।

‘দেখে লাভ নেই,’ বলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সেলসম্যানের দিকে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। বেচারা ক্রমাগত বমি করে চলছে। ‘ওর মতো অবস্থা হবে।’

‘আমার জানা দরকার।’

‘ঠিক আছে, ডক। যান তাহলে।’ হাত সরিয়ে নিলেন বেনিং। ‘কিন্তু পরে বলবেন না যে আমি সাবধান করে দেইনি।’

ভ্যানের সামনের সীটের দিকে উঁকি দিয়ে তাকালেন ক্লেইবর্ন। সীট থেকে চামড়া গলে খসে পড়েছে। পোড়ার গন্ধটা এখানে অনেক তীব্র। তবে সেই সাথে আরও একটা গন্ধ আছে...মাংস পোড়ার গন্ধ।

গন্দের উৎসটাও দেখতে পেলেন। মেবেতে কালো রঙের একটা চাঁই পড়ে আছে, দুই পাশে দুটো প্রবর্ধিত অংশ সাথে নিয়ে। প্রবল কল্পনাশক্তি না থাকলে, ওটাকে কেউ মনুষ্যদেহ বলে ভুল করবে না। চোখ নেই, নাক নেই, নেই কোনও চুল বা চামড়ার বিন্দুমাত্র অংশ! একদা যেখানে মুখ ছিল, এখন সেখানে শুধুই একটা গর্ত...জিহ্বাহীন। যেন মৃত্যুর আগ মুহূর্তে চিৎকার করার জন্য মুখ খুলেছিল এই কালো চাঁই ঝঁপী দেহটার মালিক।

এবার সীটের পেছন দিকে চাইলেন তিনি, এখানেও আরেকটা কালো চাঁই ছায়ার মাঝে শুয়ে আছে। গরুর একপাশ বারবিকিউ করলে যেমন হয়, তেমনটা দেখাচ্ছে এই লাশটাকে। মাথা অনুপস্থিত, ট্যাঙ্কের বিফোরণ ওটাকে জায়গামতো থাকতে দেয়নি। কেবলমাত্র একটা নির্দশন দেখে বোৰা যাচ্ছে, ওটা কোনও মহিলার পোড়া দেহ- যোনীপথের পোড়া গর্ত।

বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে পিছিয়ে এলেন ক্লেইবর্ন। বেনিং যে ওর দিকে জুকুঁচকে তাকিয়ে আছেন, তা পরিষ্কার টের পাছে। ‘ঠিক বলেছেন।’ অনেক কষ্টে নিজের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে বললেন তিনি। ‘দেখে একদম লাভ নেই। ময়না তদন্ত দরকার।’

‘সময় লাগবে ওতে। ওই অ্যাক্সিডেন্টের কারণে, করোনার এই লাশগুলো ধরার সময় আপাতত পাবে না। কিন্তু এখানে আসলে কী ঘটেছে, তা সম্ভবত বুবাতে পারছি।’ চিরুক ঘষলেন ক্যাপ্টেন। সিস্টার কুপারটাইনকে হয় খুন করে, নয়তো অজ্ঞান করে ভ্যানের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছিল। এরপর নরম্যান ভেবেছিল, হাইওয়ে থেকে কোনও পুরুষকে তুলে নিয়ে-

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান,’ এবার ক্লেইবর্নের জুকুঁচকাবার পালা। ‘একটু আগে বললেন, এই বীভৎস দৃশ্যের কারণ ষ্টেচায় আগুন দেয়া না অ্যাক্সিডেন্ট, তা আপনি জানেন না। এখন বলছেন, এখানে একটা খুন হয়েছে।’

‘খুন যে হয়েছে, তাতে একও বিন্দু সন্দেহ নেই।’ বেনিং উত্তর দিলেন। ‘পেছনে দেহটা দেখেই তা বোঝা যায়। মারা না গেলে বা অন্তত অজ্ঞান না হলে, সিস্টার কুপারটাইন বেরোবার চেষ্টা করতেন না?’

‘কিন্তু ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণ কেন হলো, তা আমরা কেউ জানি না। আচমকা হতে পারে না?’ বললেন ক্লেইবর্ন।

নিচে ঝুঁকে একটা ধাতব সিলিন্ডার তুলে ধরলেন বেনিং। ‘এই যে আপনার প্রশ্নের উত্তর। একটু আগে গ্যাসোলিনের এই ক্যানটা রাস্তার উপরেই খুঁজে পেয়েছি। ইচ্ছা করেই আগুন লাগানো হয়েছে এখানে। সম্ভবত প্রমাণ ধরংসের জন্য। কিন্তু কাজ ঠিকভাবে সারার আগেই কোনও সমস্যা হয়ে যায়। নিজেকে ভ্যানের সামনে রেখেই, নরম্যান বেটস আগুন ধরিয়ে দেয়।’

তার মানে...সামনের ওই কালো চাঁইটা আসলে নরম্যান! ক্যাপ্টেন বেনিং-এর কথা অনুসারে, তাই তো দাঁড়ায়।

‘না!’

‘মানে?’

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টিতে বেনিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার। কেননা দেবার মতো কোনও উত্তর নেই তার কাছে। কী বলবেন? বললেবন যে, এতোগুলো বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা, রোগীর সাথে মেলামেশা করার অনুভূতি তাকে অন্য কোনও সত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে?

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন বেনিং। ‘খাপে খাপে মিলে যায় কিন্তু, ডক। আমরা জানি, নরম্যান এই ভ্যানে চড়ে পালিয়েছিল। এ-ও জানি যে সিস্টার কুপারটাইন সে সময় তার সাথে ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, প্রথমে ছদ্মবেশী নরম্যানকে চিনতে পারেননি তিনি। যখন পারেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। লোকটা তাকে

আঘাত হেনে অঙ্গান করে বা মেরে ফেলে। এরপর ভুল করে গ্যাসোলিনের সিলিন্ডারে আগুন ধরিয়ে ফেলে। এছাড়া আর কী হতে পারে?’

‘আমি...’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘আমি জানি না।’

‘তাহলে আমার কথাই সত্য বলে ধরে নিন। বেটস মারা গিয়েছে—’

সাইরেনের তীব্র শব্দে ক্যাপ্টেনের বাকি শব্দ গুলো চাপা পড়ে গেল। দূর থেকে জুলতে-নিভতে থাকা আলো এদিকেই এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মাঝেই এসে উপস্থিত হলো ফায়ার ট্রাক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সেদিকেই রওনা দিলেন বেনিং।

ইতস্তত করলেন ক্লেইবর্ন, দাঁড়িয়ে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকদের জুলত গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দেখছেন। ক্যাপ্টেন বেনিং-এর সাথে সাথে এগিয়ে গেল সেলসম্যান লোকটাও, সদ্য আগত দলের নেতার সাথে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এখন প্রচুর কথা আর আলোচনা চলবে, কেননা এছাড়া আর কার-ই বা কী করার আছে! সত্ত্বে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে সরিয়ে নিয়ে যাবে লাশ দুটোকে, কিন্তু অর্থহীন আলোচনা চলতেই থাকবে। ক্লেইবর্নের তা আরেকবার শোনার কোনও দরকার নেই। জবানবন্দী দেয়া শেষ, তার উপস্থিতি আর প্রয়োজনীয় নয়। ময়নাতদন্তের কাজটা নাহয় করোনারের জন্যই তোলা থাক। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করেন দিলেন। কেউ তার এই আচমকা বিদায় মেয়াটা লক্ষ্য করবে বলে মনে হলো না।

হাইওয়েতে উঠে কিছু দূর এগোতেই মিলিয়ে গেল পোড়া গন্ধুটুকু। তবে চোখের সামনে থেকে পোড়া, কালো দুটো মরদেহের দৃশ্য গেল না। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ময়না তদন্ত নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু মনে মনে নিজের ময়না তদন্ত ঠিক চলতে লাগল। এতক্ষণ নিজেকে নিষ্পাপ মনে করছিলেন, আর পারলেন না। কেননা, নরম্যান মারা গিয়েছে। আর সে জন্য এক হিসেবে তিনিই দায়ী! কেন তিনি সিস্টার বারবারাকে নরম্যানের সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়েছিলেন? ভুল করে ফেলেছেন। আর সেই ভুলের প্রায়শিত করতে হয়েছে ওই দুজনকে মারা গিয়ে। এমনকী সিস্টার কুপারটাইনের মৃত্যুর জন্যও তিনি দায়ী।

তবে সবচাইতে বড় আফসোসের কথা হচ্ছে, নরম্যানকে হতাশ করেছেন তিনি। ডাক্তার হিসেবে তার রোগ নির্ণয় আর তার প্রতিকারের অদক্ষতার কারণেই এই ঘটনাটা ঘটেছে।

হাইওয়েতে উঠার পর থেকে অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলছে গাড়ি। নির্মল বাতাস কিছুটা হলেও ক্লেইবর্নের মাথাকে শান্ত করে তুলেছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছেন তিনি। আসলেই ওই ভ্যানে নরম্যানের মৃত্যু হয়নি, হয়েছে তার নিজের মৃত্যু। তার স্বপ্নে, তার আশা-আকাংখার। বই লেখার চিন্তাটা এখন শুধু তা-ই

হয়ে রাইল, কেবল-ই এক চিন্তা। তিনি জানতেন, নরম্যানের কেসটা এই একটা কারণেই এতোটা গুরত্ব দিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন ওটা নিয়ে একটা বই লিখতে। যে বইয়ের হাত ধরে আসবে নাম, যশ, খ্যাতি আর অর্থ। মুক্তি মিলবে স্টাইনারের হাত থেকে, একথেঁয়ে এই জীবনের হাত থেকে। এক হিসেবে, নরম্যানের মতো তিনিও ছিলেন ওই হাসপাতালের বন্দি। বইটা তাকে মুক্ত করে দিতে পারত।

খুব কাছাকাছি এসেও গিয়েছিলেন সেই মুক্তির। অনেক দিন লোকটার সাথে কাজ করেছেন তিনি। ভেবেছিলেন, নরম্যানকে বুঝতে পেরেছেন। এমন ভুল কেন করলেন তিনি! গর্ব... অহংকার... বিজ্ঞানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস...

ভুলটাও হয়েছে সেখানেই, মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের উপরে অনুভূতিকে ছান দিতে হয়। যেমন এখন তার মনে হচ্ছে, নরম্যান এখনও বেঁচে আছে!

অন্য কারও কাছে কথাটা হাস্যকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বেনিং-এর ব্যাখ্যাটাও কি হাস্যকর নয়? ওই লোকটার মাঝেও গর্বের ছায়া দেখতে পেয়েছেন ডাঙ্কার ক্লেইবর্ন। তর্কের খাতিরে নাহয় ধরে নেয়া গেল যে, নরম্যানই ভ্যানে গ্যাসেলিন চেলেছে। কিন্তু তাই বলে আগুন ধরাবার আগে সে ড্রাইভিং সীটে কেন গিয়ে বসবে? নরম্যান বোকাও না, আত্মহত্যাপ্রবণও না। অন্য কোনও ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে পুরো ঘটনাটার।

আচ্ছা, তৃতীয় কোনও পক্ষ জড়িত নেই তো এখানে? নাহ, তৃতীয় পক্ষ আবার কোথেকে আসবে! বোকার মতো ভাবছি, নিজেকেই বললেন ক্লেইবর্ন। নাকি এটা কোনও আশা? নরম্যান যদি বেঁচে থাকে, তাহলে এখনও...

জোর করে মনোযোগ সামনের রাস্তার দিকে ফেরালেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার বাঁ দিকে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখলেন। গতি কমিয়ে, জিনিসটার একেবারে পাশে এসে গাড়ি থামালেন ক্লেইবর্ন। বেরিয়ে এসে কাছ থেকে ওটাকে পরীক্ষা করতে বেশিক্ষণ লাগল না। রুক্ষভাবে হাতে বানানো একটা সাইন! এমনকী শব্দগুলোও পরিক্ষার দেখা যাচ্ছে ফেয়ারভিল।

খাপে খাপে মিলে গেল সবকিছু। হ্যাঁ, সম্ভব। এখানে ভ্যান্টা থেমেছিল হয়তো... হয়তো নরম্যান তুলে নিয়েছিল কোনও পথচারীকে। তাহলে অবশ্য কাঁদায় চাকার দাগ থাকবে। দাগের খোঁজে আশেপাশে তাকালেন তিনি। কিন্তু পানি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। যে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে রাস্তায় চাকার দাগ থাকবে-তা আসলে দুরাশা। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। একমাত্র সত্যটা ছাড়া আসলে আর কিছুই যায় আসে না।

অনুভূতির উপর আস্থা রাখো।

আসলেই তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি ছিল এই ঘটনায়! আর তৃতীয় পক্ষ থাকা মানেই, যেকোনও কিছু ঘটা সম্ভব। হয়তো ভ্যানের সামনে থাকা মৃতদেহটা আসলে এই পথচারীর! সাইনটা তুলে নিয়ে, গাড়িতে চড়ে বসলেন ক্লেইবর্ন।

ঘুরছে গাড়ির চাকা, সেইসাথে ডাঙ্গারের মন্তিক্ষের চাকাও। ইউ-টার্ণ নিলেন আচমকা, ফেয়ারভিলের দিকে রওনা দিলেন। ভ্যানটা জুলিয়ে দেবার পর, নরম্যানের সেদিকেই যাবার কথা। যে মানুষটা অপরিচিতদের এমনভাবে খুন করতে পারে, সে নিশ্চয় পুরনো শক্রদের ছেড়ে কথা বলবে না। নরম্যান কাকে পুরনো শক্র ভাবে, সে কথাও জানেন তিনিঃ স্যাম আর লিলা লুমিস, ফেয়ারভিলেই থাকে। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরে গেল ক্লেইবর্নের মন। তিনি কি বেনিং-কে সবকিছু জানাবেন? কিন্তু লাভ কী তাতে? আবার সেই কথা বলে বলে ক্যাট্টেনকে বোঝাতে হবে, ফলাফল কী হতে পারে তা তো তিনি জানেন। অবশ্য ক্যাট্টেনকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? দাবীর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন না ডাঙ্গার ক্লেইবর্ন।

কিন্তু তিনি জানেন, নরম্যানের মনে কী চলছে, সে কথা বোঝার ক্ষমতা তার আছে। সময় নষ্ট করে তাই লাভ নেই। অ্যাক্সিলেটর দাবিয়ে বসল ক্লেইবর্নের পা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি।

এদিকে রাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাইনবোর্ড তাকে যেন চিৎকার করে জানাচ্ছে- ফেয়ারভিলঃ ১২ মাইল।



নয়

নীরব, মৃত্যুর মতো নিষ্ঠক রাস্তা ধরে এগোচ্ছে নরম্যান। ঝাড় খুন করেছে শহরটাকে। এরকম ঝাড়...আর প্রতি রবিবার রাতে ফেয়ারভিলের মতো ছোট ছোট শহরের মৃত্যু হয়। রবিবার সূর্য ঢলার সাথে সাথে মৃত্যু এসে হাজির হয়। বন্ধ হয়ে যায় প্রধান সড়কের সবগুলো দোকান, পার্কিং স্পেসগুলো খা খা করতে থাকে। আর যদি কোনও প্রাণ অবশিষ্ট থেকেও থাকে, তাহলে তারা আশ্রয় নেয় বন্ধ জানালার ওপাশে। স্যাম আর লিলাও নিশ্চয় নিজ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। স্যাম, হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক। আর লিলা তার ত্রুটী। সেই সাথে মেরি ক্রেনের বোন-ও। মেরি আচমকা উধাও হয়ে যাবার পর, বোনের খোঁজে ফেয়ারভিলে এসেছিল মেয়েটি। স্যামের সাথে যে বোনের প্রেম আছে, তা জানত বলে সরাসরি লোকটার কাছেই খোঁজ নিতে গিয়েছিল। এই দুজন নাক না গলালে, নরম্যানকে ধরা পড়তে হতো না।

মেরি ক্রেন আর তাকে খুঁজতে আসা গোয়েন্দা, দুজনেরই ব্যবস্থা করে ফেলেছিল ও। তাদেরকে কবর দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই স্যাম আর লিলা এসে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল সবকিছুর। ওকেই উল্টা আটকা পড়তে হয়েছে এই করবরুপী হাসপাতালে। মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ সেই শান্তি।

অথচ যে অপরাধে নরম্যানকে আটকে রাখা হয়েছিল, সে অপরাধ তো ও করেইনি! করল মা, আর সাজা পেতে হলো ওকে? মা-ই তো ওর আত্মা আর দেহটাকে দখল করে নিয়ে খুনগুলো করেছে। নরম্যানকে যে দায়ী করা চলে না, সে কথা তো সবাই একবাক্যে স্বীকার করে। কেননা দায়ী হলে ওর বিচার হতো। অথচ বিনা বিচারেই এতোগুলো বছর ওই...ওই...জেলখানায় পচতে হয়েছে ওকে। আর স্যাম এবং লিলা? মুস্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা। বিয়ে করে সুখে দিন কাটাচ্ছে।

অনেক কেটেছে সুখের দিন...

আর না।

আজকেই সুখের দিনের ইতি টানবে নরম্যান।

না, নতুন করে পাগল হয়নি ও। এখন মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। আর নরম্যান নিজেই-ওর মা না-ওর প্রতি কৃত অপরাধের সাজা দেবে সবাইকে। স্টশুরকে...নাহ, ডা. ক্লেইবর্নকে ধন্যবাদ। তিনি না থাকলে, নরম্যান আজ এখানে থাকত না... নিশ্চিত করতে পারত না ন্যায় বিচার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ন্যায় বিচারই এটা। প্রতিশোধ না। ওর জায়গায় ডা. ক্লেইবন হলেও নিশ্চয় এমনটাই ভাবতেন। কেননা এই দুজনের সাক্ষের কারণেই হাসপাতালে আটকা থাকতে হয়েছে ওকে। অথচ নরম্যানের ব্যাপারে মন্তব্য করার ওরা কে? মেয়েটা তো বোনের প্রেমিকের বিছানা গরম করতে ব্যস্ত। আর প্রেমিক প্রবর? তার মুখে অন্ন জোটে মানুষ বা পশু খুন করার সরঞ্জামাদি বিক্রি করে। খুনি, কসাই আর মৃত্যুর ব্যবসায়ী তো ওই স্যাম লুমিস। অথচ ভুগতে হচ্ছে নরম্যানকে! এ কেমন বিচার!

ন্যায় বিচার চাইবার জন্য কি ওকে দোষ দেয়া চলে?

কিন্তু প্রধান সড়ক মৃত্যুয়ার আর পার্শ্ব রাস্তাগুলোও অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্যাম আর লিলা ওর কাছ থেকে আত্মগোপন করে রয়েছে নিশ্চয়। কে জানে, হয়তো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে! কিন্তু কোন বাড়িতে? কোন পর্দার পেছনে?

শক্তদেরকে খুঁজে পাবে কোথায়? প্রতিটা দরজায় তো আর নক করে দেখা সম্ভব না। দুই রাস্তার সংযোগ স্থলে এসে থমকে দাঁড়াল নরম্যান, ভূ কুঁচকে আছে। এখন পর্যন্ত কারও নজরে পড়েনি ও, কিন্তু এই সৌভাগ্য যে কতক্ষণ থাকবে তা বলা মুশ্কিল। পলাতক এক মানুষ সে, ওকে খুঁজতে খুব শীঘ্ৰই অনেকের এসে পড়ার কথা। কিছু করতে চাইলে, এখনই করতে হবে। কিন্তু কী যে করবে...

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার ওপাশের ফিলিং স্টেশনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ফোন বুঝটা নজরে পড়ল ওর। পেয়ে গেছে সমাধান। প্রথমে ফোন ডিরেক্টরি খুঁজল। কিন্তু কপাল মন্দ, যেখানে বইটা থাকার কথা, সেখানে শুধুই শূন্যতা। তথ্যের জন্য এখন অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, আজকালকার দিনে কেউ বাড়ির ঠিকানার জন্য অপারেটরকে ফোন করে না। আর এরকম একটা ছোট শহরে খবর বাতাসের চেয়ে দ্রুত বেগে ছড়ায়। ও ফোন নামিয়ে রাখার এক মিনিটের মাঝে নিশ্চয় অপারেটর সরাসরি স্যাম বা লিলাকে খবরটা জানিয়ে দেবে। তাই মত পাল্টাল নরম্যান।

দুই রাস্তার সংযোগস্থলে ফিরে এলো আবার। এখানে একটা পানশালা আছে। ওটাকে পার হয়েই একদম থমকে দাঁড়াল সে। রবিবারের আইন মেনে বন্ধ হয়ে আছে পানশালাসহ প্রায় সবগুলো দোকান। তবে একটা জানালায় এখনও আলো জ্বলছে। 'লুমিস হার্ডওয়্যার'-জ্বলজ্বল করে ধৰা দিল ওর সামনে।

আছে, ভেতরে আছে কেউ একজন।

শিকারী বাঘের মতো নিঃশব্দে দোকানের দিকে এগোল নরম্যান বেটস।



দশ

ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন লিলা লুমিস তার ঘরেই বসে ছিল, অন্দকার লিভিংরুমে বসে টেলিভিশনে দেখছিল বাজে কোনও একটা গেম শো। নিজ ইচ্ছায় চ্যানেলটা ঘুরায়নি সে। ঝড়ের কারণে রিসেপশন এতোটাই বাজে যে এই চ্যানেল পাঁচ ছাড়া আর কোনও চ্যানেলই আসছে না। অন্তত বাইরের ঘটনা ভুলে থাকার তো একটা উপায় পাওয়া গেল।

গেম শোটা যেমন বাজে, তেমনি বাজে ওতে অংশগ্রহণকারীরা।

লিলা শুনতে পেল, গেম শো'র সঞ্চালক বলছেঃ

এবারের প্রশ্ন আমাদের জ্যাকপটের জন্য! নগদ এক হাজার ডলার, একেবারে নতুন ফোর্ড গ্যালাক্সি আর আকাপুলকো হিলটন হোটেলে দুই সপ্তাহের সম্পূর্ণ ফি অবকাশের জন্য আমাদের প্রশ্ন হলো— জ্যাকি ওনাসিসের কুমারী নাম কী?

'মিনি শোয়ার্টজ,' বিড়বিড় করল লিলা। টিভিতে চলতে থেকে একটা গেম শো'র উভার দিয়েছে বুরতে পেরে আপন মনেই হাসল। এর কোনও মানে হয়? হয় না। অবশ্য আজকাল সবাই এই কাজটা করে, আর কয়েক বছর পর দেখা যাবে-সবাই কেবল টিভির সাথেই কথা বলছে।

উঠে রান্নাঘরে যাবে, এমন সময় সন্ধ্যার খবর শুরু হয়ে গেল। পুনরায় বসে, মন দিয়ে খবর শোনার সিদ্ধান্ত নিল সে। প্রায় পুরোটা জুড়েই ছিল ঝড়ের সংবাদ আর প্রধান সংবাদে পাঠক বলছিল মন্টেনেস ঘটা কোনও বাস অ্যাক্সিডেন্টের কথা। কপাল ভালো, লিলার বিক্ষিপ্ত মনকে আরও বিক্ষিপ্ত করে দেয়ার মতো কোনও দৃশ্য দেখানো হলো না খবরে। তবে খবর পাঠক জানালো, রাত এগারোটার দিকে অ্যাক্সিডেন্টের ভিডিও দেখানো হবে। দেখা যাবে না, মনে মনে ভাবল লিলা। বাচ্চামি হয়ে গেল হয়তো, কিন্তু মৃত্যু আর লাশের ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

নাহ, বাচ্চামি না। অন্তত লিলা লুমিসের অধিকার আছে মৃত্যু দৃশ্যকে ঘৃণা করার। হ্যাঁ, ঘটনাটা অনেক বছর আগে ঘটেছে। হ্যাঁ, ওর বোন আর গোয়েন্দাকে যখন খুন করা হয়েছিল, তখন ও সেখানে ছিল না। কিন্তু নরম্যানকে ছেরা হাতে নিজ চোখে দেখেছে সে। আর সেই দৃশ্য ওর মনে যে ভয়ের উদ্বেক করেছিল, তা মিটে যায়নি পরবর্তী অনেক বছরেও। স্যাম লুমিসের আলিঙ্গনে কাঁপতে কাঁপতে অগণিত রাত দুঃখপ্র থেকে জেগে উঠতে হয়েছে তাকে। ওকে শান্ত করার জন্য কখনও কখনও স্যামের বিছানার পাশে থাকা লাইটটা ও জুলাতে হয়েছে।

কথাগুলো মনে পড়তেই লিলার মনে হলো, স্যাম এখন ওর পাশে থাকলে বড় ভালো হতো। কিন্তু সাতটা অনেক আগে বাজলেও, লোকটা এখনও ফেরেনি। হার্ডওয়্যার স্টোরে আছে। আসলে থাকতে বাধ্য হয়েছে বলা যায়, ট্যাক্সের কাগজ-পত্র জমা দেবার সময় এসেছে। তাই আয়-ব্যয়ের হিসাবটা করে রাখাও জরুরী। সমস্যা হলো, মন তো আর মানে না। কাজ জরুরী, কিন্তু তা যে এক সাথে রাতের খাবার খাওয়ার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকী বাইরে বেড়াতে যাবার সম্ভাবনাও। অবশ্য যে বড় হয়েছে, তাতে বাইরে যাওয়ার কথা কল্পনা করাও বোকামি হয়ে যায়। যাক, বড়টা অন্তত বন্ধ হয়েছে।

অন্যমনস্কভাবেই খবর পাঠকের কথা শুনছে সে। হঠাৎ ওর কান খাড়া হয়ে গেল, লোকটা স্টেট হাসপাতাল থেকে পালানো কোনও রোগীর কথা বলছে! সেই রোগী আবার নাকি এক অতিথিকে হত্যাও করেছে।

‘কৃত্পক্ষের বিশ্বাস, রোগী ভিত্তিকে হত্যা করে তার ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে। ভিত্তিম এক ধর্মীয় সংগঠন, দ্য লিটল সিস্টারস অফ চ্যারিটি-এর সদস্য ছিল। নরম্যান বেটস নামের রোগীটি এখনও ধরা পড়েনি।’

নরম্যান বেটস!

জমে গেল যেন লিলা।

খুন করেছে...পালিয়েছে...এখনও ধরা পড়েনি!

আচমকা যেন লিলার দুনিয়া বরফে জমে গিয়েছে। কোনও কিছু শুনতে পাচ্ছে না ও, দেখতে পাচ্ছে না। মনে হলো আরেকটা দৃঢ়স্থ দেখছে। কিন্তু না, জেগে আছে মেয়েটি। আর নরম্যান-

খবর পাঠকের কথায় আবারও চমকে উঠল সে। ‘ওয়েল্যান্ড নাসারীর হিনহাউজে বজ্রপাতের ফলে আগুন ধরে গিয়েছে-’ নরম্যানের খবরটা শোনার পর আর মন দিতে পারেনি লিলা। বজ্রপাতের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য মনোযোগ অন্য দিকে সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার ওকে দখল করে নিয়েছে লোকটা।

নরম্যান বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

স্যামের সাথে কথা বলা দরকার। টিভি বন্ধ করতে করতে নিজেকেই বলল মেয়েটি। অন্ধকারে বাতির কাছে গিয়ে হাত বাড়ালো ওটা জুলাবার জন্য। কিন্তু সাথে সাথেই থামিয়ে দিল নিজেকে। যদি লোকটা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে?

নাহ, কী সব ভাবছে! ও কোথায় থাকে তা নরম্যান জানবে কী করে? আর যদি জেনেও থাকে, তাহলে আসবে কেন? কোনও যুক্তি আছে এই বোকামির? অবশ্য নরম্যানের মতো উন্নাদদের কাছে যুক্তি বলতে কোনও কথা নেই।

শব্দটা যখন লিলার কানে প্রবেশ করল, তখনও বাতির পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। আচমকা সতর্ক হয়ে কান খাড়া করে শোনার প্রয়াস পেল। কিন্তু না, আর

কোনও শব্দ হলো না। প্রথমবার শব্দ হয়েছিল কি না, স্টো নিয়েই সন্দেহে পড়ে গেল ও। কিছুক্ষণ পর যখন নিশ্চিত হলো যে ভুল করেছে, তখনই আবার হলো শব্দটা। অস্ফুট কোনও ঘষা খাবার শব্দ। পায়ের শব্দ না তো? ঠিক বুঝতে পারল না লিলা। শুধু বুঝতে পারল, আওয়াজটা বাইরে থেকে আসছে।

চুপিচুপি সামনের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। পর্দাটাকে কম্পিত হাতে এক পাশে সরালো। বড়জোর এক ইঁধিৎ হবে, সেই ফাঁক দিয়েই তাকালো বাইরে। নেই...কিছুই নেই।

রাস্তা খালি, লন খালি, এমনকী ওপাশের রাস্তাও ফাঁকা।

আবারও হলো আওয়াজটা, বাড়ির পাশে অবস্থিত গাছটা বাতাসে নড়ার ফলে হয়েছে শব্দটা। উপরের ডালগুলো ছাদের সাথে ঘষা খাচ্ছে।

নরম্যান আসেনি।

স্বষ্টির নিঃশ্বাস ফেলল লিলা। সবই ওর কল্পনা তাহলে!

আসলেই তো, নরম্যান ওর খোঁজে আসবে কেন? ও তো আর নরম্যানের শক্ত নয়। নাহ, লোকটা আসবে না এখানে।

কিন্তু প্রায় সাথে সাথে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল মেয়েটি, হাত থেকে খসে পড়ল পর্দা। এখানে কেন আসবে নরম্যান? লিলার সাথে তো কোনও বিরোধ নেই, লোকটার আসল বিরোধ তো স্যামের সাথে।

কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের কাছে গিয়ে ফোনটা তুলে নিল ও। অন্ধকারে অনেকটা আন্দজ করেই স্টোরের নাস্তারে ডায়াল করল। রিং শোনার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও, পেল না। বির বির আওয়াজ শুনতে পেল কেবল! ফোন বিজি হবার সিগন্যাল বলে মনে হচ্ছে না। নাকি বাড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লাইনটা?

রিসিভার নামিয়ে রাখল লিলা, বাইরের খসখস আওয়াজটা এখনও থামেনি। ওটার উৎস সম্পর্কে জানা থাকলেও, ভয়ে কেঁপে উঠল। হয়তো...হয়তো এবার নতুন আরেকটা শব্দ যোগ হয়েছে! হয়তো আওয়াজটা গাড়ির ইঞ্জিনের, স্যাম চলে এসেছে হয়তো। রেডিওতে যদি নরম্যান বেটসের পালাবার কথা শুনে থাকে, তাহলে চলে আসবার-ই কথা।

কিন্তু না, ভুল হচ্ছে ওর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, হাতঘড়ির দিকে তাকাল লিলা। অন্ধকারে জুলজুল করতে থাকা ডায়ালগুলো ওকে জানাল-আটটা বাজে।

আটটা বেজে গিয়েছে! রেডিওতে কিছু না শুনে থাকলেও তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। যদি না...নাহ, ওসব বাজে কথা ভাববেই না লিলা।

এখন দরকার কোনওক্রমে রান্নাঘরে গিয়ে কাউন্টারের উপরে রাখা পার্সটা নেয়া। এরপর বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখে নিয়ে, বেরিয়ে পড়া।

তাই করল লিলা, রাতের হাওয়া এসে ওর মুখে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিল। যতদূর দেখা যায়, কেউ নেই। পার্স্টা আঁকড়ে ধরে, ফুটপাতে উঠে এল সে। প্রতিবেশির বাড়িটার দিকে তাকাল, অন্ধকারে ছেয়ে আছে। ডেম্পস্টারদেরকে জানাবে কি না, ভাবল একবার। পরক্ষণেই মনে পড়ল, বাড়িতে কেউ নেই-
র্যান্ডেনউডে যেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। রাস্তার ওপাশের ওরাও নেই, লেকের ধারে ছুটি কাটাতে গিয়েছে।

চোখ-কান খোলা রাখো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই-নিজেকে বোঝাল। মাত্র তিন
ব্লক দূরেই তো যাচ্ছ।

বলল বটে, কিন্তু উপলক্ষি করল-ভয়ের চোটে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ বুঝতে পারছে, ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে নেই কোনও দানব। যে আওয়াজটা
কানে দীর্ঘশ্বাস বলে মনে হচ্ছে, সেটা আসলে বাতাস বইবার আওয়াজ। বাড়তি
শব্দ বলতে কেবল ভেজা সিমেন্টে ওর নিজের হিলের ঠকাঠক আওয়াজ। প্রধান
রাস্তায় গঠার সাথে সাথে, বাঁ দিক থেকে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো
দেখতে পেল। স্যাম নাকি? থমকে দাঁড়াল যেয়েটি, হাত নাড়ার জন্য তৈরি হয়ে
রয়েছে।

কিন্তু না, একদম অপরিচিত স্টেশন ওয়াগনটা। ড্রাইভারকেও চেনে না। তবে
ভুল করে ফেলেছে, হাত নাড়া উচিত ছিল। চোর পালালে আসলেই বুদ্ধি বাড়ে।
এতোক্ষণে গাড়িটা ডানে মোড় নিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে। আবার নির্জন
হয়ে পড়েছে প্রধান রাস্তাটা। এগিয়ে চলল লিলা। আর এক ব্লক মাত্র।

দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পারছে স্টেরটাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আলো
জ্বলছে না স্টেরের কোথাও! চলার গতি কমে এলো ওর। অঙ্গ আশ্কায় কেপে
উঠে বুক।

এতো ভয় পাওয়ার কী আছে? নিজেকেই বকল। হয়তো স্যাম কেবলমাত্র বন্ধ
করেছে স্টের, এই মুহূর্তে পেছন থেকে গাড়ি বের করে আনছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলল লিলা। সতর্ক হয়ে আছে। কয়েক গজ সামনে
এগোতেই নজরে পড়ল, পেছন দিয়ে বেরোবার গলির মুখে পার্ক করা আছে
ওদের স্টেশন ওয়াগনটা। ড্রাইভারের সীটের পাশের দরজাটা বন্ধ। সীটেও নেই
কেউ। স্যাম এখনও দোকান থেকে বেরোয়নি! তাহলে আলো জ্বলছে না কেন?
ঘূমিয়ে পড়েছে? নাকি-

এতোক্ষণ অনেক কষ্ট করে দুশ্চিন্তাটাকে আটকে রাখলেও, আর পারল না সে।
গত সপ্তাহের ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছে। স্যাম ওর ডাঙ্গার, ডা. রোয়ানের সাথে
দেখা করতে গিয়েছিল। সেখানে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম করতে হয়েছে। ডাঙ্গার
অবশ্য বলেছিলেন, দুশ্চিন্তা করার মতো এমন কিছু হয়নি। কিন্তু ডাঙ্গাররা তো

আর সব কিছু জানে না। আর ওসব পরীক্ষার রিপোর্টও সব সময় ঠিক হয় না। হাট অ্যাটাকের মতো সিরিয়াস কিছু হয়ে গেল না তো আবার!

ধীর, সাবধানী পায়ে স্টেইনের পেছনের দরজায় পৌছে গেল লিলা। এপাশের জানলার পর্দা নামানো, দরজাও বন্ধ। নব ধরেই টের পেল, লক করে রাখা। পার্সে একটা চাবি আছে অবশ্য, তবে কেন জানি বের করল না ওটা। সেই গা শিহরানো অভিজ্ঞতা তাকে একটা জিনিস শিখিয়েছে-একা থাকলে, ঝুঁকি নেবার মতো বোকামি করার কোনও দরকার নেই। স্যামের যদি কিছু একটা হয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে ওর ঝুঁকি নেয়ায় তার কোনও লাভ বা ক্ষতি হবে না। তবে হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সাহায্য আনতে পারলে হয়তো উপকার হবে।

তাই করবে, সিন্দ্রান্ত নিল। পার্ক করে রাখা স্টেশন ওয়াগনটার কাছে এসে ডানে মোড় নিল এবার। একটু সামনে, ক্যারের ওখানে কোর্ট হাউসটা দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকেই এগোল সে। দালানটাও অঙ্ককার প্রায়, কিন্তু একদিকের একটা দরজা খোলা। ওটা দিয়ে আবছা আলো দেখা যাচ্ছে। দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ও, সিডি বেয়ে উঠে আলোর উৎসের দিকে এগোল। ওর মনে হচ্ছিল দেঁজা ভূঝ হচ্ছে। আরেকটু দ্রুত পা চালানো শুরু করল মেরেটা।

ছোটোখাট আকৃতির, বয়স্কা আইরিন গ্রোভস্মিথের অফিসে আলো জ্বলছে এখনও। বৃদ্ধা মহিলা ডেক্সে বসে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন। লিলাকে চুক্তে দেখে, ম্যাগাজিনটাকে সরিয়ে রাখলেন তিনি। ‘লিলা-’

‘হ্যালো আইরিন। শেরিফ অ্যাস্ট্রেম কি ব্যন্ত?’

‘তা আর বলতে,’ পুরুষ লেসের ওপাশে, আইরিনের চোখে বিরক্তি খেলে গেল। ‘তিনি ঘন্টার বেশি হলো নেই। বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না মন্টোসে? ওখান থেকে এখনও আসেনি। বলে গিয়েছিল যে বড়জোর সাতটা বাজবে, আর দেখ! এখন তো প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। বিদ্যুৎ আসছে-যাচ্ছে, ফোনটাও কাজ করছে না। ঠিক করছে শুনলাম, কিন্তু এখনও...’

‘শেরিফের সাথে যোগাযোগ করা দরকার ছিল যে।’

‘কেবলি না বললাম-’ বলতে বলতেই থেমে গেলেন আইরিন। চশমা খুলে নিয়ে খুক খুক করে কেশে বললেন। ‘আসলে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি তো...যাই হোক, সমস্যা কী?’

এতোক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলে? কিছুটা হলেও রেগে উঠল লিলা। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘স্যামের ব্যাপারে একটু দুষ্পিত্তা হচ্ছে। সারা বিকাল দোকানে কাটিয়েছে। এখনও বাসায় আসেনি। আমি খোঁজ নিতে দিয়ে দেখি, গাড়িটা বাইরে পার্ক করা। দরজা বন্ধ আর আলোও নিভানো।’

‘চাবি আছে না?’

‘আছে, কিন্তু একা যেতে চাইছি না।’ ইতস্তত করল লিলা, কতোটুকু বলা ঠিক হবে তা বুঁবো উঠতে পারছে না। আইরিনকে কিছু বলা আর মাইক হাতে নিয়ে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা একই কথা। কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন না, এখন স্যামকে নিয়ে চিন্তা করার সময়। যদি ওর কিছু হয়ে যায়...

‘খবরে একটা প্রতিবেদন শুনলাম,’ অবশ্যে বলেই ফেলল। ‘বিকালে মানসিক হাসপাতাল থেকে এক রোগী পালিয়েছে।’

‘নরম্যান বেটস?’

দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল লিলা। ‘আপনি শুনেছেন?’

নড় করলেন আইরিন। ‘আধ ঘণ্টা আগে চাক মারউইন শেরিফের খোঁজে এসেছিল। ও তো ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে আছে। চেনো ওকে? ডেভের ছেলে, লম্বা—’

‘চিনি আমি। কী বলল?’

‘ভ্যান্টা ওখান থেকেই এসেছে।’

‘কোন ভ্যান?’

‘লিখে রেখেছি। একটু অপেক্ষা করো...’ বলতে বলতে ম্যাগাজিনের নিচ থেকে একটা লেখার প্যাড বের করে আনলেন আইরিন। চোখে আবার চশমা গলিয়ে বললেন, ‘চাক বলেছিল, পাগলাটা যে ভ্যানে করে পালিয়েছিল, সেই ভ্যানটা ওরা খুঁজে পেয়েছে। সম্ভবত গাড়িতে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। তেতরে দুইটা মরদেহ পাওয়া গিয়েছে। একটি এক মহিলার, ওই হাসপাতালে রোগীদের সাথে দেখা করতে যাওয়া এক নানের। অন্যটা নরম্যান বেটসের।’

‘বেটস মারা গিয়েছে?’

‘পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে। চাক নাকি ওর পাঁচ বছরের চাকরির ইতিহাসে এমন বাজে ভাবে পোড়া দেহ দেখেনি।’

‘স্টশুরকে ধন্যবাদ।’

চোখ তুলে চাইলেন আইরিন। ‘এসবের সাথে স্যামের কী সম্পর্ক?’

‘নেই।’ মাথা নাড়ল লিলা। ‘যাক সে কথা, আমি নাহয় আরেকবার দোকানে গিয়ে দেখি। শেরিফ এলে ওকে কি কষ্ট করে একটু দেখা করে যেতে বলবেন? আমাদের গাড়িটা না থাকলে তো হয়েই গেল, বুঁবো যাবেন যে আমরা বাড়ি ফিরে গিয়েছি।’

‘অবশ্যই বলব। লিখে রাখছি।’

ফুরফুরে মন দিয়ে দোকানের দিকে ফিরে চলল লিলা। এবার আর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোবার কোনও দরকার নেই। নরম্যানের ভয় মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন যেটুকু দুশ্চিন্তা, তা স্যামকে নিয়ে। তবে মনে হয় না ভয় করার

খুব একটা ভয়ের কারণ রয়েছে। সারা বিকাল কাজ করে, ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গলির কাছে এসে স্টেশন ওয়াগনটাকে পার্ক করা অবস্থাতেই দেখতে পেল ও। আশা করেছিল, পাবে না। কিছুটা দ্রুত পায়েই পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, চাবীটা হাতে উঠে এসেছে। কিন্তু শব্দ করে খুলে গেল তালা। তেতরে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়াল, বাতি জ্বালাবার সুইচটা কোথায় তা মনে করার চেষ্টা করছে। ডান দিকের দেয়ালে ছিল, নাকি বাঁ দিকের? ডান দিকের দেয়ালটা হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা খুঁজে বের কল ও, কিন্তু টিপলেও বাতি জ্বলল না! নষ্ট হয়ে গিয়েছে নাকি?

ভয় পাবার কিছু নেই, হৃদপিণ্ডে গতি আচমকা বেড়ে যাচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে বোঝাল মেয়েটা। বিদ্যুৎ যে হারে আসা-যাওয়া করছে, তাতে বাতি নষ্ট হয়ে যেতেই পারে। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। আন্তে আন্তে ঘরের বিভিন্ন জিনিসগুলো ওর দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু করল।

ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ফাইল ক্যাবিনেট, ডেস্ক আর চেয়ার ঘরের মাঝখানটা দখল করে আছে। ডেস্কের উপরে আছে একগাদা ফাইল আর কাগজ। কিন্তু চেয়ারটা খালি। স্যাম ডেক্সের অবস্থা এমন অগোছালো করে রেখে যাবার মতো মানুষ না। সম্ভবত দোকানের সামনের দিকে গিয়েছে। সেদিকে এগোল লিলা।

অন্ধকার এখানে যেন আরও জাঁকিয়ে বসেছে। গোবরাটে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'স্যাম?' স্বামীর নাম ধরে ডাকল।

উন্নর এল না কোনও।

'স্যাম?' হায় ইশ্বর-নিশ্চয় ওর সাথে অশুভ কিছু একটা ঘটেছে। আশঙ্কায় ভরে উঠল ওর মন। সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে, কাউন্টারটা ঘুরতেই পেয়ে গেল স্বামীকে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে স্যাম, নিষ্প্রাণ চোখ দুটো ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

ঠিক ধরতে পেরেছিল লিলা, সমস্যাটা স্যামের হৃদপিণ্ডেই। ওই যে, ওখানে গেঁথে আছে ছোরাটা!

তবুও লিলার মনে হলো স্যাম বেঁচে আছে, কেননা শ্বাস ফেলার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও।

পরমুহূর্তেই ওর পেছন থেকে বেরিয়ে আসা ছায়াটা সেই ভুল ভেঙ্গে দিল। শব্দ শুনে লিলা ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

না ঘুরলেই মনে হয় ভালো হতো।

কেননা চোখের সামনে ছোরা ধরা হাতটা দেখতে পেল সে।

ওর বুকের দিকে নেমে আসছে!



এগারো

ডা. ক্লেইবর্ন যখন হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে এসে গাড়ি থামালেন, তখন দেখতে পেলেন, শেরিফের গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জুলতে থাকা লাল-নীল আলো দেখা মাত্র, ব্রেক করে ছিলেন তিনি। এখন গাড়ি থেকে নেমে, দরজার সামনে চলে এলেন।

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান।’ দরজার কাছে আসতেই, ছোট খাটো এক মানুষ তাকে আটকে দিল। সাথে সাথে পেশাগত দৃষ্টিতে তিনি অপরিচিত লোকটার দিকে তাকালোং পাতলা, চিমসে আসা চেহারা। চেখের রঙের সাথে মিলে যায় এমন হালকা বাদামী চুল, একদম নিখুঁত করে কাটা গেঁফ। কালো স্যুট পরে আছে, সেই সাথে সাদা শার্ট আর ধূসর রঙে টাই। ছোট শহরগুলোর ব্যবসায়ীরা সাধারণত এমন পোশাকই পরে থাকে। স্বত্ত্বির একটা পরশ বয়ে গেল ডা. ক্লেইবর্নের দেহমনে।

‘স্যাম লুমিস?’ জানতে চাইলেন তিনি।

ছোট খাটো মানুষটা মাথা নাড়ল। ‘না, মিল্ট অ্যাংস্ট্রম। কাউন্টির শেরিফ আমি।’

কথাগুলো শোনা মাত্র উধাও হয়ে গেল ক্লেইবর্নের স্বত্ত্বিকু, দৃষ্টি নেমে এল নিচে। একটু আগে দেখা পরিধেয়টুকু সম্পূর্ণ হলো এবার-লোকটার পায়ে সুচালো, কালো বুট। চোখ তুলে শেরিফের দিকে তাকালেন তিনি। একটা প্রশ্ন করলেন তিনি, কিন্তু উভরটা কী হবে, তা-ও বুঝতে পারলেন। ‘মি. লুমিস কোথায়? তার কি কিছু হয়েছে?’

‘কিছু মনে না করলে বলি, এখানে সচরাচর আমিই প্রশ্ন করে থাকি।’ প্রতিক্রিয়াইন চোখে ডা. ক্লেইবর্নের দিকে তাকিয়ে বললেন শেরিফ। ‘এই যেমন, আপনি কে? এখানে কী করছেন?’

ক্লেইবর্নের মনে হলো, তার পাটা আর দেহের ভার বইতে পারছে না। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে শরীর। বিশ্রাম নেবার শেষ সুযোগটা কখন পেয়েছেন, তা-ও এখন মনে করতে পারছেন না। এমনকী হাইওয়ে থেকে শহরে আসার রাস্তায় নামার পর, গাড়ি চালাতে চালাতেই তন্দ্রা মতো চলে এসেছিল! অতিরিক্ত চিতার কুফল। এই মুহূর্তে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে আর কিছু চান না তিনি। ‘অনেক লম্বা কাহিনী,’ অবশ্যে বললেন। ‘একটু ভেতরে গিয়ে বললে-’

কুঁচকে এলো শেরিফের ভু। ‘এখানে দাঁড়িয়েই বলুন।’

শেরিফকে নিজের পরিচয় দিয়ে যখন হাসপাতাল আর ওই ভ্যানের ব্যাপারে
বলা শেষ করেছেন, তখন ডা. ক্লেইবর্নের মনে হচ্ছিল, আরেকটু হলেই পড়ে
যাবেন।

কিছুই লিখলেন না শেরিফ, কিন্তু বোৱা গেল খুব মনোযোগ দিয়ে সব কথা
শুনেছেন। কথা শেষ হলে নড় করলেন, ‘মনে হচ্ছে, আপনি ভেতরে এলেই
ভালো হবে।’ ক্লেইবর্নকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, ঘুরে ভেতরে চলে
গেলেন।

দ্রুত পায়ে এগোলেন ক্লেইবর্ন, শেরিফের কাছাকাছি আসতেই জানতে
চাইলেন, ‘লুমিস কি মৃত?’

কাউন্টার কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন শেরিফ, মেঝের দিকে ইঙ্গিত
করে বললেন, ‘আপনি ডাঙ্গার, আপনিই বলুন।’

সামনে দিকে ঝুঁকে গেলেন ক্লেইবর্ন, শেরিফের দেখানো জায়গাটার দিকে
তাকিয়ে রাইলেন দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত। অ্যাংস্ট্রমকে একদৃষ্টিতে ওর দিকে
তাকিয়ে আছেন, তা বুঝতে পারছে। শালা হারামী-উপভোগ করছে ব্যাপারটা!
কী মনে করেছে? বমি করে ফেলব? আমি ডাঙ্গার, এরচেয়ে বীভৎস শত শত
লাশ দেখেছি।

ডা. ক্লেইবর্ন স্যাম লুমিসকেও এর আগে দেখেছেন। আর সেজন্যই কিছুটা
হলেও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লাশটার দলা পাকিয়ে শুয়ে থাকা দেখে, তার ভেতরে
কিছু একটা যেন নড়ে উঠল। নরম্যানের ফাইলে এর আগেও এমন দলা পাকানো
লাশ দেখতে পেয়েছে। নরম্যানের ফাইল!

অনেক চেষ্টা করে গলায় পেশাদারী ভাব ফুটিয়ে তুললেন তিনি। ‘ক্ষতটা বেশ
বড়। বোঝাই যাচ্ছে যে বড় আকারের কোনও ছুরি দিয়ে আঘাত হানা হয়েছে।
যে হারে রক্ত ঝরেছে তাতে মনে হয়, অ্যাওটা ফুটো হয়ে গিয়েছে। আমি কি
পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখব?’

শেরিফ মাথা নাড়লেন। ‘লাগবে না। আমার লোক কাউন্টি জেনারেল
হাসপাতাল থেকে আসছে, মানে যখন ওই মন্ট্রোসের ঝামেলা সামলে ফাঁকা হবে
তখন আসবে।’ কয়েক পা পিছিয়ে, কাউন্টারের ওপাশে চলে গেলেন তিনি। ‘ও
আসতে আসতে আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই আপনাকে। কেন জানি মনে
হচ্ছে, আপনি দেখতে চাইবেন।’

শেরিফকে অনুসরণ করলেন ক্লেইবর্ন। ভুল বলেছে লোকটা, এই দৃশ্য দেখার
কোনও খায়েশ তার নেই। কাউন্টারের ওপাশের পরে আছে অন্তত এক ডজন
ক্ষত শরীরে নিয়ে শুয়ে থাকা এক নারী দেহ। সাদাটে ত্বকের ফাঁক দিয়ে লাল
রক্ত ঝরেছে। মেয়েটাকে পরিচিত মনে হলো না তার, কিন্তু তবুও চিনতে
পারলেন।

‘লিলা লুমিস।’ ক্লেইবর্নের আন্দাজটাকে সত্য প্রমাণিত করলেন শেরিফ।
‘স্যামের স্ত্রী।’

ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার, গা গুলিয়ে আসছে। নিজেকে প্রথম বর্ষের ছাত্র বলে
মনে হলো, যে কিনা জীবনের প্রথম শবচ্ছেদ ক্লাসে এসেছে। অনেক কষ্ট করেও,
অশ্ফুট কঠে কয়েকটা কথাই বলতে পারলেন কেবল, ‘ও দুজনকেই মেরে
ফেলেছে তাহলে।’

‘ও? ও টা কে?’

‘নরম্যান বেটস।’

‘হয়তো।’

‘হয়তো না, এই ঘটনার পর তো সন্দেহের আর কোনও অবকাশ রইল না।
আমি ঠিক বলেছিলাম। ভ্যানে আগুন ধরাবার পরপর এখানে চলে আসে
নরম্যান। একটু আগে বলেছিলাম না, রাস্তা থেকে নিশ্চয় এক পথচারীকে তুলে
নিয়েছিল?’

‘নিশ্চয়? আন্দাজে ঢিলের জায়গায় পাটকেল ছুঁড়ছেন না তো?’

‘নাহ। সাইন্টারকে সাথে করে নিয়ে এসেছি।’ ঘুরতে শুরু করলেন ক্লেইবর্ন।
‘আমার সাথে আসুন। দেখাচ্ছি-’

‘পরে,’ বলে কাউন্টারের শেষ মাথায় চলে এলেন শেরিফ। ‘আরেকটা জিনিস
দেখাতে চাই।’

ক্লেইবর্ন শেরিফের পাশে এসে দাঁড়ালে, ক্যাশ রেজিস্টারটা খুলে দেখালেন
তিনি। ‘খালি। আজ বিকালে ওখানে নয়শ তেরাশি ডলার ছিল। এখন একটা
আধুলিও নেই।’

‘পরিমানটা জানলেন কী করে?’

‘মেঝেতে পড়া অবস্থায় একটা কাগজ পেয়েছি,’ পকেট থেকে কাগজটা বের
করতে করতে বললেন অ্যাংস্ট্রুম। ‘কালকে ব্যাংকে জমা দেবার জন্য হিসাব সেরে
রেখেছিল স্যাম।’

‘তাহলে নরম্যান টাকাগুলো নিয়ে নিয়েছে।’

‘কেউ একজন নিয়েছে,’ বলে ঘুরে দাঁড়ালেন শেরিফ। ‘আরও কয়েকটা জিনিস
দেখাতে চাই।’ কাউন্টারের নিচে হাত গলিয়ে একটা ডিসপ্লে ট্রে বের করে
আনলেন তিনি। ওখানে সুন্দর করে বারোটা নানা আকারের ইস্পাতের ছুরি
সাজানো রয়েছে। নাহ, ভুল হলো। এক ডজন না-তাড়াতাড়ি সংখ্যাটা গুনে
নিজেকে ঠিক করে নিলেন ক্লেইবর্ন। এখন ওখানে রয়েছে এগারোটা ছুরি, শেষ
মাথার ছুরিটা নেই।

‘একটা নেই,’ বলে উঠলেন শেরিফ। ‘আমার ধারনা ওটা দিয়েই খুন করা
হয়েছে।’

ক্লেইবর্নকে পিছু নেবার ইঙ্গিত করে, নিজে পেছনের ঘরটায় চলে গেলেন তিনি। ডাঙ্গার তার পিছু নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে টের পেয়ে, হাত দিয়ে মাথার ওপর ঝুলন্ত বাতিটা দেখালেন। ‘মিসেস লুমিসের খোঁজে যখন আমি এখানে আসি, তখন পেছনের দরজা খোলা ছিল। কিন্তু বাতি ঝুলছিল না। প্রথমে ভেবেছিলাম চলে গিয়েছে। কিন্তু পরে দেখি, কেউ ওটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে। বাল্টাকে আবার জায়গামতো লাগিয়ে দেখি, একদম ঠিক আছে ওটা।’

‘বুঝতে পেরেছি।’ ক্লেইবর্ন ডেক্স আর চেয়ারটাকে দেখালেন। ‘নরম্যান চুরি করে ঢোকে ভেতরে, স্যামকে ডেক্সে বসা অবস্থায় খুন করেছে। এরপর লাশটাকে সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়েছে। এই যে দেখুন, রক্তের দাগ। এরপর এখানে আবার ফিরে এসে বাল্টা খুলে ফেলেছে। অন্দরকারে অপেক্ষা করেছে মিসেস লুমিস আসার—’

‘মহিলা যে আসবেন, তা আপনার এই নরম্যান বুকাল কীভাবে?’

‘ভেবেছিল, স্যামের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে নিশ্চয় খোঁজ নিতে আসবে। আসলে এই দুজনকে খুন করার জন্যই এখানে এসেছে ও।’

শ্রাগ করলেন অ্যাংস্ট্রম। ‘আমার কী মনে হয় বলব?’ বললেন তিনি। এরপর উভয়ের অপেক্ষায় না থেকে যোগ করলেন। ‘আমার মনে হয়, চোর চুকেছিল। এখানকার কেউ হতে পারে, আবার বাইরে থেকে আসা কোনও পথচারীও হতে পারে। চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কয়েকটা দোকান রেকি করেছিল। কিন্তু পারেনি। পরে এই দোকানে লাইট ঝুলতে দেখে, এখানকার পেছনের দরজা খোলার চেষ্টা করে দেখে। কপাল গুনে খোলা পেয়েও যায়। আপনি যেমনটা বললেন, চুপিসারে চুকে পড়ে ভেতরে। কিন্তু এছাড়া আর আপনার কথা মানতে পারছি না।’

‘কেন? কী সমস্যা?’

‘সমস্যা হলো, আপনি গোয়েন্দা নন।’ মেবের দিকে তাকালেন শেরিফ। ‘রক্ত আছে, কিন্তু দাগ নেই। কয়েক ফোঁটা আছে মাত্র। আমার তো মনে হয়, এই ফোঁটাগুলো চুরির গা থেকে পড়েছে। স্যামকে ডেক্সে বসা অবস্থায় চুরিকাঘাত করা হয়নি; ক্ষতিটা ওর বুকে, পিঠে নয়। চোর যখন ভেতরে ঢোকে, তখন ওর কাছে চুরিই ছিল না! ওটাও তো দোকান থেকে নিতে হয়েছে তাকে।’

জ্ঞ কুঁচকে ফেললেন ক্লেইবর্ন। ‘আমার তা-ও মনে হয়—’

‘কথা তো শেষ করতে দিন!’ শেরিফ গোবরাটের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ‘আমার ধারনা স্যাম যখন দোকান বন্ধ করতে সামনের দিকে গিয়েছিল, তখন ভেতরে চুকেছিল চোরটা। পয়সার লোভে এসেছিল সে, খুন করার জন্য না। ভেবেছিল, স্যাম চলে না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু পেছনে লুকাবার মতো কোনও জায়গা নেই বলে, অন্দরকার কাউন্টারের পেছনে আতঙ্গেপন

করেছিল। সমস্যা তখনই শুরু হয়। হয় স্যাম ওকে দেখে ফেলেছিল, নয়তো
কোনও আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। চমকে উঠে একটা ছুরি তুলে নেয় চোরটা,
বসিয়ে দেয় স্যামের বুকে।

যে কাজে এসেছিল, এরপর সেই কাজেই ব্যস্ত হয়ে পরে চোর বাবাজী।
রেজিস্টার থেকে টাকা তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার মনস্ত করে। কিন্তু ঠিক তখনই
দোকানের পেছন দিকে এসে উপস্থিত হয় লিলা লুমিস। ভয় পেয়ে পেছনের
দরজায় তালা দিয়ে দেয় চোর, ভেবেছিল লিলা চলে যাবে।

কিন্তু আশ্র্য হয়ে সে দেখল, লিলার সাথে বাড়তি চাবী আছে! তখন একটা
কাজই করার মতো সময় ছিল চোরের হাতে-মাথার উপর থেকে বাল্টা খুলে
ফেলা। তাই করল সে। এরপর হাতে ছুরি নিয়ে মেয়েটা সামনে আসার অপেক্ষায়
ওঁত পেতে ছিল।'

জ্ঞ কুঁচকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। 'আপনি তো মেয়েটার লাশ নিজ চোখে
দেখেছেন।' বললেন তিনি। 'চোর হলে হয়তো ভয়ের চোটে একবার বা দুইবার
আঘাত হানত। কিন্তু এমনভাবে এক ডজন বার! মেয়েটাকে কেবল খুন করা
হয়নি, বীভৎসভাবে খুন করা হয়েছে। যেভাবে এর বোনকে নরম্যান শাওয়ারে খুন
করেছিল-' বলতে বলতেই থেমে গেলেন তিনি। বুঝতে পারছেন যে এসব বলে
লাভ নেই। কেউ তার কথা বিশ্বাস করছে না। নিরেট, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া
করবেও না।

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছেন,' বললেন অ্যাংস্ট্রুম। 'নরম্যান বেটস যদি বেঁচে
থাকেও, খুব দ্রুতই ধরা পড়তে হবে তাকে। বেশিদূর যেতে পারবে না।'

'কীভাবে ধরা পড়বে? ওর হাতে এখন নগদ অর্থ আছে।'

'আর আমাদের কাছে আছে ওর আইডি, ছবি আর পুরো রেকর্ড। কোথায়
যাবে? কোথায় লুকাবে?'

উত্তর দিলেন না ক্লেইবর্ন। কি-ই বা বলবেন। মেঝের দিকে চলে গেল তার
নজর। আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। মেঝেতে কাগজের নীচে প্রায় চাপা
পরে আছে একটা খবরের কাগজ। পুরোটা পড়া না গেলেও, হেডলাইন পরিষ্কার
দেখা যাচ্ছে হলিউড প্রডিউসার বেটস কেসের উপর ভিত্তি করে চলচিত্র বানাতে
চান।

নরম্যান কোথায় যাচ্ছে, তা সাথে সাথে বুঝে ফেললেন তিনি।



বারো

বাথরুমের আয়নায় মেকাপটা ভালোমতো দেখে জ্যান হার্পার সিন্দ্বান্ত নিল,
একেবারে নিখুঁত হয়েছে কাজটা। আচমকা জিহ্বা বের করে ভেংচি কাটল সে।
অবশ্যে, ভাবল ও, এবার কাজে নেমে পড়া যাক।

কাউন্টারের উপরে রাখা পার্সটা তুলে নিয়ে, চুপিসারে দরজার দিকে এগোল
ও। অবশ্য তার কোনও দরকার ছিল না। ওর সাথে এই অ্যাপার্টমেন্টে অন্য যে
মেয়েটা থাকে, কনি, সে ওপাশের শোবার ঘরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। মাঝ রাতের
আগে ওর এই মরণঘূম ভাঙ্গবে বলে মনে হচ্ছে না। তারপরও কতক্ষণ আগের
রাতের আনন্দ-ফূর্তির রেশ থাকবে তা খোদা মালুম।

কিছুটা দীর্ঘাস্থিতবোধ করল জ্যান। কনি চাইলেই বেরিয়ে পড়তে পারে ঘর
ছেড়ে। এইসব মেকাপ-টেকাপের দরকার হয় না। বড় নাক আর ছোট ছোট স্তন
নিয়ে মেকাপ করেই বা কী লাভ? এই ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে চাই ছোট
নাক, আর বড় বড় স্তন। যেহেতু সেগুলো কনির নেই, তাই সাত সকালে উঠে
মেকাপ করার তাড়াও নেই।

হঠাৎ অপরাধবোধে ভরে উঠল ওর মনে, নিজের চেহারার উপরে তো আর
কনির হাত নেই! মেয়েটা চাইলেই নাকের অক্রপাচার করে আর ব্রাইর ভেতর
স্টাইরোফোম গুঁজে দিয়ে নিজের চেহারা আর দেহসৌষ্ঠব পরিবর্তন করতে
পারত। কিন্তু করেনি। ভাগ্য ওকে যা দিয়েছে, তাই নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা
করছে। এজন্য তার প্রশংসা প্রাপ্য হতে পারে, উপহাস নয়।

শ্বাগ করে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল জ্যান, নিঃশব্দে সদর দরজা
লাগিয়ে দিয়েছে। এখন কনিকে না, ওর নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার সময়। এই
জন্যই সকালের একটা ঘন্টা মেকাপের পেছনে ব্যয় করেছে মেয়েটা...এই জন্যই
কারপোর্টে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ছোট টর্যোটাটা। যতবার মাসিক পেমেন্টের
কথা মনে পড়ে, জ্যানের ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে।

কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে বসতেই, ওর মন মেজাজ ভালো হয়ে গেল। এই
গাড়িটা বিলাসিতার জন্য কেনা হয়নি। ওটা ওর পোশাকের-ই একটা প্রবর্ধিত
অংশ। চলচ্চিত্র পাড়ায় উপরে উঠতে হলে, বাসে আসা-যাওয়া করলে চলবে না!

ইঞ্জিন চালু করে, সাবধানে কারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল সে। কিছুক্ষণ পরেই
দেখা গেল, পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে মুলহল অ্যান্ড ড্রাইভের দিকে এগোচ্ছে।
সোমবার সকালের কুয়াশা ঘেরা আবহাওয়ায় এখনও গোফার, কয়েট এবং
অন্যান্য বুনো প্রাণিদের দেখা যাচ্ছে। ওদের দিকে না তাকিয়ে স্যান ফার্নান্দো

ভ্যালির দিকে তাকিয়ে রইল সে। কুয়াশা ভেদ করে, করনেট স্টুডিও'স এর সাউন্ড স্টেজ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সিবিএস স্টুডিও সেন্টার আর ইউনিভার্সালের কালো টাওয়ারের মাঝে অবস্থিত ওটা।

টয়োটা এখন বাঁয়ে মোড় নিয়ে নিচের দিকে রওনা দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের কুয়াশার দিকে তাকাল সে। এই কুয়াশা গাড়ির বারোটা বাজিয়ে ফেলে। মানুষের ফুসফুসে চুকলে যে তার অবস্থা কি হবে, তা বোঝাই যায়! কিন্তু লক্ষ যখন চূড়ার দিকে, তখন এসব নিয়ে চিন্তা না করাই ভালো। ভেনচূড়া বুলেভার্ড পার হয়ে, উত্তর দিকে রওনা দিল জ্যান। ডানেই স্টুডিও'র গেট। কিন্তু জ্যানের টয়োটাকে পার হয়ে গেল একটা চকচকে রোলস। গার্ডের কিউবিকলের সামনে মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। ভেতরে বসা ড্রাইভারকে দেখা মাত্র দেঁতো হাসি হেসে প্রবেশমুখের বাঁধাটা তুলে দিল গার্ড। জ্যানের গাড়ি কিউবিকলের সামনে আসতে আসতে, আবার নেমে এল ওটা।

গার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'জ্যান হার্পার।'

একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে লোকটা, চিনতে পারেনি। 'কার কাছে এসেছেন?'

'আমি কাজে এসেছি, ড্রিসকল ইউনিটের সাথে আছি।'

'এক মিনিট, দাঁড়ান।'

যুরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে থাকা লিস্টায় ওর নাম খুঁজল গার্ড। এরপর জ্যানের দিকে ফিরে বলল, 'নাম আছে। কিন্তু আপনার ইউনিটকে বলবেন যেন একটা স্টীকারের ব্যবস্থা করে দেয়।'

'ধন্যবাদ, বলব।'

বাঁধাটা উঠে গেলে, ভেতরে প্রবেশ করল জ্যান। হাসিতে ঠোঁটের লিপস্টিক বা চেহারার মেকাপ নষ্ট হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য গাড়ির কাঁচের দিকে তাকাল। রোলসের হারামজাদাটাকে দেখা মাত্র গার্ড যেতে দিল, অথচ ওকে এতদিন দেখা সত্ত্বেও পাতাই দিল না! ব্যাপার না। জ্যানেরও দিন আসবে।

ড্রিসকলের অফিসের পার্কিং লটের দিকে এগোল ও। প্রতিটা পার্কিং স্পেসে সুন্দর করে নাম লেখা আছে। সবগুলো নামই স্টুডিও-এর এক্সিকিউটিভদের। নিয়ম...নিয়মের দাস সবাই। স্টুডিও-এর নিয়ম যে এটাই। এক্সিকিউটিভরা অফিসের কাছাকাছি পার্কিং লটের জায়গা পায়। কর্মরত অভিনেতা-অভিনেত্রী আর ডি঱েক্টরদের পার্কিং করার জায়গা নির্ধারিত থাকে সাউন্ড স্টেজের কাছে। তবে নামগুলো পরিবর্তন হতে সময় লাগে না খুব একটা। চলচ্চিত্র ব্যবসার যে অবস্থা, তাতে সম্ভবত এই নাম লেখকদের-ই কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। জ্যান শ্বাগ করে পার্কিং লটের পেছনের দিকে চলে এল। পোর্টেবল ড্রেসিং রুম আর ট্রেইলারগুলোর ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল গাড়িটা।

হঁয়া, হঁয়া, ন্যায় বিচারই এটা। প্রতিশোধ না। ওর জায়গায় ডা. ক্লেইবন হলেও নিশ্চয় এমনটাই ভাবতেন। কেননা এই দুজনের সাক্ষ্যের কারণেই হাসপাতালে আটকা থাকতে হয়েছে ওকে। অথচ নরম্যানের ব্যাপারে মন্তব্য করার ওরা কে? মেয়েটা তো বোনের প্রেমিকের বিছানা গরম করতে ব্যস্ত। আর প্রেমিক প্রবর? তার মুখে অন্ন জোটে মানুষ বা পশু খুন করার সরঞ্জামাদি বিক্রি করে। খুনি, কসাই আর মৃত্যুর ব্যবসায়ী তো ওই স্যাম লুমিস। অথচ ভুগতে হচ্ছে নরম্যানকে! এ কেমন বিচার!

ন্যায় বিচার চাইবার জন্য কি ওকে দোষ দেয়া চলে?

কিন্তু প্রধান সড়ক মৃতপ্রায় আর পার্শ্ব রাস্তাগুলোও অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্যাম আর লিলা ওর কাছ থেকে আতঙ্গে পদচারণ করে রয়েছে নিশ্চয়। কে জানে, হয়তো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে! কিন্তু কোন বাড়িতে? কোন পর্দার পেছনে?

শত্রুদেরকে খুঁজে পাবে কোথায়? প্রতিটা দরজায় তো আর নক করে দেখা সম্ভব না। দুই রাস্তার সংযোগ স্থলে এসে থমকে দাঁড়াল নরম্যান, ভূ কুঁচকে আছে। এখন পর্যন্ত কারও নজরে পড়েনি ও, কিন্তু এই সৌভাগ্য যে কতক্ষণ থাকবে তা বলা মুশ্কিল। পলাতক এক মানুষ সে, ওকে খুঁজতে খুব শীঘ্ৰই অনেকের এসে পড়ার কথা। কিছু করতে চাইলে, এখনই করতে হবে। কিন্তু কী যে করবে...

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার ওপাশের ফিলিং স্টেশনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ফোন বুথটা নজরে পড়ল ওর। পেয়ে গেছে সমাধান। প্রথমে ফোন ডি঱েক্টেরি খুঁজল। কিন্তু কপাল মন্দ, যেখানে বইটা থাকার কথা, সেখানে শুধুই শূন্যতা। তথ্যের জন্য এখন অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, আজকালকার দিনে কেউ বাড়ির ঠিকানার জন্য অপারেটরকে ফোন করে না। আর এরকম একটা ছেট শহরে খবর বাতাসের চেয়ে দ্রুত বেগে ছড়ায়। ও ফোন নামিয়ে রাখার এক মিনিটের মাঝে নিশ্চয় অপারেটর সরাসরি স্যাম বা লিলাকে খবরটা জানিয়ে দেবে। তাই মত পাল্টাল নরম্যান।

দুই রাস্তার সংযোগস্থলে ফিরে এলো আবার। এখানে একটা পানশালা আছে। ওটাকে পার হয়েই একদম থমকে দাঁড়াল সে। রবিবারের আইন মেনে বন্ধ হয়ে আছে পানশালাসহ প্রায় সবগুলো দোকান। তবে একটা জানালায় এখনও আলো জ্বলছে। 'লুমিস হার্ডওয়্যার'-জুলজুল করে ধরা দিল ওর সামনে।

আছে, ভেতরে আছে কেউ একজন।

শিকারী বাঘের মতো নিঃশব্দে দোকানের দিকে এগোল নরম্যান বেটস।

‘পেরেছ?’ চোখ তুলে চাইল রয়। ‘তাহলে তো সব জানো।’

‘কী জানি?’

‘খবর শোননি? নরম্যান বেটস পালিয়েছে।’

‘হায়, সৈশ্বর।’

‘রিপোর্ট বলছে, লোকটা আরেকবার হত্যায়জ্ঞে মেতে উঠেছে। পাঁচজন ভিক্টিম পাওয়া গিয়েছে এখন পর্যন্ত। আরও বেশি হতে পারে, কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিশ্চিত নয়। তবে কথা হচ্ছে, এখনও সম্ভবত সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।’

থমকে দাঁড়াল জ্যান। ‘সেজন্যই তাহলে ড্রিসকল ডেকে পাঠিয়েছে! ছবি বানানো বন্ধ করে দেবে নাকি?’

‘দিতেও পারে।’

‘কিন্তু কাজটা-’ জ্যান হাত রাখল রয়ের হাতে। ‘আমাদের ওদেরকে থামাতেই হবে। কথা দাও, আমাকে সাহায্য করবে।’

ওর কথা শুনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রয়। কিছু বলছে না কেন লোকটা? দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে বলল, ‘কেবল নিজেকে নিয়েই আমি চিন্তিত নই। এই ছবিটা তোমার জন্যও জরুরী। তোমার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে এর সাথে।’

বরফ শীতল চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে রয়। হঠাৎ বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। উঁচু গলায় বলল, ‘সমস্যা কী তোমার, অ্যাঁ? এক বন্ধ উন্নাদ পাঁচ পাঁচজন মানুষকে খুন করে পালাচ্ছে, আর তুমি কিনা একটা বালের ছবি নিয়ে চিন্তিত! আচমকা এমন জোরের সাথে নিজের হাতটা সরিয়ে নিল রয় যে জ্যান ভয় পেল, লোকটা মেরে না বসে।’

কিন্তু তা না করে দ্রুত পায়ে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেল রয়, অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল জ্যান। ঠিক আনন্দাজ করতে পেরেছিল লোকটার ব্যাপারে। ওই ভদ্র ব্যবহার আর বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা নৃশংসতা আর রাগ পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। কিন্তু কেন যেন ভয় পেল না এক বিন্দুও। তবে অবাক হয়েছে। সেই সাথে হতাশ।

ছেলেটার প্রতি অভ্যন্তর এক শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে ও।

হয়তো সত্যি সত্যি রয় ওই খুনগুলো নিয়ে চিন্তিত।

কিন্তু জ্যান এতোদূর এসে সবকিছু বাদ দিয়ে দিতে পারে না। সেই ছোটবেলা থেকে কাজ করছে সে। সেই যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রণ-ওয়ালা চেহারা দেখত, ভাবত কেউ ওকে কখনও ভালোবাসবে কিনা, তখন থেকেই একটা মাত্র লক্ষ্য...একটা মাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়েছি। চেয়েছে এমন একজন হতে, যার প্রতি নিবন্ধ থাকবে সারা দুনিয়ার মনোযোগ। চলচিত্র আর টেলিভিশনের অভিনেত্রীরা যেমন হয়ে থাকে। এখন বড় হয়ে গিয়েছে ও,

টিভিতেও তাকে দেখিয়েছে। এখন লক্ষ্য চলচ্ছি। সবাই ভালোবাসবে
ওকে...সবাই।

রয়কে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এ প্রবেশ করতে দেখে, নতুন করে দৃঢ় হলো
তার সংকল্প। অপরাধবোধে ওকে আক্রান্ত করা বৃথা প্রচেষ্টা। ওই পাঁচ জন
ভিক্টিমের জন্য যদি কেঁদে রক্তও বইয়ে দেয় জ্যান, তাতে ভিক্টিমের কী
লাভ হবে? তারা মৃত, কিন্তু ও তো জীবিত!

দুনিয়া উল্টে গেলেও, এই ছবি বাতিল হতে দেবে না জ্যান হার্পার।



তেরো

অনিতা কেজি সব্যসাচী। ড্রিসকলের বাইরে অফিসে বসে বসে আছে সে, সামনে ছাড়িয়ে আছে ভ্যারাইটি আর হলিউড রিপোর্টার-এর মতো ম্যাগাজিন। দুই হাতে দুটো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে সে। যে আর্টিকেলগুলো মনিবের ভালো লাগতে পারে বলে মনে হচ্ছে, সেগুলো একটা ফেল্ট-টিপ লাল কলম দিয়ে দাগিয়ে রাখছে। জ্যান আগেও মেয়েটাকে এই কাজটা করতে দেখেছে, কিন্তু কাজটা যে করে কীভাবে তা বুঝে উঠতে পারেনি। তবে একথা সত্যি যে মেয়েটা একটু অঙ্গুত। অবশ্য অঙ্গুত না হলে কি আর কেউ কোনও প্রযোজকের সহকারী হয়?

একদম পোকা-মাকড়ের মতো না হলে, দায়িত্বটা সামলানো যায় না। এক ধরনের পোকা আছে না? একসাথে দুই দিকে তাকাতে পারে। ভুল হলো, এই পোকাটা একসাথে তিন দিক দেখতে পায়! কেননা ম্যাগাজিনের উপর থেকে নজর না তুলেই সে বলল, ‘ভেতরে চলে যান। মি. ড্রিসকল এখুনি আপনার সাথে যোগ দেবেন। আজ সকালে আসতে একটু দেরি করে ফেলেছেন।’

জ্যান নড় করে ডেক্সের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। আজ সকালে আসতে একটু দেরি করে ফেলেছেন। এ আর নতুন কী? প্রযোজকদের সহকারীদের মতানুসারে, তারা সবসময় দেরি করেই আসে। ঠিক যেন কোনও কমদামী ঘড়ি। অবশ্য আলাদা আছেন অনেকেই। যাদের দক্ষতা, প্রতিভা আর সুরক্ষি ছাড়া হলিউড কখনও বর্তমান অবস্থানে আসতে পারত না।

সমস্যা হলো, আজকাল সবাই নিজেকে প্রযোজক বলে পরিচয় দিতে পারে। শুধু দরকার একটা অফিস ভাড়া নেয়া আর ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখা। সাথে সাথে দেখা যাবে, উচ্চাভিলাসী মেয়েরা দলে দলে এসে দুঁপা ফাঁক করে শুয়ে পড়েছে।

স্টৈশুরকে ধন্যবাদ, মার্টি ড্রিসকল সেই দলে পড়ে না। পরিচয়ের পর থেকে এই পর্যন্ত কোনও বাজে ইঙ্গিত দেয়নি মেয়েটা। অফিসটাও দারূণ জাঁকজমকপূর্ণ। অফিসে ঢোকা মাত্র আরেকবার মুঝ হলো জ্যান। দেয়ালে দ্যমিরেঁ-এর আঁকা অনুসারে ওয়াল পেপার, কাঁচের বিশাল কফি টেবিলের সামনে বড় সড় কাউচ আর দামী কাঠের ডেক্সে সাজানো। ডেক্সের উপর রয়েছে কেবল ইন্টারকমের ফোন আর একেবারে বর্তমান স্ত্রী ও দুই সন্তানের ছবি। মুঝ হবার মতো, কিন্তু অতোটা প্রভাব ফেলার মতো না।

অফিসটা কেন যেন ওকে দ্বিধার মাঝে ফেলে দেয়। ড্রিসকলকে যতটুকু চেনে, লোকটা ফ্রেঞ্চও ছবি আর ফ্রেঞ্চ পোস্টকার্ডের মাঝে পার্থক্যও বোঝে না। দামী

জিনিস দিয়ে সাজানো হলেও, একেবারে অগোছালো। যেন অফিসের সব কিছু, এমনকি স্তৰী-স্তানের ছবিটাও, চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো! একরাতে নিয়ে এসে সব সাজিয়ে রেখেছে। যার অর্থ, চাইলে একদিনে অফিসটা খালিও করে দেয়া সম্ভব।

সম্ভবত এই ব্যাপারটাই জ্যানকে খোঁচাচ্ছে।

তাতে কী? ভাবল মেয়েটি। ড্রিসকল অন্যদের মতো নয়, নকল নয় সে। এর আগেও অনেকগুলো ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রে প্রযোজন করেছে। ব্যবসার নাড়ী-নক্ষত্র চেনে মার্ট, জানে কোথায় হাত দিলে টাকা পাওয়া যাবে। জানে কার ক্লজিটে কয়টা লাশ লুকায়িত আছে!

পাঁচ...রয় পাঁচটা লাশের কথা বলেছিল।

ওসব নিয়ে ভেব না, নিজেকে শোনাল সে। ঘরের অন্যপাশে তাকাতেই দেখতে পেল রয়কে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে লোকটা। জ্যানের নিঃশব্দ আগমন একদম টের পায়নি। সামনে ঝুঁকে পল মরগ্যানের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত এখন। পল মরগ্যান ছবিতে জ্যানের সাথে অভিনয় করছে। ওর সহযোগী।

কে কার সহযোগী! পল মরগ্যানের সহযোগী হচ্ছে জ্যান হার্পার। আর হবে না-ই বা কেন, পল মরগ্যান এক জীবন্ত কিংবদন্তি! আলো ছায়া খেলায় লোকটাকে দেখতে ছবির পর্দার বড়সড় একটা প্রতিলিপি বলে মনে হচ্ছে।

লোকটা যে নরম্যান বেটসের মতো একটা চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি সে। অবশ্য লোকটাও সম্ভবত জ্যানের মতো এক অপরিচিত মেয়ের চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান চরিত্রে দেখে অবাক হচ্ছে। সেজন্যই হয়তো ওকে চুকতে দেখা সত্ত্বেও ফিরে তাকায়নি পল। কারণটা যাই হোক না কেন, অতি দ্রুত লোকটাকে নরম করতে হবে। বোঝাতে হবে, এই ছবিটা ওকে নিয়েই। জ্যান সহযোগী মাত্র।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে মানুষ দুজনকে দেখছিল ও, কিন্তু কোমরে একটা স্পর্শ পেতেই কেঁপে উঠল। সেই সাথে নাকে এসে ধাক্কা দিল বাজে একটা গন্ধ। কপাল ভালো, পল মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে হাসছিল সে। এখন সেটা স্যাটে ভিজিনিকে দেখাবে।

অবশ্য হাসিটা তার প্রাপ্ত্য, হাজার হলেও সে-ই ওকে মেরি ক্রেন চরিত্রটার জন্য বেছে নিয়েছে। সমস্যা হলো, লোকটার নাকের নিচে শুঁয়োপোকার মতো দেখতে একটা গোঁফ আছে। ভিজিনির গায়ের গন্ধে আর সেই সাথে ওর উরুর দিকে নেমে আসতে থাকা স্পর্শে, গা শিহরিয়ে উঠল জ্যানের। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখের হাসিটা এখনও অবশিষ্ট আছে।

‘মি. ভিজিনি-’

‘স্যান্টো।’ কথা বলার জন্য ঠেঁট দুটো ফাঁকা হতে দেখে জ্যানের মনে হলো শঁয়োপোকাটা নড়ছে! ‘এতো আনুষ্ঠানিকতার কি আছে?’

নড করল জ্যান। আমি বুবাতে পারছি ব্যাপারটা। তুমি আনুষ্ঠানিকতা চাও না, চাও আন্তরিকতা। নাকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে?

মার্টি ড্রিসকলের গলা বাইরের অফিসের কাছ থেকে ভেসে আসায়, সবার মনোযোগ সেদিকেই ঘুরে গেল।

‘আমার ফোন এলে, পরে করতে বলো।’ বলল সে। দেরি করে আসার মতো এটাও একটা প্রথা, সবাইকে বোঝান যে এই মিটিংটা কত গুরুত্বপূর্ণ। ভেতরে এসে বিশাল ডেক্সের পেছনের তত্ত্বিক বিশাল চেয়ারে বসে পড়ল মোটা সোটা, টাক পড়তে শুরু করা লোকটা। তার পিছু পিছু ছায়ার মতো প্রবেশ করেছে জর্জ ওয়ার্ড। ধূসর চুল আর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, অতি প্রাচীন এক মানুষ সে। দীর্ঘদিন ধরে ড্রিসকলের সাথে আছে। ডেক্সের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রাইল সে, আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে।

‘বলে পড়ো সবাই।’ সামনে ঝুঁকে বলল মার্টি ড্রিসকল।

রয় আমেস আর পল মরগ্যান ডেক্সের দিকে মুখ করে থাকা সোফায় বসল। ভিজিনি দখল করল ডানদিকের একটা লাউঞ্জ, জর্জ ওয়ার্ডের কাছেই ওটা। জ্যান বেছে নিল বাঁ দিকের একটা চেয়ারকে।

‘কফি চাই কারও?’ সচরাচর যে কথাটা বলে মিটিং শুরু করে, সেটাই বলল মার্টি।

চাইল না কেউ।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পর, আচমকা কথা বলে উঠল সে। ‘গতকাল কী ঘটেছে, তা নিশ্চয় তোমরা সবাই শুনেছ। তারপর থেকে, ছবিটার ব্যাপারে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছি খুব।’

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব! শব্দটা শোনা মাত্র শক্ত হয়ে গেল জ্যান। ছবিটা বাতিল হতে যাচ্ছে, ঠিক বলেছিল রয়।

‘আপনি-ই একমাত্র ব্যক্তি নন যার মাঝে এমন অনুভূতি কাজ করছে।’ বলে উঠল রয়। ‘পলকেও কেবল সে কথাই বলছিলাম।’

‘আমার কিন্তু তা মনে হয় না।’ পল মরগ্যান বলে উঠল। ‘নরম্যান বেটসের পলায়নের সাথে আমাদের ছবির কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই। চিত্রনাট্যে ভুল কোনও তথ্য লেখা না হলে—’

মাথা ঝাঁকাল রয়। ‘আমার জানা সব তথ্যই তো এখন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।’

‘তাহলে চিত্রনাট্যেও পরিবর্তন আনলেই হয়।’ ভিজিনি দ্রুত বলে উঠল। ‘কয়েক পাতা এদিক-ওদিক করলেই হবে। কাজ শুরু করতে এখনও এক সপ্তাহ

বাকি আছে। আর তাছাড়া, প্রথমে যেহেতু লুমিস আর মেরি মেয়েটাকে নিয়ে কাজ করব, আরও কিছু দিন সময় পাওয়া যাবে।'

'এখানে কি আমরা কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি নাকি?' অধৈর্য কষ্টে বলে উঠল রয়। 'চিত্রনাট্যের কথা ভুলে যাও! বেটস যতক্ষণ পাগলা গারদে বন্দি ছিল, আমাদের কোনও অসুবিধা ছিল না। আমাদের ছবিটাও হতো সত্য কাহিনীর উপর নির্ভর করে লেখা এক রূপকথার গল্প। এমনকিছু একটা, যে অনেক আগে ঘটে গিয়েছে। কিন্তু এখন? এখন সবকিছু ঝুঢ় বাস্তবে রূপ নিয়েছে।'

'ঠিক,' নড় করল ড্রিসকল। জ্যানের মনে হলো, কেউ যেন ওর পাকছলী খামচে ধরেছে। প্রযোজক যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় তবে তো...নাহ, কিছু একটা করতেই হবে।

'আপনারা এখন হাল ছাড়তে পারেন না!' কষ্টস্থর উঁচু হবার সাথে সাথে জ্যান নিজেও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। সচকিত চোখে সবাই ওর দিকে তাকাল, কিন্তু পাত্রাই দিল না মেয়েটা। 'এখন হাল ছাড়া সম্ভব না।'

'জ্যান, দেখ-' রয়কে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। চোখে বিষাদের ছায়া, মেয়েটার দিকে একহাত বাঢ়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখন ইস্টরিয়াস্ত হবার সময় না-'

'তাহলে নিজে হচ্ছ কেন!' নিজেকে ছাঢ়িয়ে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জ্যান। লোকটাকে পাত্রাই দিল না ও, সম্পূর্ণ নজর এখন টোকো মাথার লোকটার দিকে। 'তোমাদের হয়েছেটা কী? তোমাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, আমার চারপাশে বৃদ্ধা মহিলারা বসে আছে! এখন থামাটা পাগলামি হবে। সোনার ডিম পাড়া হাঁস নিয়ে বসে আছ, বুবতে পারছ না কেন?'

মার্টির হাতদুটা উঠে আসতে দেখল ও। মনে হলো, প্রার্থনা করবে যেন লোকটা। কিন্তু তা, পরমুহূর্তেই হাততালি দেবার আওয়াজ শুনতে পেল জ্যান।

'অসাধারণ!' বলল লোকটা। 'একদম যথাযথভাবে বলেছ।'

'একবার খালি চিন্তা করে দেখ,' বলল ও। 'এমন পাবলিসিটি-'
ওকে থামিয়ে দিল ড্রিসকল। 'থামো। আমি কী ভাবছি, সেটা বলার সুযোগ দাও।' জর্জ ওয়ার্ডের দিকে মোটা আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল সে। 'তুমই বলো।'

নড় করল ধূসর চুলো লোকটা। 'যেমন মি. ড্রিসকল বললেন, তিনি পুরো চলচ্চিত্রটা নিয়ে ভেবে দেখেছেন। প্রথম প্রথম আমরাও মি. অ্যামেসের মতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সমস্যা হবে। এরপর হঠাৎ করে মিস জ্যানের হলাম আমরা-নরম্যান বেটসের এই পলায়নের চাইতে ভালো কিছু, আমাদের উন্নাদিনী'র পাবলিসিটির জন্য হতে পারত না। এক ধাক্কায় খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমাদেরকে নিয়ে যাবে এই ঘটনা। সারা দেশ জানবে আমাদের

চলচ্চিত্রের কথা। বেটস তো মরেই গিয়েছে, কিন্তু গল্পটা বেঁচে থাকবে আরও কিছু দিন। ওই পাঁচটা খুনের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত, গল্পটা মরবে না। এমন কিছু তো পয়সা দিয়েও কেনা যায় না। কেসটা নিয়ে কেউ কোনও কিছু বলা মানেই, আমাদের ছবির বিজ্ঞাপন করা।'

জ্যানের শক্ত হয়ে আসা দেহটা আন্তে আন্তে নরম হয়ে গেল। 'তাহলে কি আপনারা...আপনারা ছবিটা বাতিল করছেন না?'

'বরং উল্লেখ। এখনি কাজ শুরু করতে হবে।' বলল ড্রিসকল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্যাটিং শেষ করে, ছবিটা বাজারে ছাড়তে চাই।'

'খুব ভালো!' রয়ের দিকে ফিরে হাসল পল মরগ্যান। 'বলেছিলাম না, দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু নেই!'

'নেই মানে?' বলতে বলতে মরগ্যানকে অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল রয়। 'তুমি চিন্যাট্টের কথা ভুলে যাচ্ছ। গতকাল যে হয়েছে, তা তো আমাদের গল্পের সমাপ্তি পরিবর্তন করতে হবে!'

'আমি ভুলছি না।' বলল ড্রিসকল। 'স্যান্টো যেমন বলল; তোমার হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। যে যে পরিবর্তন করতে হয়, করে ফেল। সোমবারের মাঝে যদি তোমার কাজ শেষ না হয় তো, আমরা আগে পুরনো সীনগুলো রেকর্ড করে ফেলব। নতুন গুলো নিয়ে নাহয় একদম শেষে কাজ করা যাবে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি কোনও কথা দিতে চাই না—'

'তোমার এজেন্ট কথা দিয়ে ফেলেছে। আজকে সকালেই ফোন করেছিলাম। চুক্তিও হয়ে গিয়েছে।'

হাসল জ্যান, যতটুকু দুশ্চিন্তা ছিল তা-ও উধাও হয়ে গেল।

'আরে চিন্তা করো না তো,' রয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল স্যান্টো ভিজিনি। 'কয়েক পাতার-ই তো ব্যাপার। একবার ভেবে দেখ, নতুন কতগুলো উপকরণ আমাদের হাতে চলে এসেছে! নতুন পাঁচটা খুন, নরম্যানের মৃত্যু।'

জ্যান কুঁচকে ফেলল রয়। 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও কেবল। তোমাকে কে বলল যে নরম্যান মারা গিয়েছে?'



চোদ

‘শুধু মরেনি,’ সিগারেটের ফিল্টার ডা. ক্লেইবর্নে ডেকে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বললেন ডা. স্টাইনার। ‘মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। দেখ অ্যাডাম, আমি জানি তোমার মনে কী চলছে-’

‘তাই নাকি?’

‘নিজের ঘাড়ে দোষ টেনে নেয়াটা বন্ধ করবে? কেউ তোমাকে দোষ দিচ্ছে না।’
শ্রাগ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘এখানে দোষ কার, সেটা বড় কথা না,’ বললেন তিনি। ‘যা ঘটেছে, তার জন্য কে দায় নেবে-সেটা বড় কথা।’

‘ঘুরে ফিরে তো ব্যাপারটা একই দাঁড়াল।’ আরেকটা সিগারেট বের করে নিয়ে বললেন স্টাইনার। ‘দোষ, দায়িত্ব...এসব শব্দের মাঝে পার্থক্য আসলে কতোটুকু? ওভাবে চিন্তা করলে তো এর দায় কিছুটা ওটিসের উপরেও এসে পরে। আর ক্লারাই বা বাদ যাবে কেন? নরম্যান যখন হাসপাতাল ছেড়ে বের হয়, তখন তো সে রিসেপশনেই ছিল। দেখল না কেন?’

‘কিন্তু সবকিছুর দায়িত্বে তো ছিলাম আমি-’

‘আর যে লোকটা তোমার ঘাড়ে সেই দায়িত্ব চাপিয়েছিল, সেই লোকটা হচ্ছি আমি।’ বলতে বলতে ম্যাচের খোঁজে পকেটে হাত ঢেকালেন স্টাইনার। ‘তাহলে তো আমাকেও দায়ী বলতে হয়।’ সিগারেটটা ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়লেন ছাদ লক্ষ্য করে। ‘আমি এমনি এমনি বলিন যে তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি। খবরটা শোনার সাথে সাথে মিটিং-ফিটিং বাদ দিয়ে কেন চলে এলাম, বলো তো? প্রথমে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল। কিন্তু দৈশুরকে ধন্যবাদ, বিমান ভ্রমণের সময় মাথাটা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। আমার খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু অপরাধবোধটা নেই।’

‘আমার আছে।’

‘দেখ,’ সিগারেট ধরা হাতটা নাড়ালেন স্টাইনার। ‘কেউ নিখুঁত না। আমরা সবাই ভুল করি। এই কথাটা আমরা দুজনেই অনেকবার ব্যবহার করেছি, তাই না? জীবনের প্রতিটা ভুলের জন্য অপরাধবোধে ভুগলে, সকালে কাজের জন্য বের হওয়াটাই তো অসম্ভব হয়ে যাবে। গতকালকার ঘটনাটাও অনেকের ভুলের ফলাফল। কিন্তু আমরা কেউ, মানে ওটিস, ক্লারা, তুমি বা আমি...আমরা কেউ আগে থেকে ঘটনাটা আন্দজ করতে পারতাম না। তাই যদি আমাদেরকে দোষ দিয়ে হয়, তাহলে কেন অদৃষ্ট-দ্রষ্টা হলাম না, সেই দোষ দিতে হবে।’

‘এখন কে ভারী ভারী শব্দ বলে বেঢ়াচ্ছে?’ ক্লেইবর্ন বললেন। ‘আসল কথা হচ্ছে, আমার উপর একটা দায়িত্ব ছিল। আমি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি।’

‘ব্যর্থ হয়েছ?’ সামনে এসে আবারও ধোঁয়া ছাড়লেন স্টাইনার। ‘বুঝলাম, তুমি নিজেকে দায়ী বলে মনে করছ। কিন্তু কোন অপরাধের জন্য? তুমি কেবল ওটিসকে লাইব্রেরির দিকে নজর রাখতে বলেছিলে। এই তো? ওটিস যে ওর জায়গা ছেড়ে যাবে, তা জানার কোনও উপায় তোমার ছিল না। নরম্যান যে পালাবার ফন্দি আঁটছে, তা জানারও কোনও উপায় ছিল না। এখন থেকে আমরা কথা বললে বলব অকাট্য সত্য নিয়ে। নরম্যান খুন করেছিল সিস্টার বারবারাকে, চুরি করেছিল ভ্যানটা। যখন ওটা বিস্ফোরিত হলো, তখন নিজের দোষে মৃত্যু ঘটেছে ওর আর সিস্টার কুপারটাইনের-’

‘আমার কথাটা এবার মন দিয়ে শুনুন,’ উঠে দাঁড়ালেন ক্লেইবর্ন। ‘নরম্যান ভ্যানে মারা যায়নি। ওরা এক পথচারীকে তুলে নিয়েছিল। আমি জানি, কারণ আমি ওই পথচারীর লেখা সাইনটা খুঁজে পেয়েছি। নরম্যান সিস্টার কুপারটাইন আর সেই পথচারীকে খুন করেছে। এরপর ফেয়ারভিলে গিয়ে স্যাম আর লিলা লুমিসের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। অ্যাংস্ট্রোম আপনাকে বলেননি?’

‘নড করলেন স্টাইনার। ‘বলেছে। আজকে সকালে কথা বলার সময়, তোমার তত্ত্ব ও আমাকে শুনিয়েছে সে। লোকটার কিন্তু ধারনা যে, ওই দুজনকে খুন করেছে কোনও চোর। হয়তো যে পথচারীর কথা বলছ, সে-ও হতে পারে-’

‘ধারনা?’ ক্লেইবর্ন বলে উঠলেন। ‘কীসের ভিত্তিতে এই ধারনা হলো তা-ও বলেছে কী? প্রমাণ কই? তার কথাও আরেকটা তত্ত্ব। লুমিস দম্পত্তির খুনটাকে কাকতালীয় ঘটনা ধরে নিলেই, সব ঝামেলা চুকে যায়, তাই না? কিন্তু আমি যে ঘটনাটাকে কাকতালীয় বলে ধরে নিতে পারছি না। আমার মতে, ওটা ইচ্ছাকৃত খুন।’ হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। ‘আর নিরেট তথ্য বা প্রমাণ যদি চান তো বলি, স্যাম আর লিলা লুমিসকে শুধু খুনই করা হয়নি, আক্রেশ মিটিয়ে খুন করা হয়েছে। মোটিভ এর সাথে পদ্ধতি যোগ করে বলুন, এমন কে আছে যে এই দুজনকে অতোটা আক্রোশ নিয়ে খুন করবে?’

‘ময়না তদন্তের পুরো রিপোর্ট আসার আগে,’ এই সিগারেটটাও নিভিয়ে ফেললেন স্টাইনার। ‘কিছুই জানা যাবে না। এই সঙ্গাহের শেষের দিকে-’

‘সঙ্গাহের শেষের দিকে?’ থমকে গেলেন ডা. ক্লেইবর্ন। ‘এই লোকগুলো এমন অলস কেন? দেখুন নিক, আমি ফরেনসিক সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করার পর, একটা ময়না তদন্তেও বসিনি। কিন্তু তবুও বলছি, আমাকে তিন ঘন্টা সময় দিন। আমি অবশ্যই তার পরিচয় বের করে আনব।’

নড় করলেন স্টাইনার। ‘রিগসবিও বের করতে পারবে। সমস্যা হলো ওর হাতে এখন অনেক কাজ।’

‘বাসের অ্যাক্সিডেন্টটার জন্য?’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডা. স্টাইনার। ‘গতকাল সাতজন নিহত হয়েছে। আহতদের মাঝে দুজন গতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। মোট হলো নয়জন।’

‘আচ্ছা, রিগবিকে এই কাজটা আগে করার জন্য চাপ দেয়া যায় না?’

‘অ্যাংস্ট্রম চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, কাউন্টি করোনারের পদটা কিন্তু নির্বাচনে জিতে পেতে হয়।’

‘মানে?’

‘মানে, অ্যাংস্ট্রম একজন মাত্র মানুষ। এদিকে অ্যাক্সিডেন্টের ফলে মৃত মানুষদের পরিবারে সদস্য একের অধিক। যাদের সবাই আবার ভোটার। রিগবি যে ওর চাইতে অন্যদের কথার বেশি গুরুত্ব দেবে, তাতে আর আশর্মের কী আছে।’

আরেকটা সিগারেট বের করে ধরালেন ডা. স্টাইনার। ‘বেচারার জন্য আমার মায়া-ই হয়। সারা সংগ্রহ খেটে মরতে হবে বেচারাকে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।’

‘মানব জীবনের চাইতে কী রাজনীতি বড়? আমি মানতে চাই না। আপনার তা মনে হয় বলে আমার বিশ্বাস হয় না।’

‘আমিও তা মনে করি না।’ ডা. স্টাইনার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। ‘পনেরো মিনিটের মাঝে তিন-তিনটা ধরিয়ে ফেললাম! সিগারেটটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। ‘বিশ্বাস করো, আমিও তোমার মতো নিয়ম মেনে সব কিছু করতে চাই। কিন্তু আমাদের হাতে আর কোনও উপায় নেই। চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।’

‘নরম্যান তো চুপচাপ বসে থাকবে না।’

শ্রাগ করলেন ডা. স্টাইনার। ‘ঠিক আছে। যদিও আমার বিশ্বাস হয় না, তবুও ধরে নিলাম যে বেটস এখনও বেঁচে আছে। অ্যাংস্ট্রম জানালো, সে ক্যাপ্টেন বেনিং-এর সাথে মিলে কাজ করছে। অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে ওরা। কেউ কিছু জানলেই যেন জানায়, সে অনুরোধ করেছে জনসাধারণকে। সব প্রমাণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। কিন্তু শক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, ওদেরকে ওদের নিয়ে থাকতে দাও। তুমি তাদেরকে থামাতে পারবে না। যেমন পারবে না হলিউড স্টুডিও’র ওদেরকে চলচ্চিত্র বানানো থেকে ফেরাতে।’

চোখ তুলে তাকালেন ক্লেইবন্স, সেই চোখে প্রশংস। নড় করলেন ডা. স্টাইনার। ‘বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রযোজক আমাকে ফোন দিয়েছিল। যার সাথে তুমি গতকাল কথা বলেছিল, সেই লোকটাই।’

‘মার্টি ড্রিসকল?’

‘আমি ফেরার সাথে সাথে লোকটা ফোন করেছিল। বলল, গতকালের খবরটা পড়েছে। আরও তথ্য চায়।’

‘দিয়েও দিলেন?’

‘অবশ্যই না।’ জ্ঞ কুঁচকে তাকালেন স্টাইনার। ‘আমার লোকটাকে সাহায্য করার কোনও ইচ্ছা নেই। কখনও ছিল না। আমি তার পাঠানো চিত্রনাট্য পড়িনি। লেখকের সাথে কথাও বলতে চাই না। বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে আমার পরামর্শ ছিল, চলচ্চিত্রটা বাতিল করে দেয়া হোক।’

‘মেনেছে?’

‘তা আর মানে? বলেছে জাহানামের চৌরাস্তায় যেতে! আগামী সোমবার থেকে ওরা শুটিং শুরু করবে।’

‘অসম্ভব!’ মাথা নাড়লেন ক্লেইবন। ‘নিক, আমরা ওদেরকে একাজ করতে দিতে পারি না।’

‘অবশ্যই পারি না।’ ডা. স্টাইনার চেয়ার পেছন দিকে ঢেলে দিলেন। ‘আমি কাজে যাচ্ছি। তুমি নাহয় কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নাও।’

‘আমি ছুটি চাই না-’

‘তোমার চাওয়া-পাওয়ার কথা বাদ দাও। এই ছুটিটা তোমার বড় দরকার। তোমার সব রোগীর দেখাশোনার ভার নাহয় আমি নিয়ে নিলাম। তুমি পরিশ্রমে ঝাল্ট হয়ে পড়েছে। তিলকে তাল বানাচ্ছ।’

‘তিলকে তাল বানাচ্ছ?’

‘এই চলচ্চিত্রের ব্যাপারে বলছি। ওরা আসলে যা মনে চায়, তাই করতে পারে। আমরা ওদেরকে থামাতে পারব না।’

‘হয়তো আমরা পারব না।’ বললেন ক্লেইবন। ‘কিন্তু আমরা না পারলেও, নরম্যান পারবে।’

পনেরো

স্টাইনারকে কিছু বলাই উচিত হয়নি। ক্লেইবন্রের বোৰা উচিত ছিল, নিক ওৱ
কথাকে কোনও গুৱত্ত-ই দিচ্ছেন না। তবে একবাব যখন বলে ফেলেছে, তখন
অবশ্য ওসব কথা ভেবে আৱ কোনও লাভ নেই। সমস্যা হলো, ওৱা সবাই এখন
তাকে হাসপাতালের ভেতৱে আটকে ফেলেছে! ওকেই কিনা রোগী বানিয়ে
ফেলেছে! ডায়াগনোসিস যে কী, সেটাও কেউ বলছে না। নাৰ্স বা আৰ্দালিৱা
অবশ্য ওৱ সাথে কথা বলাৰ সময় ‘ডাঙ্গাৰ’ বলেই ডাকছে। একদম ভদ্ৰ আচৱণ
কৱছে সবাই। ভদ্ৰ...তবে শক্ত। অবশ্য এমন শক্ত হবাৰ দৱকাৱও আছে। ওদেৱ
জায়গায় তিনি হলেও একই আচৱণ কৱতেন।

নিজে ডাঙ্গাৰ বলে, রোগী হিসেবে নিজেকে মেনে নিতে পাৱছেন না ক্লেইবন্র।
এই কেউ তাকে পৱীক্ষা কৱে দেখছে তো এই কেউ তার সাৱা দেহে কী যেন
খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন ডাঙ্গাৰ বা রোগী না, কোনও অপৱাধী তিনি! এখানে
দাঁড়াও, ওখানে বসো। কাহাতক সহ্য হয়!

অঙ্গুত এক সুৱ বাজছে কোথাও, সুৱটা ঠিক যেন তার মাথায় গিয়ে আঘাত
হানছে। মনে হচ্ছে, কানেৰ পৰ্দা ফেটে যাবে। চোখ বন্ধ কৱে রেখেও, সুৱটাৱ
হাত থেকে পালাতে পাৱছেন না তিনি। পালাবাৰ কোনও উপায় নেই। হাত দিয়ে
কান ঢাকতে যাবাৰ সময় আচমকা উপলব্ধি কৱতে পাৱলেন, বেঁধে রাখা হয়েছে
তাকে!

আন্তে আন্তে কেঁপে উঠতে শুৱ কৱল তার দেহ। জোৱ কৱে সামনেৰ দিকে
খুঁকে এলেন তিনি, অনঢ় হয়ে চেপে বসা স্টাপণ্ডলো হার মানতে চাইছে না।
নেই...কোনও উপায় নেই পালাবাৰ। কিন্তু না, হার মানা চলবে না। পালাতে
তাকে হবেই-

হঠাৎ জেগে উঠলেন তিনি, চোখ খুলেই কোমৱেৰ দিকে চাইলেন। সীট বেল্ট
বাধা আছে। শান্ত হও, নিজেকেই বললেন। বিমানে আছ তুমি। আশুন্ত হয়ে
চেয়াৱে হেলান দিলেন তিনি, মুখে যে হাসি চলে এসেছে তা পৱিক্ষাৰ বুৱাতে
পাৱছেন। একিসাথে অপৱাধবোধ আৱ স্বষ্টিতে ভৱে উঠল তার মন।

ঠিক বলেছিলেন স্টাইনার, আসলেই অধিক পৱিশ্বমে কৃষ্ণত হয়ে গিয়েছেন
তিনি। বিমানে ঘূমিয়ে পড়াটাই তার প্ৰমাণ। এতোক্ষণ ধৰে দুঃঘনে যা যা
দেখেছিলেন, সেসবও ব্যাখ্যা মোগ্য। যেমন বিমানবালা আৱ এখানকাৱ কৰ্মচাৱীৱা
হচ্ছেন তার স্বপ্নেৰ নাৰ্স আৱ আৰ্দালি। বিমান বন্দৱেৱ সিকিউরিটি পাৱ হবাৰ
সময় যে তার শৱীৰ খুঁজে দেখা হয়েছে, তা হলো শাৱীৱিক পৱীক্ষা। বিমানে

ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে বলা, বসে থাকতে বলা, সীট বেল্ট বাঁধতে বলা-এসবের ব্যাখ্যা তো বোঝাই যাচ্ছে। অঙ্গুত আওয়াজটাও বিমানের সাধারণ বাজন। তবে কান ফেটে যাবে বলে যে অনুভূতিটা হচ্ছিল, সেটা এখনও আছে। তবে যেহেতু বিমান অবতরণ করতে শুরু করেছে, তাই তা নিয়ে বেশি ভাবলেন না তিনি। এখন চুপচাপ বসে থাকার সময়।

তার চারপাশের যাত্রীরা যার যার হ্যান্ড ব্যাগ খুঁজে বের করা নিয়ে ব্যস্ত। যতদ্রুত সম্ভব বের হবার জন্য সবাই হড়েছুড়ি করছে। মানুষের উভাবটাই এমন, সব সময় যেকোনও লাইনের একদম সামনে থাকতে চায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ব্রীফকেসটা নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন তিনিও। যাত্রিক মুখ করে বিমানবালা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তোতাপাখির মতো একই বুলি আওড়াচ্ছে একটু পরপর। এই বিমানে সফর করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে যাত্রীদের আর বলছেঃ

লস অ্যাঞ্জেলস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এ স্বাগতম

লবিতে এসে ডা. ক্লেইবর্ন দেখতে পেলেন, যাত্রীদের স্বাগত জানাতে এসেছে বন্ধু বান্ধব আর আত্মীয়-বজনরা। ক্লেইবর্ন নিজেও ভিড়ের মাঝে যেন কাকে খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু কাকে?

নরম্যান নিশ্চয় ভরা বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাতে আসবে না। অবশ্য নিক স্টাইনারের কথা সত্য হবার একটা সম্ভাবনাও রয়ে যায়। হয়তো তার এখানে আসাটা একেবারেই প্রদ শ্রম হতে চলছে।

সামনের দিকে এগোতে শুরু করলেন ক্লেইবর্ন। উপরের লবি থেকে বেরিয়ে নিচতলায় চলে এলেন। এবার উদ্দেশ্য একদম বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। পুরো ব্যাপারটা অঙ্গুত এক ধারনার জন্য দিল তার মনে। সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হবার ব্যাপারটা যেন পুনরায় জন্ম নেবার মতো। একবার ওতে ঢোকা মাত্র, বের হবার জন্য সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাইরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে একদম ভিন্ন এক দুনিয়া।

তবে সত্যি সত্যি জন্ম গ্রহণ করার সম্ভবত এরচেয়ে সহজ ছিল। গাড়ি ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করা, লস অ্যাঞ্জেলসের ম্যাপ কেনা, নিজের ব্যাগটা খুঁজে বের করে কনভেয়ার থেকে তুলে নেয়া-প্রতিটা কাজই অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, দৈর্ঘ্যের পরীক্ষা নেয়। সেই সাথে বাড়িয়ে তোলে বিরক্তি।

ভ্রমণ যে কবে আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতা থেকে কষ্টকর একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা দীর্ঘ জানেন!

সমস্যা ক্লেইবর্নের নিজেরও হতে পারে। হয়তো বা তার দৈর্ঘ্যসূচিই কম...হয়তো একটু বেশি ক্লান্তি ভর করেছে তার ওপরে।

বিমান বন্দরের বাইরে বেরিয়েও মেজাজ খুব একটা ভালো হলো না তার। পিপড়ার মতো ধীর গতিতে এগোছে গাড়িগুলো। এছাড়া আছে বিভ্রান্তিকর সিগন্যালগুলোর অর্থ বের করা, মাথার উপরে অগোছালোভাবে লাগিয়ে রাখা সাইনগুলোও খুব একটা সাহায্য করছে না। অনেকক্ষণ পর সেঞ্চুরি বুলেভার্ডে এসে পৌঁছালেন ক্লেইবর্ন। তারপর এগোলেন পূর্বদিকে, ওদিকেই স্যান ডিয়াগো ফ্রি-ওয়ে।

রাস্তায় উঠে একটু স্থিতির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, গাড়ি চালাতে চালাতে স্নায়ু শান্ত হয়ে আসতে শুরু করছে। আসলে নিকের দোষ ধরে লাভ নেই। লোকটা ওকে একদম বাঁধা দেননি, উল্টো আরও সমর্থন দিয়েছেন। যখন বুরাতে পেরেছেন যে ক্লেইবর্নকে থামানো যাবে না, তখন যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। হয়তো পুরোপুরি সন্তুষ্ট মনে করেননি, তবে ঠিক ঠিক বিমানে সীট বুকিং দেয়া, ওটিসকে দিয়ে তাকে বিমান বন্দরে নামিয়ে দেয়া-সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। এ-ও কথা দিয়েছেন যে এদিকে কোনও নতুন খবর এলেই জানাবেন।

স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল তার। ওটা আসলে অবচেতন মনের নিজেকে শান্তি দেবার এক প্রয়াস ছিল। নরম্যান পালিয়েছে, কিন্তু সেজন্য কেউ তাকে শান্তি দেয়নি। তাই নিজেকে নিজেই শান্তি দিচ্ছিলেন। বেটসের পালিয়ে যাবার ঘটনায়, নিজেকে সম্পূর্ণ দায়ী বলে মনে করেন ক্লেইবর্ন।

আর তাই, ওকে পুনরায় পাকড়াও করাটাকেও নিজের দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছেন।

হ্যাঁ, নিজের এই ধারনার পেছনে যথেষ্ট শক্ত কারণ নেই তার। কিন্তু স্টাইনার বা অ্যাংস্ট্রিমও যার যার ধারনার পেছনে কোনও শক্ত কারণ দেখাতে পারেননি। অন্তত এখন পর্যন্ত না। আর অমন কোনও প্রমাণ আসার আগ পর্যন্ত নিজের পেশাদারিত্ব, প্রশিক্ষণ আর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এগোবেন তিনি।

অবশ্য নরম্যানের সাথে তার সম্পর্ক পুরোপুরি পেশাদারী না, হওয়াটা সম্ভবও না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যখন কোনও শক্ত কারণ দেখাতে পারেননি। এক রোগীর সাথে দেখা করেন, কথা বলেন... তখন সম্পর্কটা আর পেশাদারী থাকতে পারে না। লোকটার সবকিছু জানা তার, ওর সমস্ত গোপন কথা, সমস্ত দুশ্চিন্তা। নরম্যানের সাথে তাই তার সম্পর্কটাকে মাত্র একটা শব্দেই ঠিকঠাকভাবে প্রকাশ করা যায়-বন্ধুত্ব।

সেই বন্ধুর এখন তার সাহায্য প্রয়োজন। পেশাদারিত্ব চুলোয় যাক।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে করনেট স্টুডিওস এর কাছাকাছি চলে এসেছেন, তা নিজেও বলতে পারবেন না। ম্যাপ অনুযায়ী আর এক মাইল পরেই জায়গাটা। তবে এখনই ওখানে যাবার দরকার নেই তার। এই মুহূর্তে থাকার

একটা জায়গা খুঁজে বের করা আরও বেশি জরুরী। গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন তিনি। বুলেভার্ড রোডের পাশে অগণিত মোটেল দাঁড়িয়ে আছে।

তবে কোনওটাই তাকে খুব একটা প্রলুক্ষ করতে পারল না। এই মুহূর্তে গরম পানির পুল বা কালার টেলিভিশন খুব একটা দরকার নেই তার। দরকার হলো শান্তি, নিশ্চুপ একটা জায়গা। যেখানে গড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ তাকে খুব একটা বিরক্ত করতে পারবে না।

ডন মোটেল

একদম হঠাতে করেই যেন মোটেলটা তার চোখে ধরা দিল। ক্ষয়ে এসেছে সাইনবোর্ড, ক্ষয়েছে তার পেছনের ইংরেজি এল-আকৃতির দালানটাও। তবে প্যাটিও আর পার্কিং এরিয়া ঠিক আছে। পুল নজরে পড়ল না, অফিসে ঢোকার মতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মাত্র গাড়ি। শান্তি আর নিষ্ঠনতা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

গাড়ি মোটেলের প্রবেশপথে ঢুকিয়ে, বাইরে নামলেন ক্লেইবর্ন। পা দুটো দপদপ করছে, ঝান্তি ভালোমতোই পেয়ে বসেছে তাকে। বিকালের আলোতে পথ থেকে অফিসের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। ভেতরে প্রবেশ করে একনজরে সবকিছু দেখে নিলেন।

লবিটা একদম ছোট। এক কোনায় একটা ছোট, পুরাতন আর বহু ব্যবহারে জীর্ণ কফি টেবিলে বসে আছে একটা ধাতব অ্যাশট্রে। ওটার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো ম্যাগাজিন। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তিনটা ভেঙ্গি মেশিন। একটা কার্বনেটের সাইট্রিক এসিড, একটা চকলেট ক্যান্ডি আর অন্যটা দাম বেশি রাখা সিগারেট দেখিয়ে প্রলুক্ষ করার চেষ্টা করছে।

রিসেপশন ডেস্কটা বাদ দিয়ে, কেউ নেই। ওটার পেছনে একগাদা ফ্রেমে বাঁধানো, ধূসর হয়ে আসা ফটোগ্রাফ সাজিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে একটা দেয়াল ঘড়িও। টিক টিক করে ক্লেইবর্নের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পাচ্ছে সেটা।

ঘড়ির ঘন্টার কাঁটাটা ছয়ের ঘরে, যদিও তার হাতঘড়ি জানাচ্ছে এখন আটটা বাজে। হ্যানীয় সময় অনুসারে ঘড়িটাকে ঠিক করে নিলেন তিনি। হাতঘড়ি নাহয় ঠিক হলো, কিন্তু দেহঘড়ি কী আর এতো সহজে ঠিক হয়? রাতে ভালোমতো ঘুমিয়ে না নিলে ওটা ঠিক হবে না।

মোটেল মালিকের খোঁজে চারপাশে তাকালেন তিনি। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। ডেস্কের কাছে গিয়ে ওদিকে উঁকি দিতেই দেখতে পেলেন একটা বেল। তজনী দিয়ে টোকা দিলেন ওতে। এখন অপেক্ষার পালা।

কিছুক্ষণের মাঝেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে খুলে গেল প্যাটিও'র দরজা, ডেক্সের পেছনে এসে দাঁড়াল কর্মচারী। বেশ লম্বা লোকটা, পাতল আর তুলোর মতো চুল। মুখের চামড়ায় রোদের ছাপ পড়েছে, রোদে খরখর করতে থাকা শুকনো নদীর তলদেশের মতো ফাটা চামড়া। তবে হাসিতে বয়সের ছাপ পড়েনি, পড়েনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ক্লেইবর্নের দিকে তাকিয়ে থাকা চাহনীতেও।

পেশাদারী দৃষ্টিতে এতোক্ষণ কর্মচারীকে দেখছিলেন ক্লেইবর্ন। এখন ঘর ভাড়া নেয়ার ব্যাপারে নজর ফেরালেন। জানালেন, প্রতি রাতের জন্য চল্লিশ ডলার ভাড়া গুরুতে তার কোনও আপত্তি নেই। এ-ও জানালেন, রবিবার পর্যন্ত থাকতে চান তিনি। স্টোভ আর ফ্রিজ আছে ঘরে? ভালো তো, তবে তার দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। পুরোটা সময় বাইরে বাইরেই কাটবে তার। ছয় নাম্বার রুম পেছনের দিকে হলেও তার কোনও সমস্যা নেই। বরং পেছনের রুমই ভালো।

রেজিস্টারে সই করার সময়, নকল নাম ব্যবহার করতে মন চাইল তার। কিন্তু সামলে নিলেন নিজেকে। ওর এই সফরে ঢাকচাক গুড়গুড় করার কোনও ব্যাপার নেই। তার ওপর, এই মোটেলে থাকা অবস্থায় ওর কাছে বেশ কয়টি ফোন আসার কথা।

নিজের নামে ঘর ভাড়া নিলেও, শেষে তার ডাঙ্গারী পেশার পরিচয়-এম.ডি. অক্ষর দুটো লিখলেন না। ফ্রেমে বাঁধাই করা ফটোগ্রাফগুলোর দিকে নজর পড়ল তার। বুঝতে পারলেন, এরা সবাই অতীত কালের ফিল্ম-স্টার। একজনকে চিনতেও পারলেন তিনি। ‘কার্ল ড্রুস না?’

নড করল ব্যক্ষ লোকটা।

‘অসাধারণ অভিনেতা,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘এক চেনি সিনিয়র বাদে, তার মতো হরর অভিনেতা আর হয় না।’

‘ঠিক।’ কর্মচারীর সবুজাভ চোখ দুটো যেন হেসে উঠল। ‘তবে তিনি তো মুকাভিনেতা! আপনি চিনলেন কীভাবে? ফিল্ম ইভাস্ট্রি কাজ করেন?’

মাথা নাড়লেন ক্লেইবর্ন। ‘আরে না। আপনি?’

‘অনেক আগে করতাম।’ ফ্রেমগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন বৃন্দ। ‘এরা যখন এই শহর চালাত, তখন থেকেই আমি তাদের চিনি। এখন দেখুন, তারা দেয়ালে খোলানো কয়েক টুকরা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছেন। আর আমি? আমি এখনও এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সময় কী অঙ্গুত ভাবে কাজ করে, তাই না?’

‘আপনি কি অভিনেতা ছিলেন?’

হাসি ফুটে উঠল বলি঱েখায় ছেয়ে যাওয়া চেহারাটায়। ‘অভিনেতা হলে, আমার ছবিও ওখানে ঝুলতে দেখতেন। আকারে অন্যদের চাইতে বড়ই হতো! নাহ, আমি কখনও অভিনয় করিনি। তবে লিখেছি অনেক। চিত্রনাট্যকার বলতে পারেন। করনেট স্টুডিওস-এ কাজ করতাম।’

‘করনেট?’ কৌতুহলি চোখে বৃক্ষের দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। ‘তাজের ব্যাপার, মি.-?’

‘পোস্ট। টম পোস্ট।’

‘আপনি নিশ্চয় এই ব্যবসা সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, মি. পোস্ট।’

‘এককালে হয়তো জানতাম, এখন জানি না। সাইলেন্ট মুভির দিন শেষ হবার সাথে সাথে, আমার দিনও ফুরিয়ে এসেছিল।’

‘অবসর নেয়ায় আপনাকে অসুবী বলে তো মনে হচ্ছে না।’

‘অসুবী হবার কী আছে!’ হাসি মিলিয়ে গেল পোস্টের মুখ থেকে। ‘এই মোটেলটা বানাবার আগে আমি এন্টিনোতে একটা পুরাতন গাড়ির দোকান চালাতাম। মানছি, ডন মোটেল তেমন বড় কিছু না। তবে ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজ ছাড়া তাকতে পারি না আমি।’ হাড়ের মতো সরু আঙুল তুলে বললেন তিনি, ‘আজকালকার অবসর মানে কী জানেন? অবসর মানে হলো বুড়ো খুড়খুড়ে এক মানুষ... অবসর মানে রোগে জর্জরিত এক ফুসফস নিয়ে নোংরা পানিতে বিষাক্ত মাছ ধরা।’

‘লেখালেখি এখনও ছাড়েননি দেখছি।’ হাসলেন ক্লেইবর্ন।

‘আরে না। আমি এমন এক বৃদ্ধ, যে এখনও মুখটাকে সামলে রাখতে শেখেনি।’ ডেক্সের ড্রয়ার থেকে একগাদা চাবী বের করে একটা ডাঙ্গারের দিকে এগিয়ে দিলেন পোস্ট। ‘এই নিম। বার্স-প্যাটরা কোথায়? দিয়ে আসি।’

‘লাগবে না, আমি পারব। কয়েকটা ফোন করতে চাচ্ছিলাম।’

‘আপনার ঘরে আলাদা ফোন আছে।’

‘খুব ভালো।’

‘যা কিছু লাগবে, জানাবেন।’

‘ধন্যবাদ।’

ব্যাগ-ব্রিফকেস নামাবার উদ্দেশ্যে গাড়ির কাছে চলে গেলেন ক্লেইবর্ন। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, বার্স-প্যাটরা নিয়ে রুম নাম্বার ছয়-এ দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ঘরটাকে একটা বড় বড় মাইক্রওয়েভ ওভেনের সাথে তুলনা দেয়া যায়, প্রচন্ড গরমে প্রাণ যেন দেহকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। তাই থার্মোস্ট্যাট খুঁজে পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। একদম সর্বোচ্চ শক্তিতে সেটাকে চালিয়ে দিলেন। বয়সের ভাবে ন্যুজ্ব যন্ত্রটা শব্দ করে চালু হয়ে গেল। পরনের জ্যাকেটটা খুলে ফেলে, ডাবল বেডে দেহটাকে আছড়ে ফেললেন। হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। সাড়ে-ছয়টার বেশি বাজে। করনেটে কেউ থাকবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তবুও ফোন করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

প্রথমে অপারেটরকে ফোন করে, তার কাছ থেকে স্টুডিওর নাম্বার নিয়ে নিলেন। স্টুডিওর নাম্বারে এক মেয়ে ফোন ধরল। ড্রিসকলের কথা বলতেই দিয়ে

দিল সংযোগ। অবাক হয়ে ক্লেইবর্ন খেয়াল করলেন, একবার রিং হবার সাথে সাথে ওপাশ থেকে কেউ রিসিভার তুলে নিল।

‘কে?’ মার্টি ড্রিসকলের ভরাট কষ্ট চিনতে পারলেন সহজেই।

‘অ্যাডাম ক্লেইবর্ন বলছি, মি. ড্রিসকল।’

‘কে?’ কষ্ট বিরক্তির সুর স্পষ্ট।

‘ডা. ক্লেইবর্ন। আপনার সাথে গত রবিবার কথা হয়েছিল। আপনি হাসপাতালে ফোন করেছিলেন।’

‘ওহ, ডাঙ্জার সাহেব।’ কষ্ট থেকে বিরক্তিকু উবে গেল। ‘মনে পড়েছে। আপনি ফোন করায় খুশী হয়েছি। কী ঘটছে, না ঘটছে, সেসব ব্যাপার এখন তাহলে আপনার মুখ থেকেই শোনা যাবে।’

‘কোনও অসুবিধা নেই। তবে ওসব কথা সাক্ষাতে হওয়াই ভাল।’

‘সাক্ষাতে! আপনি এখানে এসেছেন নাকি?’

‘কেবল এলাম। আগামীকাল যদি সময় দিতে পারেন—’

‘আমি সারা দিন-ই আছি। আপনি যখন চান, আসতে পারেন।’

‘নয়টায়?’

‘সাড়ে নয়টায় হলে ভালো হয়। আপনার জন্য গেটে পাসের ব্যবস্থা করে রাখব।’

‘ঠিক আছে তাহলে, নাড়ে নয়টায়।’

‘দাঁড়ান।’ ক্লেইবর্ন ফোন রেখে দিচ্ছেন, বুরতে পেরে বলে উঠল ড্রিসকল। ‘আপনার ওই বস, কী যেন নাম...ডা. স্টাইনার, গতকাল খুব খারাপ ব্যবহার করল। নরম্যানের ব্যাপারে ঝামেলায় আছে নাকি?’

‘ওই ব্যাপারেই আপনার সাথে কথা বলতে চাই।’ রিসিভার রেখে দিতে দিতে যোগ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘আগামীকাল দেখা হবে।’

ড্রিসকলকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ দিলেন না তিনি। এক হিসেবে কাজটা খেলো হয়ে গেল, কিন্তু ক্লেইবর্নের আশা, ঘটনাটা ড্রিসকলের অবচেতন মনে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। এমনিতেই লোকটা চিন্তিত হয়ে আছে। অন্য কারও মাঝে এতোটুকুও দেখতে পাননি তিনি।

সূর্যের আলো আল্টে আল্টে কমে আসতে শুরু করেছে। এখানে এখন সাতটা বাজে...যার অর্থ, হাসপাতালে সময় নয়টা। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করছে তার। কিন্তু যেহেতু স্টাইনারকে এখানে আসা মাত্র ফোন করবেন বলে জানিয়েছিলেন, তাই রিসিভার তুলে নিলেন।

প্রথমে ফোন করলেন লোকটার ব্যক্তিগত নাম্বারে। দশবার রিং হবার পরেও যখন কেউ ধরল না, তখন রেখে দিয়ে হাসপাতালের নাম্বার ডায়াল করলেন।

ক্লারা ধরল ফোন। জানাল, স্টাইনার বাইরে গিয়েছেন। ফেয়ারভিল রোটারী ক্লাব
না কাদের সাথে যেন আজ রাতে খাবার খাচ্ছেন তিনি।

সবকিছু ঠিক আছে, এমনভাব দেখাবার চেষ্টা করছে লোকটা। রাগটাকে
অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করে, মেয়েটাকে মোটেলের ঠিকানা নাসার দিলেন ক্লেইবর্ন।
এ-ও জানালেন যে, আগামীকাল ডা. স্টাইনারকে ফোন করবেন। ওখানকার খবর
আর জিজাসা করলেন না। কেননা এক, কিছু ঘটলেও ক্লারা তা জানার কথা
না। আর দুই, স্টাইনার যেহেতু রোটারী ক্লাবের পাছায় চুমো খেতে ব্যস্ত, তাই
ধরে নেয়া যায় যে নতুন কিছুই ঘটেনি।

ফোন রেখে দিয়ে একবার ভাবলেন, বাইরে খেতে যাবেন কিনা। কিন্তু ক্লান্তি
এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে ইচ্ছা করছে না। জামা-কাপড় ছেড়ে, সুন্দর করে
ক্লজিটে ঝুলিয়ে রাখলেন। এরপর স্যুটকেস থেকে সব কিছু বের করে সাজিয়ে
রাখলেন। রেজর, ব্রাশ ইত্যাদি রাখরংমে রাখার সময় একবার মনে হলো, গোসল
সেরে নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু ওই যে...ক্লান্তি। সকালে দেখা যাবে, ভেবে
পায়জামাটা পরে নিলেন।

বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন, এমন সময় ব্রিফকেসের উপরে উন্মাদিনী'র
চিত্রনাট্যটা পড়ে থাকতে দেখলেন। বিমানে আসার সময় পড়ার ইচ্ছা ছিল গুটা,
কিন্তু ছোঁয়াও হয়নি। এখন পড়া যেতে পারে, কিন্তু লাভ কী? এই চিত্রনাট্যের
ব্যাপারে কথা বলার জন্য তো কালকে তিনি ড্রিসকলের অফিসে যাচ্ছেন না।
যাচ্ছেন এই লোকটাকে এই চিত্রনাট্য অনুসারে চলচ্চিত্র না বানাবার জন্য
বোকাতে।

থার্মোস্ট্যাটটা বন্ধ করে, বিছানার উঠে বসলেন ক্লেইবর্ন। নাইট স্ট্যাডে রাখা
বাতিটা জ্বালিয়ে পরেরদিনের মিটিং-এ কীভাবে ড্রিসকলকে কাবু করবেন, তা
নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। কীভাবে এগোলে ভালো হয়? তার সবচেয়ে
শক্তিশালী যে বৈশিষ্ট্য, সেটাকেই কাজে লাগাবেন? যেভাবে কোনও রোগীর সাথে
একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন, সেভাবে? ডা. ক্লেইবর্ন হবেন কর্তৃপক্ষের মতো
একজন। সব ল্যাটিন আর হ্রিক শব্দ বাদ দিলে, যেকোনও থেরাপি আসলে এমন
একটা পরিস্থিতির-ই সৃষ্টি করে। রোগীকে কথা বলতে দিতে হয়। এক্ষেত্রেও
নাহয় তা-ই হোক। ড্রিসকল এই চলচ্চিত্রের সম্ভাবনার কথা বলে মুখে ফেনা
তুলে ফেলুক। ডাক্তার ক্লেইবর্ন যেভাবে অন্য সব রোগীর কথা শোনেন, সেভাবেই
শুনবেন। ধরে নেবেন, দালানের কার্নিশে দাঁড়িয়ে লাফ দেবার ভূমকি দিচ্ছে,
এমন কোনও মানুষের কথা শুনছেন। লোকটার কথা শেষ হলে শুরু করবেন
নিজের খেলা। বলবেন, নিঃসন্দেহে এই চলচ্চিত্র ভালো হবে, মানুষ জনের দৃষ্টি
আকর্ষণ করবে, যেমনটা আকর্ষণ করবে কার্নিশ থেকে লাফ দেয়া। উন্মাদিনী
টাকাও কামাবে প্রচুর। কিন্তু সেটা তো বীমা করানো থাকলে, লাফ দেখা

লোকটাও পাবে। সমস্যা হলো, সেটা খরচ করার সৌভাগ্য তার হবে না। তাই লাফ দেবার আগে, ভালো মনে নিচের দৃশ্যটা দেখা নেয়া দরকার। কেননা নিচে ড্রিসকলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নরম্যান বেটস।

আমি নিশ্চিত, বলব ওকে-ভাবলেন ক্লেইবর্ন। এমন নিশ্চিত যে নিজের জীবন বাজি ধরতেও রাজি আছি। আর তাই, আপনার...মার্টি ড্রিসকলের জীবন নিয়ে বাজি ধরতে চাই না।

আচমকা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, নরম্যানকে এখনও বন্ধ হিসেবেই ভাবেন তিনি। কিন্তু নরম্যান? সে কি তাকে বন্ধ ভাবে? এই মুহূর্তে হয়তো ক্লেইবর্ন তার কাছে শক্ত। এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে, তিনি তো তা-ই!

ঘপ্পে নিজেকে নিজে শান্তি দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে ছুটে এসেছেন লোকটাকে পাকড়াও করে শান্তি দেবার মানসে। নরম্যান তার সব পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দিয়েছে। ওই যে বইটা, নরম্যানকে নিয়ে যেটা লেখার ইচ্ছা ছিল তার, সেটা ভেষ্টে গিয়েছে। পাঁচ বছরের সফল থেরাপির এক প্রমাণ হিসেবে ওটা লিখতে চেয়েছিলেন ক্লেইবর্ন। এরচেয়ে অনেক কম সময়ের কথা লিখেও অনেকে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

জনপ্রিয়তা চুলায় যাক! এখন ওসব নিয়ে ভাববার সময় না। সামনে অবশ্যভাবীভাবে যে ঘটনাগুলো ঘটবে, সেটা কীভাবে থামানো যায় তা নিয়ে ভাবার সময়। জ্ঞ কুঁচকে উপরের অঙ্ককারের দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। নিজের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করে দেবার সময় হয়েছে। নরম্যান তার বন্ধু না শক্র, সে ব্যাপারেও। উন্মাদ লোকটার শিকারদের আত্মীয়-সংজনদের কথা ভাবা দরকার। তাদের সাহায্য করা দরকার। আর সেই সাহায্য করাটা ক্লেইবর্নের দায়িত্ব। নাহ, তিনি মনোবিদ, কেবল সেই কারণে না। তার মাঝে মানবিক গুণাবলি এখনও অবশিষ্ট আছে, সেই কারণে। অতীতকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকলে, করতেন তিনি। তা যখন নেই, তখন ভবিষ্যতে যেন আরও দুঃখ...আরও কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয় তাদের, সেটা নিশ্চিত করতে নিজের সর্বোচ্চটা ঢেলে দেবেন।

এজন্যই এই অভিশঙ্গ চলচ্চিত্রটা বন্ধ করে দিতে হবে। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও, নরম্যানকে ঝঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে হবে।



যোলো

শঁয়োপোকাটা...মানে ভিজিনির সেই গা গোলানো গোঁফটা নেই!

জ্যানকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, ‘কোনও সমস্যা?’

‘তোমার গোঁফ। কামিয়ে ফেলেছ!’

চেয়ার থেকে উঠে, একরাশ গন্ধ ছড়িয়ে ওর কাছে চলে এলো লোকটা।
‘তোমার পছন্দ হয়েছে?’

‘পছন্দ বা অপছন্দের ব্যাপার না। গোঁফ ছাড়া তোমাকে দেখতে অঙ্গুত মনে হচ্ছে। এই আর কী।’

কথাটা একদম সত্যি। গোঁফ ছাড়া নতুন এক মানুষ বলে মনে হচ্ছে পরিচালককে। তবে অন্য সব কিছু সেই আগের মতোই আছে। মনে হচ্ছে, সুগন্ধীর বোতলে ডুব দিয়ে এসেছে লোকটা। চলার ভঙ্গিমা, কথার ভঙ্গিমা-এসবেও কোনও পরিবর্তন আসেনি। নিজ হাতকে লোকটার স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য ইচ্ছা করেই ধরে থাকা স্ক্রিপ্টটা ফেলে দিল জ্যান।

‘ইস, পড়ে গেল।’ বলতে বলতে এক পা পিছিয়ে ওটাকে তুলে নেবার জন্য ঝুঁকে গেল সে।

‘শান্ত হও।’ বলল ভিজিনি। ‘আমি কামড়াই না।’ হলদেটা দাঁতগুলো বের করে হাসল।

স্ক্রিপ্টের বেকে যাওয়া উপরের অংশ সোজা করার চেষ্টা করতে করতে জ্যান বলল, ‘একসাথে পড়ার ব্যাপারে একটা কথা-’

‘এক সাথে পড়া?’ হাসি মিলিয়ে গেল ভিজিনির। গোঁফ নেই বলে, ঠোঁটগুলো মোটা বলে মনে হচ্ছে।

‘মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় আসতে বলেছিলে,’ বলল মেয়েটা। ‘আমি এসে পড়েছি।’

হাতের তালু দিয়ে কপাল চাপড়ালো ভিজিনি। অথচ এমন নাটুকেপনা ওর কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী করলে আর দেখতে হতো না। ‘ওহ হো! ধূমসী মাগি লিভাকে নিয়ে আর পারি না। আজ সকালেই বলেছিলাম-’

‘সমস্যা হয়েছে কোনও?’

‘পল মরগ্যান। ও রিহার্সেলের জন্য আসতে চায়। পার্লারের দৃশ্যটা দেখাতে বলেছে।’

‘ওই দৃশ্যে তো আমিও আছি। একসাথে করলে ক্ষতি কী?’

‘আমিও তো তাই বলেছিলাম। উত্তরে পল বলল, সে নাকি একা একা কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।’

‘বুঝতে পেরেছি।’ বলল জ্যান। ‘স্টারদের মনের মতো চলা।’

‘স্টার? নাহ। কিন্তু তার মনের মতো চলতে হয় বৈকি। একটা গোপন কথা শুনবে? ছেলে হয়ে মেয়ের পোশাক পরে অভিনয় করার ব্যাপারটা তাকে খুব একটা আকর্ষণ করতে পারছে না। আসলে ব্যাপারটা ওর ইমেজের সাথেই যায় না। তাই ওকে যতটা সম্ভব, সাহায্য করতে হবে।’

‘আর আমার কী হবে?’ বিরক্তি গোপন করার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করল জ্যান।
‘আমারও কিছু প্রশ্ন ছিল-

‘কথা দিলাম, উত্তর পাবে।’ হাত নাড়িয়ে যেন সুগন্ধী ছড়িয়ে দিল ভিজিনি। ‘এই সঙ্গাতেই আমি তোমার সাথে বসব। লিভা তোমাকে তারিখটা জানিয়ে দেবে।’ মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে ওকে অফিসের দরজা দেখিয়ে দিল পরিচালক। ‘বিশ্বাস করো, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো মাত্রই তোমার সব দুশ্চিন্তা হাওয়া হয়ে যাবে। আমি নিজের অন্তরাআকে বিশ্বাস করি। তোমাকে যখন মেরির চরিত্রে নেই, তখন-ই বুঝে গিয়েছিলাম যে তুমি আমাকে হতাশ করবে না।’

বিশ্বিষ্ট, সেই সাথে ক্ষুক মনে ফিরে চলল জ্যান। পড়ত বিকালের আদ্র বাতাসে চলতে চলতে মেয়েটা সিন্দ্রান্ত নিল, আরেকবার ক্রিপ্টটা পড়ে দেখবে। কনি অ্যাপার্টমেন্টে নেই, তাই মনোযোগ দিয়ে পড়তেও কোনও বাঁধা নেই।

পোশাক পরিবর্তন করে, উন্মাদিনী’র ক্রিপ্ট নিয়ে লিভিং রুমের সোফায় বসল ও। আগেই ওর লাইনগুলো সবুজ কালি দিয়ে রঙ করে রেখেছে। সিন্দ্রান্ত নিয়েছিল, শুধু সেগুলোই পড়বে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, পুরো ক্রিপ্টটাই পড়তে শুরু করে দিয়েছে! আগেও পড়েছে। বরাবরের মতো এবারও, চিত্রনাট্যের ওজন আর কাহিনী ওকে বিভ্রান্ত করে তুলল। কে খুন করেছে-এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা চলচ্ছিটার মুখ্য বিষয় না। থেকে থেকে চমকে ওঠার জন্য, বাতাস থেকে নানা দৃশ্যের অবতারণাও করা হয়নি। এক কথায় বলতে গেলে, ডকুমেন্টারির আদলে লেখা পুরোটা, দেহে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। হিংস্রতায় পূর্ণ!

তবে জিনিসটা ওকে সবচেয়ে বেশি খোঁচাচ্ছে সেটা হলো, এই চিত্রনাট্য রয় অ্যামেসের হাত থেকে বেরিয়েছে! কয়েকদিন আগে রয়ের আচমকা খেপে ওঠাটাও ওকে খোঁচাচ্ছে। ওই ঘটনার আগ পর্যন্ত, রয়ের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করত ও। লোকটার হাতে ধরা দিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এখন-

ফোন বেজে ওঠায়, চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল মেয়েটার। ‘হ্যালো।’

‘কথা বার্তা শুরু করার জন্য, দারুণ তো বাক্যটা।’ বলল রয় অ্যামেস।

শয়তানের নাম নিলাম, আর শয়তান হাজির! ভাবল জ্যান। কিন্তু ফোন রেখে না দিয়ে, ধরে রইল। ক্ষমা চাইল রয়। জ্যান জানাল, ও ক্ষমা করে দিয়েছে। সেই সাথে স্পোর্টসম্যান্স লজে রাতে খাবার দাওয়াতও গ্রহণ করে নিল। ‘আমাকে নিতে আসার দরকার নেই। সরাসরি ওখানেই আমি দেখা করব। ঠিক আটটায়। কথা হবে সাক্ষাতে।’

ফোন রেখে দিল জ্যান। দাওয়াত গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু কাজটা ঠিক হলো কিনা তা নিয়ে নিঃসন্দেহ নয়।

নাহ, এখন লোকটাকে ক্ষেপিয়ে তোলার কোনও অর্থ হয় না। হাতে রাখাই ভালো। কিছুক্ষণ ভেবে সিদ্ধান্ত নিল ও। বুক কেসে রেখে দিল স্ক্রিপ্টটা। এখন আর দেখার সময় নেই, আজ অন্য এক চরিত্রে অভিনয় করতে হবে ওকে... মোহনীয় নারীর চরিত্রে।

রাতে কোন পোশাকটা পরবে, সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করল জ্যান। রয় অবশ্য বেশ কয়েকটা ইঙ্গিত দিয়েছে। ক্ষমা প্রার্থনা করে বুঝিয়েছে, ওর আচরণটা খারাপ ছিল। আর দাওয়াত দিয়ে বুঝিয়েছে, সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এখন জ্যানের উচিত হবে, দলিল পক্ষের চরিত্রে অভিনয় করে, ছেলেটাকে পুরোপুরি হাতে নিয়ে আসা।

স্পোর্টসম্যান্স লজে যখন প্রবেশ করল জ্যান, তখন ওর ভেতর একটু আগের বিভাগির ছায়া মাত্র নেই! আটটা বাজার কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছেছে মেয়েটা। কিন্তু রয়কে হারাতে পারেনি। এসে দেখে, ছেলেটা ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ডিনার অর্ডার করার আগে মাত্র দুইটা মার্টিনি নিল সে। ভালো সংবাদ। এটা সেটা নিয়ে কথা বলতে শুরু করল দুজনে। কিন্তু উন্মাদিনী নিয়ে কোনও কথা হলো না। জ্যানের মনে হলো, রয় ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু জ্যান তো সেটা হতে দিতে পারে না। আজকের এই নাটকে সে অভিনয় করছেই রয়কে নিজের দলে নিয়ে আসার জন্য। কিছুটা অন্যমনস্কভাবে ছেলেটার কথা শুনল ও, চলচ্চিত্রটার প্রসঙ্গ তোলার সুযোগ খুঁজল। স্টেক আসার ঠিক আগ মুহূর্তে পেয়েও গেল তা। ‘ঁৰীকার করতে খারাপ লাগছে,’ বলল ও। ‘কিন্তু অন্যজনকে না করে দিয়েছি বলে এখন ভালো লাগছে।’

হাত থেকে কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে, চোখ তুলে তাকাল রয়। মুখে হাসি নিয়ে ওর চোখে চোখ রাখল জ্যান। ‘ভিজিনি বলেছিল, রাতের খাবারটা ওর সাথে খেতে। উন্মাদিনী নিয়ে কী সব কথা আছে নাকি!'

‘বদ লোক কোথাকার।’ রয়ের কাছ থেকে এমন তীব্র আচরণ আশা করেনি জ্যান। ‘ওর সাথে বেশি না মেশাই ভালো। আমার আসলে এতে নাক গলানো ঠিক হচ্ছে না, তবে—’

‘ঠিক বলেছ। আমার ব্যাপারে তোমার নাক গলানো ঠিক না।’ হাসতে হাসতেই বলল মেয়েটা। ‘আমি জানি লোকটা জন্য। কিন্তু সে আমার পরিচালকও বটে। ওকে নিজের দলে টানতে পারাটা নিজের জন্যই ভালো হবে হয়তো।’

‘সাবধানে না থাকলে তোমার দলের পাশাপাশি, তোমার ভেতরে থাকারও চেষ্টা করবে ভিজিনি।’ বলল রঘ। ‘ওর ব্যাপারে তোমাকে আর কী বলব! পয়সা না থাকলে, এতো দিনে জেলে পচে মরতে হতো ওকে। যৌন বিকৃতির সবগুলো ধরণই মনে হয় ওর মাঝে আছে। হিংস্রতা ভিজিনির দেহের প্রতিটা কোষে কোষে বাস করে।’

‘তোমার চিত্রনাট্যটা পড়তে পড়তে,’ বিড়বিড় করে বলল জ্যান। ‘আমারও সেই একই শব্দ প্রথমে মনে এসেছিল। হিংস্র।’

‘লেখার সময় আমার মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না। যাক, বাদ দাও।’

‘নাহ! বলে ফেলো।’

‘আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখো,’ স্টেক ভর্তি প্রেটটা ঢেলে সরালো রঘ। ‘আগেও অনেক ভূতুড়ে কাজ করেছি আমি। চলচ্চিত্রে না হলেও, টেলিভিশনের জন্য তো করেছি! ড্রিসকল সেজন্যই আমাকে এ কাজের জন্য নিয়েছে। ভ্যাম্পায়ার আর মায়ানেকড়েদের নিয়ে লেখার সময় কোনও অসুবিধা হয়নি আমার। মনে হয়েছে, রূপকথার গল্প লিখছি। জানতাম, এই দানবদের আসলে অতিত্ব নেই। কিন্তু উন্মাদিনী’র ব্যাপারটা আলাদা। ওখানে যা লিখেছি, সেসব কিছু আসলেই ঘটেছে! নরম্যান বেটসের মতো দানবের অতিত্ব আছে এই দুনিয়ায়! আমার উপর প্রভাব ফেলেছেই।’

‘কীভাবে?’

‘তুমি তো অভিনেত্রী, ভালো করেই জানো যে কোনও চরিত্রকে সফলভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে সেই চরিত্রে প্রবেশ করতে হয়।’ কফিতে চুমুক দিল রঘ। ‘লেখকও সেই কাজটাই করেন। যে চরিত্রকে নিয়ে লেখেন, তার ভেতরে প্রবেশ করেন। স্ক্রিপ্ট লেখার সময়, কীভাবে কীভাবে যেন নরম্যানে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। যেভাবে ও ভাবে, সেভাবেই ভেবেছিলাম। যেভাবে ভাবে, অনুভব করে, আমি সেভাবেই ভাবছিলাম...অনুভব করছিলাম।

কাজটা সহজ ছিল না, কিন্তু কোনও না কোনওভাবে কাজগুলো ঠিকভাবেই করেছি। একটা কথা তোমাকে বলি, মন দিয়ে শোন। নরম্যানের মাথার মতো ওই জঘণ্য জায়গাটায় প্রবেশ করার পর মুহূর্ত থেকেই, আমার মাঝে কেবল একটা চিন্তাই কাজ করেছে। কত তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালানো যায়! নরম্যানকে কত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায়!

কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, নরম্যানকে আমি ছাড়তে চাইলেও, নরম্যান তো আমাকে ছাড়বে না! যখন চিত্রনাট্যটা লিখছিলাম, তখন লোকটা ছিল আমার

হাতের মুঠোয়। ঠিক যেমন আসল নরম্যান ছিল হাসতাপালের মুঠোয়। কিন্তু এখন—'

নিজের কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখল জ্যান। 'তোমার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি। নরম্যান আমাকেও ভয় পাইয়ে দেয়। তবে তাই বলে চলচ্চিত্রটা বাতিল করা কি ঠিক হবে? লাভ হবে তাতে কোনও? আর তাছাড়া, নরম্যান মারা গিয়েছে। আজকের কাগজগুলো পড়নি? সবগুলোতেই মোটামুটি একই কথা লেখা ছিল। ওরা প্রায় নিশ্চিত যে ভ্যানের বিস্ফোরণের সাথে নরম্যান মারা গিয়েছে।'

'প্রায় নিশ্চিত।' সামনের দিকে ঝুঁকে এলো রয়। 'যদি ওদের ভুল হয়ে থাকে তো?'

'গতকাল স্টুডিওতেও একই কথা বলেছ।' ন্যূ গলায় বলল জ্যান। 'কেন? তুমি কী এমন কিছু জানো যা আমি জানি না?'

'আমি কি জানি, তাতে কিছু যায় আসে না...' বলতে বলতেই থেমে গেল রয়। জ্যানের মনে হলো, হঠাৎ করে কেমন যেন পরিবর্তন চলে এসেছে ছেলেটার মাঝে। হাসিখুশী ভাবটা নেই, এমনকিছু একটা বলতে চাচ্ছে সে যা শব্দে পরিণত করতে পারছে না। 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, নরম্যান এখনও বেঁচে আছে। অপেক্ষা করছে!'

'অপেক্ষা করছে? কেন?'

'আমি জানি না।' মুখ কুঁচকে ফেলল রয়। 'আমি নিজেকেই বুঝতে পারছি না, নরম্যানের মনের কথা বুঝব কী করে!'

বিভাস্ত দেখালো ছেলেটাকে। কষ্ট পাচ্ছে ও, অনেক বেশি কষ্ট। যেটুকু বিত্তধা ছিল জ্যানের মনে, তা-ও হাওয়া হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, ওর সামনে যে বসে আছে, সে বিপক্ষ দলের কেউ না। এ এমন এক ছেলে, যে মানসিক টানাপোড়নে প্রতি মুহূর্তে ছির-ভিন্ন হচ্ছে।

হেসে উঠল জ্যান। ভাবল, এই মুহূর্তে হাসির মাধ্যমেই ছেলেটাকে সহজ করা যাবে। 'খারাপ খবর! তোমার তো দেখি পাগলের ডাঙ্গার দেখানো দরকার।'

নড় করল রয়। 'দেখাবো তো।'

'মানে?'

'তুমি জানো না?' প্রশ্নের চাইতে বিশ্ময়ের ছাপ বেশি রয়ের কষ্টে। 'এখানে আসার ঠিক আগে আগে ড্রিসকল ফোন করেছিল। আগামীকাল আমাদের সাথে নরম্যান বেটসের মনোবিদের মিটিং আছে।'



সতেরো

বুধবার সকালটা জ্যানের ভালোই কাটল। সকাল সকাল স্টুডিওতে পৌঁছে গিয়েছিল সে। অগণিত কর্মচারীর গাড়ির পিছু পিছু, পায়ে হাঁটা গতিতে এগোচ্ছিল ওর টয়োটা। যখন উইন্ডশিল্ডে লাগানো স্টিকারটা গার্ডের নজরে পড়ল, তখন হাত নেড়ে ওকে এগোবার অনুমতি দিল লোকটা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিনা, তা কেউ জানতে চাইল না। কপাল ভালো, কেননা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না ওর।

তাই জ্যানকে ড্রিসকলের বাইরের অফিসের সামনে দেখতে পেয়ে, অনিতার অবাক হওয়াটা একদম স্বাভাবিক। ওকে দেখেই পোকার চোখের মতো দেখতে চোখজোড়া নোটপ্যাডের দিকে চলে গেল। ‘আপনাকে তো এখানে দেখছি না।’ বলল মিস কেজি। ‘মি. ড্রিসকল কয়টার সময় আসতে বলেছিলেন?’

‘বলেনি,’ হাসল জ্যান। ‘এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম দেখা করে যাই।’

হতভম্ব অনিতার মুখ হাঁ হয়ে গেল। দেখা করে যাই? অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কেউ প্রযোজকের সাথে দেখা করতে পারে না। ভ্যাটিক্যানে গেলেই কী আর পোপের দেখা যাওয়া যায়?

‘আসলে তিনি এই মুহূর্তে বড় ব্যস্ত আছেন,’ কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারি বলল। ‘আমি অবশ্য তাকে জানাতে পারি যে আপনি এসেছেন।’

‘থাক,’ উত্তরে বলল জ্যান। ‘জরুরী কিছু না।’

ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েটা ভাবল, জরুরী না তো বলছি, কিন্তু আসলে এরচেয়ে জরুরী কিছু আমার জীবনে হয়নি। নয়টা পঁয়তালিশ বাজে। রয় মিটিঙ্টা ঠিক কখন হবে তা বলেনি। সন্দেহ উদ্বেক হবে ভেবে, ও-ও জিজ্ঞাসা করেনি। তবে দশটার দিকে হওয়ার কথা।

সুন্দর করে পরিকল্পনা করে এসেছে জ্যান। ঠিক করেছে, ড্রিসকলের অফিসে চুক্তি, পোশাক বা এমন কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে আপত্তি তুলবে। ডা. ক্লেইবন যখন মিটিং এর জন্য আসবে, তখন তাই ওখানে উপস্থিত থাকার একটা অজুহাত দিতে পারবে। মিটিঙ্টায় অংশ নিতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এক দর্শন দেখে নিতে তো পারবে লোকটাকে! কে জানে, কেন এসেছে সেই ব্যাপারে একটা ধারনাও পেতে পারে। ডাক্তার সাহেব ওর পক্ষে না বিপক্ষে, সেটা জানা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে এতো পরিকল্পনা কোনও কাজে আসবে না। কেননা এই মুহূর্তে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে জ্যান। হঠাৎ অনিতা পেছন থেকে ওকে ডেকে বসল, ‘মিস হার্পার-’

‘বলুন।’

‘আমার একটা উপকার করবেন? আমার একটু বাইরে যাওয়া দরকার। কিন্তু মি. ড্রিসকল ডেক্ষ ছেড়ে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। গেলে অন্তত যেন ফোন কল ধরার মতো কেউ থাকে, সেই ব্যবস্থা করে যেতে হয়।’

‘ঘান, ঘান। কোনও সমস্যা নেই। আমি কিছুক্ষণ আছি।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সেক্রেটারি।

মেয়েটাকে দরজা বন্ধ করে দিতে দেখে হাসল জ্যান। কপালটা বড়ই ভালো যাচ্ছে। এই সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। আশেপাশে কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে নিয়ে, দরজার কাছে চলে গেল ও। ইন্টারকমের সুইচটা চেপে ধরে শুনতে লাগল।

প্রথমেই শোনা গেল মার্টি ড্রিসকলের কষ্টে। ‘সহজ কথায় আপনাকে বোঝাই ডাঙ্কার সাহেব। আমি এরিমাঝে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। মৌখিক চুক্তি করা শেষ, অনেকগুলো চুক্তিপত্রে তো সহিতও করে ফেলেছি। একদিন দেরি হলো, শুধু তার সুন্দর কৃত টাকা হবে জানেন? আপনার একটা আন্দাজের কারণে-’

‘আন্দাজ না,’ বলল রয় অ্যামেস। ‘পেশাগত মত বললেই ভালো হয়।’

‘ডা. স্টাইনারও তো একজন মনোবিদ, নাকি? তিনি তো তোমাদের সাথে একমত না। পুলিশও না।’

‘ওদের কথা বাদ দাও। এই মানুষটা সরাসরি নরম্যান বেটসের খেরাপিস্ট ছিল। কেউ কিছু বুবতে পারলে, ইনিই পারবেন। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ডাঙ্কার সাহেব আমাদেরকে সাবধান করতে এসেছেন।’

‘আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন তর্ক করে লাভ নেই। দেখুন, ডাঙ্কার সাহেব, আপনার সময় নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত।’

‘হয়তো পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে বলাটা ঠিক হবে না।’ জর্জ ওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। ‘আমরা তো এমনিতেই রয়কে ফেয়ারভিলে পাঠাতে চেয়েছিলাম, তাই না?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু স্টাইনার না করে দিয়েছিল।’

‘স্টাইনার লোকটার সাথে কথা বলে লাভ কী? আমাদের দরকার ছিল আসলে ডা. ক্লেইবর্নকে। আর তিনি নিজে এসে হাজির হয়েছেন। কয়েক দিনের জন্য নাহয় আমরা ওকে পরামর্শক হিসেবে দেখে দেই।’

‘দারণ বুদ্ধি দিয়েছ! ড্রিসকল বলে উঠল। ‘চিকিৎসাট্যটাও নিখুঁত হবে, আবার ছবিটার বিজ্ঞাপনও।’

‘আপনার চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন করার জন্য আমি আসিনি।’ ভরাট কষ্টস্থরটা ডা. ক্লেইবর্নের না হয়ে যায় না। ‘আমি এসেছি আপনাদেরকে সাবধান করে দেবার জন্য। প্রেস এই ব্যাপারে আমার যে কথাটা শুনতে পাবে, তা হলো-এই চলচ্চিত্র বানানো একটা বিশাল বড় ভূল হতে যাচ্ছে।’

লোকটা কোন দলে আছে, তা জ্যানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন্টারকমের সুইচ ছেড়ে দিল ও। যদি আসলেই ক্লেইবর্ন প্রেসের সামনে অমন কথা বলে, তাহলে খবর আছে। পেছন থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো। সম্ভবত অনিতা ফিরে আসছে। কিছু করতে চাইলে এখনই করতে হবে।

ব্যক্তিগত অফিস ঘরের দরজাটা একটানে খুলে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করল জ্যান। ভেতরের সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখের হাসিটা সবার জন্যই, কিন্তু নজর পড়ল ড্রিসকলের ডেক্সের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লোকটার দিকে। ওই লোকটাই ডা. ক্লেইবর্ন।

‘হাই,’ বলল জ্যান। ‘বিরক্ত করলাম না তো?’

‘কী চাই?’ গার্জে উঠল ড্রিসকল। ‘আমরা একটা মিটিং এ আছি।’

‘শুনলাম।’

‘শুনলাম মানে?’

ড্রিসকলের রাগ পাতাই দিল না জ্যান। ‘কে যেন ইন্টারকমের সুইচটা চালু করে রেখেছে।’

‘অনিতা কই?’

‘একটু বাইরে গিয়েছে, আমাকে থাকতে বলল।’

ড্রিসকল তার সেক্রেটারি ডাকার জন্য, ডেক্সের ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়লেন।

‘ওকে বকাবকি করো না।’ তাড়াতাড়ি বলে উঠল জ্যান। ‘দোষ আমার। আড়ি পাতা উচি�ৎ হয়নি।’

রাগাস্তি ভাবটা প্রযোজকের চেহারা থেকে বিদায় না নিলেও, হাত সরিয়ে নিল সে। ‘বুঝলাম। তুমি শুনেছ, তাতে কী? ভেতরে এসেছ কেন?’

রয় আর র্জেও জ্ঞ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু তাদেরকে অগ্রাহ্য করল জ্যান। অগ্রাহ্য করল ড্রিসকলকেও। নজর এখন পুরোপুরি ডাঙ্গার ক্লেইবর্নের দিকে। লোকটাকে বয়স্ক মনে করেছিল সে। কিন্তু নাহ, যুবক বলা চলে। দেখতে খুব সুদর্শন না হলেও, আকর্ষণ রয়েছে।

‘ডা. ক্লেইবর্ন?’ বলল মেয়েটি। ‘আমি জ্যান হার্পার।’

নড করলেন ক্লেইবর্ন। জ্যানের হাসির উভয়ের হাসি দিয়ে বললেন। ‘আপনার ছবি আমি দেখেছি।’

‘তুমি করে বলবেন। তাহলে তো জানেন যে আমি মেরি ক্রেনের চরিত্রে
অভিনয় করছি।’

‘কী হচ্ছে এসব?’ আবারও গর্জে উঠল ড্রিসকল। ‘জরুরী কিছু বলার না
থাকলে—’

‘বলার আছে।’ লোকটাকে থামিয়ে দিল জ্যান। ‘আমার আপনার সাহায্য
দরকার।’

‘সাহায্য?’ ক্লেইবের্নকে দেখে মনে হলো, বোকা বনে গিয়েছেন। ‘কী রকম
সাহায্য? কী সমস্যা তোমার?’

‘কী না, কে। আপনি আমার সমস্যা।’

‘বুঝতে পারলাম না।’

‘ছবিটার ব্যাপারে কথা বলছি। আপনার সাহায্য আমার...নাহ, আমাদের সবার
দরকার।’

‘আমি তো এ ব্যাপারে আমার মনোভাব আগেই বলে দিয়েছি—’

‘শুনলাম, কিন্তু আপনার মনোভাব পাল্টাতে হবে।’

‘কেন?’

‘কেননা এই ছবিটাকে দিনের আলো দেখাতেই হবে।’ জ্যান এখন পরিষ্কৃতি
বুঝে কথা বলতে শুরু করেছে। ‘আপনি কি চিনাট্যটা পড়েছেন?’

‘নাহ, পড়িনি।’ জোরালো কঠে উত্তর দিলেও, নজর নিচের দিকে সরিয়ে
নিলেন ক্লেইবের্ন।

এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল জ্যান, চেপে ধরল তাই। ‘তাহলে
পড়ে নিনি। অসাধারণ লিখেছে রয়।’ চোখের কোণা দিয়ে সে দেখতে পেল,
ড্রিসকল আর জর্জ কোনও কথা না বলে শুধু শুনছে। এখন ওই দুজনের কেউ
ওকে বাঁধা দেবার চেষ্টাও করবে না। পরিষ্কৃতি পুরোপুরি জ্যানের দখলে। ‘আমি
লেখনীর কথা বলছি না। বলছি এতে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তার কথা। আর
দশটা হরের ছবির মতো না এটা। এখানে নরম্যানকে দেখে মনে হবে, সেও অন্য
সবার মতোই মানুষ। আমাদের মতোই তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয় আছে। কিন্তু
এমন এক বাতিক ওকে পেয়ে বসেছে, যার হাত থেকে ছাড়া পাচ্ছ না। ও যা
করেছে, তা অবশ্যই ভয়ানক। কিন্তু কারণটা সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে
ছবিতে। দেখা শেষ হলে দর্শক উপলব্ধি করতে পারবে, নরম্যান বেটসও
অন্যদের মতোই এক ভিন্নিম। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ভিন্নিম।’

ডা. ক্লেইবের্ন হাসছিলেন। ‘অসাধারণ এক বক্তৃতা দিলে। ক’বার প্রাকটিস করে
এসেছ?’

‘একবারও না।’ নিষ্কম্প চোখে তার দিকে তাকিয়ে সত্য কথাটা বলল জ্যান।
‘প্রাকটিস করে আসলে আপনাকে অন্য কিছু বলতাম। বলতাম, এই ছবিটা

আমার জন্য কত জরুরী। কত শত মানুষের চাকরী এর সাথে জড়িয়ে আছে।
কিন্তু...’ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল জ্যান। শব্দ গুলো যেন আপনা থেকে ওর মুখে
এসে ধরা দিচ্ছে। ‘কিন্তু এই ছবিটার আবেদন অন্য জায়গায়। আপনি একজন
ডাক্তার। নরম্যানকে কাছ থেকে দেখেছেন, ওর সমস্যাগুলো আপনার চাইতে
ভালো আর কেউ জানে না। আপনি কি চান না, মানুষ...আমি...আপনি...আমরা,
একবারের জন্য হলেও সেই সমস্যাগুলো উপলব্ধি করি? বোঝার চেষ্ট করি?

ট্পায়টা কিন্তু আপনার সামনেই রয়েছে। চিনাট্যটা পড়ে দেখুন, কোথায় কী
ভুল হলো সেটা আমাদেরকে বলুন। যেন আমরা সারা বিশ্বকে আসল নরম্যানের
সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। আমাদের জন্য না করতে চাইলে অন্তত নিজের
জন্য, আপনার রোগীর জন্য করুন।’

ইত্তেক করলেন ডা. ক্লেইবন। প্রথমে মনে হলো বিরুদ্ধাচারণ করবেন। কিন্তু
হার মেনে নিলেন। ‘ঠিক বলেছ। কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ না। আমি এখানে
উপস্থিত সবাইকে বোঝাতে চাইছিলাম যে, নরম্যান বেটস এখনও বেঁচে আছে।
আর তাই এই ছবিটা করা হবে সবার জন্য বিপদজনক।’

‘আমি একমত,’ বলল রঘু। ‘দেখ, জ্যান-’

‘আমিও একমত,’ ছেলেটাকে কথা বলার সুযোগ দিল না ও। ‘কিন্তু মি. ড্রিসকল
সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে, কাজ চালিয়ে যাবেন। সেজন্য আমাদের আরও বেশি
করে ডা. ক্লেইবনকে দরকার।’ আবারও লম্বা ঘুবকটার দিকে ফিরল জ্যান।
‘নিজের কথা বলি। যদি আপনি ঠিক হন, যদি নরম্যান বেটস এখনও বেঁচে
থাকে, তাহলে আপনাকে পাশে পেয়ে আমি নিরাপদবোধ করব।’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ক্লেইবন। এরপর যখন মুখ খুললেন, তখন কথা
বললেন জর্জ ওয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে। ‘আমি রবিবার পর্যন্ত ফাঁকা আছি।
পরামর্শকের কাজটা একটু বুঝিয়ে দিন তো।’



আঠারো

রয় অ্যামেসের সামনের টেবিলে বসে আছেন ক্লেইবর্ন। লাঞ্চ করার জন্য আগত লোকজনের ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেছে ক্যান্টিন। হই হল্লোরের মাঝে অ্যামেসের কথা শোনা-ই দায় হয়ে পড়েছে।

তিনি আসলে ওর কথা শুনতে খুব একটা আগ্রহীও নন। ড্রিসকলের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে, ভেতরে ঘটা ঘটনাগুলো তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তিনি রাজি হলেন কী করে? এটা কি তার অসতর্কতার ফল? মানতেই হবে, পরিহিতিটা খুব সহজেই ধরে ফেলেছিল মেয়েটা। আর যুক্তি আছে তার কথায়। অন্তত, অন্যদের মতো উপহাস করে তো আর বিপদের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি জ্যান। অবশ্য এই মুহূর্তে তার সামনে বসে থাকা রয়ও কাজটা করেনি।

তবও, এটা তার এখানে থেকে যাওয়ার আসল কারণ নয়। সম্ভবত মেয়েটির কথায় প্রভাবিত হননি তিনি, হয়েছেন তার শারীরিক উপস্থিতিতে। জ্যান হার্পারের ছবি প্রথমবার দেখে নিজের কী রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেকথা মনে পড়ে গেল ক্লেইবর্নের। কিন্তু সামনাসামনি সাক্ষাতটা তার মধ্যে এমন একটা প্রভাব ফেলেছে, যেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

সহসা আবিক্ষার করলেন, সেকথাই বলছেন রয় অ্যামেসকে! তার কথা শুনে মাথা বাঁকাচ্ছে করছে লেখক।

‘ঠিক। এজন্যই ওকে বাচাই করেছে ভিজিনি। জ্যান দেখতে একদম মেরি ক্রেন-এর মতো।’

‘আমার তা মনে হয় না,’ ওয়েটেস এসে তাদের হাতে মেনু ধরিয়ে দিতে একটু বিরতি নিলেন তিনি। ‘হ্যাঁ, চেহারায় মিল আছে। কিন্তু হৃবহু মিল নেই।’

‘আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে বেটস বেঁচে আছে?’

নড় করলেন ক্লেইবর্ন। ‘তোমারও কি তা মনে হয় না?’

‘হ্যাঁ। তবে তা শুধুই একটা অনভূতি। ব্যাখ্যা করতে পারব না, কেন এমনটা মনে হচ্ছে আমার। ভেবেছিলাম, আপনার আরও কিছু বলার আছে। এমন কিছু, যা মিটিং-এ ওদেরকে বলেননি।’

‘এই মুহূর্তে ওসব নিয়ে কথা বলতে চাই না।’

‘মানে আমাকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না?’

‘ঠিক জানি না,’ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আশপাশের টেবিলগুলোর দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন, তার মুখে এক চিলতে হাসি। ‘এখনও এখানকার কারও সাথে ঠিকমতো পরিচিতও হইনি।’

‘এই প্রথম কোনও স্টুডিওতে এসেছেন?’
‘হ্যাঁ।’

‘ঠিক আছে, জায়গাটা তাহলে আপনাকে চিনিয়ে দেই,’ অ্যামেস বলল। ‘ওখানকার লোকগুলো ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছে। জিস আর লিভাই পরা লোকগুলোর কাছে বোকা বনে যাবেন না। ওরা উচু শ্রেণীর আমলা। এই টিমের একজন আপনি। নোংরা কাপড়চোপড় পরবেন, সাধারণ কর্মচারীর মতো কাজ করবেন। কিন্তু স্টুডিও থেকে যখন বাইরে যাবেন, সবাইকে দেখিয়ে পঁচিশ হাজার ডলারের গাড়িতে চড়বেন।’ দাঁত বের করে হাসল সে। ‘স্মেহনকারী এক সমাজে বাস করি আমরা।’

ক্লেইবর্ন হাসলেন। রয় অ্যামেস বোধহয় এই বাক্য এবারই প্রথম ব্যবহার করেনি। এবার জানালার পাশের টেবিলে বসে থাকা আরেক দল লোকের উদ্দেশ্যে নড় করলেন ক্লেইবর্ন। এই লোকগুলোর পরনে কালো স্যুট, সাদা শার্ট, আর গলায় স্যান্ডেল বাঁধা নেকটাই। ‘ওই লোকগুলো কারা?’

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল রয় অ্যামেস। ‘অতিথি। টিভি চ্যানেলের হয়ে কাজ করে নতুন আইডিয়ার খোঁজে ম্যাড অ্যাভিনিউ থেকে আসে। চুরি করতে। তবে সাধারণত নিয়ে যায় পুরনো সব আইডিয়া।’

আইলের ওপারে এক দল রুক্ষ চেহারার যুবকের দিকে ইশারা করলেন ক্লেইবর্ন।
‘আর এই বাচাগুলো?’

‘গান বাজনা। এখন অবশ্য ওদেরই দিন। একটা গোল্ড রেকর্ড এক টন অঙ্কারের সমান।’

একটা লোক তাদের পাশ কাটিয়ে পাশের টেবিলের সামনে থামল। লোকটার বিশাল ভুঁড়ি ছাপিয়ে তার তামাটে তরুণ মুখটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টেবিলে বসে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে উচ্চস্থরে হেসে উঠল সে। তারপর সরে গেল ওখান থেকে।

‘টেবিল-হপার,’ রয় অ্যামেস জানাল। ‘কোনও অভিনেতাকে যদি হাসতে দেখেন, তাহলে নিশ্চিত ধরে নেবেন, সে বেকার। ক্লান্ট, চেহারার নিশ্চৃপ লোকগুলো কাজের মাঝে থাকে।’

ক্লেইবর্ন নড় করে, মেনুর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ‘কী খাওয়া যায়?’
‘লাঘও অন্য কোথাও খাওয়া যাবে,’ হাসল অ্যামেস। ‘তবে যতক্ষণ এখানে আটকে আছেন, একটা স্যান্ডউইচ দিয়ে চালিয়ে দিন।’

‘অন্তর্ভুক্ত। আমি আশা করেছিলাম, এখানকার খাবার ভালো হবে।’

‘একসময় ভালো ছিল, অন্তত সেরকমই শুনেছি। এখন কেউ আর গা করে না।’
হাত থেকে মেনুটা নামিয়ে রাখল অ্যামেস। ‘পুরনো প্রবাদটা জানেন নিশ্চয়ই। আপনি
যা খান, আপনি ঠিক তা-ই? যদি তা-ই হয়, তাহলে বেশিরভাগ মানুষই বিষ্টা খায়।’

ওয়েইটেস এসে তাদের অর্ডার নিয়ে গেল। লেখকের মন্তব্যটা মনে মনে নেড়েচেড়ে
দেখলেন ক্লেইবর্ন। কেন জানি মনে হলো, এই লাইনগুলো আগেও ব্যবহার করেছে
ছেলেটা। রয় অ্যামেস টেবিল-হপার না, তবে সে ঠিকই তাকে খুশি করতে চাইছে।

‘কফি দিও,’ ওয়েইটেস মেয়েটা চলে যাওয়ার সময় ওকে বলল অ্যামেস। তারপর
ফিরে তাকাল সঙ্গীর দিকে। ‘ছবির অন্য কারও সঙ্গে দেখা করেছেন?’

‘না। পল মরগান নরম্যানের চরিত্রে অভিনয় করছে, তাই না?’

‘সম্ভবত। এখন পর্যন্ত অন্য রকম কোনও চরিত্রে অভিনয় করেনি ও।’ কফি চলে
আসায় একটু থামল অ্যামেস। ‘সব সময় অস্বাভাবিক পুরুষালী সব চরিত্রে অভিনয়
করেছে।’

‘তাহলে সে এই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেল কীভাবে?’

‘ভিজিনি-কে জিজেস করুন।’ কফির কাপটা তুলে নিল অ্যামেস। ‘এ-ও হতে
পারে, ও এসব নিয়ে ভাবেইনি। ভিজিনি আজকাল সাসপেস মুভি বানায় না-
হিজিবিজি সব মুভি বানায়। এখনকার বাচ্চারা এসবই চায়। স্পেশাল ইফেক্টের
কারিকুরি, গাড়িতে সংঘর্ষ আর মার্ডার সিনের সময় পাক্ষ মিউজিকের
ছড়াছড়ি। পুরনো দিনের রোমের মতো অবস্থা-সিংহ যখন খিস্টানদের খেতে শুরু
করে, তখনই উচ্চস্বরে সঙ্গীত বাজানো শুরু হয়।’

সামনে ঝুঁকলেন ক্লেইবর্ন। ‘তাহলে চিত্রনাট্য লিখলেন কেন আপনি?’

‘টাকা।’ অ্যামেস শ্রাগ করল। ‘না, সত্যি হলো না কথাটা। কিংবা বলতে পারেন,
অর্ধসত্য। এ চলচ্চিত্রে কিছু একটা দেখেছি আমি। সত্তা জনপ্রিয়তা আর অশ্লীলতা
ছাড়া দর্শকদের কাছে পৌছানোর একটা সুযোগ আছে এ সিনেমায়। হয়তো
চিত্রনাট্যটা পড়ার সময় আপনিও বুঝতে পারবেন।’

‘চেষ্টা করব,’ কথা দিলেন ক্লেইবর্ন।

দুপুরে, মোটেলে, ঠিক তা-ই করলেন তিনি।

প্রচন্ড ভ্যাপসা গরম পড়েছে। এয়ার কন্ডিশনারও কোনও কাজে আসছে না। কিন্তু
এসবের দিকে নজর নেই ক্লেইবর্নের, কারণ রামের ভেতরে নেই তিনি।

চিত্রনাট্যে ডুবে গিয়েছেন তিনি। দুই হাজার মাইল দূরের ও বিশ বছর আগের
এক পৃথিবীতে চলে গিয়েছেন।

লেখনী খুব একটা শক্তিশালী না, জায়গায় জায়গায় মান উঠানামা করেছে।
বাগাড়ম্বরের পরও সত্তা...জনপ্রিয় দৃশ্যগুলো বাদ দেয়ানি রয় অ্যামেস। অনেকগুলো
চমকে দেবার মতো দৃশ্য আছে চিত্রনাট্যে। তাছাড়া অনুপ্রেরণার বদলে খুনের ওপর-
ই বেশি শুরুত্ব দেয়া হয়েছে এতে।

তবে শেষ কথা হলো, চিত্রনাট্যটা সফল। সহজ-সরল মেয়েটা আর চতুর পাগল লোকটার চরিত্র গঢ়বাঁধা হলেও, মানিয়ে গিয়েছে। আজকালকার মেয়েরা হয়তো এতো সহজ-সরল না, তবে পাগল পুরুষগুলোও আগের চেয়ে বেশি চালাক হয়েছে। সিনেমার প্রতিটি বিষয়ই খবরের কাগজের শিরোনাম হয় নিয়মিত। কয়েকজন সিরিয়াল কিলারের নাম পড়ে গেল ক্লেইবর্নের, মিডিয়া যাদের নায়ক বানিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু লোকগুলোর অবস্থা বা কাজে তো জমকালো কিছু নেই। বদ্দ উন্ন্যাদগুলো একটার পর একটা খুন করেই যাচ্ছে।

রয়ের বাগাড়ম্বরগুলো মনে পড়ে গেল তার। ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, চিত্রনাট্যকার মনে হচ্ছে নিজেকে। তার কাজ হচ্ছে সংলাপ থেকে সত্তা বাগাড়ম্বও ছেঁটে ফেলা। বাস্তবতা আর বাইরের ঠাট্টাট নিজেদের হয়েই কথা বলুক।

সূর্য ভুবে গেছে। বাতি জ্বলে ব্রিফকেস থেকে একটা প্যাড বের করলেন তিনি। তারপর নোট নেয়া শুরু করলেন।

এয়ার কন্ডিশনারের ঝির ঝির আওয়াজে, মাথার উপর জুলতে থাকা মিটমিটে আলোতে অন্য এক সময়, অন্য এক পৃথিবীতে হারিয়ে গেলেন তিনি...

...নরম্যানের পৃথিবীতে।

দরজায় করাঘাতের শব্দ তাকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনল।

‘কে?’ গলা চড়িয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

‘আমি, টম পোস্ট।’

দরজা খুলে দিলেন ক্লেইবর্ন। তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসি দিল বুড়ো। ‘আপনি ব্যস্ত নাকি?’

‘না।’ মাথা নাড়লেন ক্লেইবর্ন।

বেজন্যা শালা কী চায়?

‘আপনার ঘরের লাইট জুলানো দেখলাম। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে দুই পেগ বিয়ার মেরে দিলে মন হয় না।’ বাঁ হাতে ধরে রাখা বিয়ার দেখিয়ে নড় করল পোস্ট। তারপর মুখ টিপে হাসল।

এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন ক্লেইবর্ন। কিন্তু তার বহু বছরের অভিজ্ঞতা বলে, পোস্টের হাসিটায় এমন একটা বার্তা আছে, যা উপেক্ষা করা যায় না। ফুর্তির ঢোটে নার্ভাস হাসিটা দেয়নি বুড়ো-কিছু একটা লুকানোর চেষ্টায় দিয়েছে। কী লুকাচ্ছ টম পোস্ট?

‘ভেতরে আসুন।’ দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন ক্লেইবর্ন। ‘বাথরুমে পরিষ্কার কোনও গ্লাস পাওয়া যায় কিনা দেখছি।’

‘গ্লাস না হলেও চলবে।’ একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল টম। বিয়ারের ক্যানগুলো টেবিলে রেখে একটা নিজের জন্য নিয়ে আরেকটা বাড়িয়ে দিল ক্লেইবর্নের দিকে। ‘চিয়ার্স।’

‘ধন্যবাদ।’ এক ঢোক বিয়ার গলায় চালান করে দিলেন ক্লেইবর্ন।

‘এমন আবহাওয়ায় বিয়ার ছাড়া জমে না।’ আবারও মৃদু একটা হাসি দিল টম।
তবে বুড়োর চোখ দুটো সারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অবশেষে টেবিলের ওপর এসে ঝির হলো।

‘সিনেমার স্ক্রিপ্ট?’ ক্লেইবর্নের কাছে জানতে চাইল। ‘ভেবেছিলাম আপনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত নন।’

‘ঠিকই ভেবেছেন। এক বন্ধুর অনুরোধে স্ক্রিপ্টটায় চোখ বুলাচ্ছিলাম।’

‘আচ্ছা।’ বলল সে। ‘গল্পটা কী নিয়ে? নাকি আমাকে বলা যাবে না?’

‘তা যাবে।’ বুন্দের বলিলেখা পড়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ক্লেইবর্ন।
‘ব্যাপারটা ভেবে দেখুন, আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। প্রধান চরিত্র নরম্যান বেটস।’

‘কী বলছেন! হাসি বন্ধ হয়ে গেছে টম পোস্টের। ‘গতকালের খবরে অবশ্য দেখেছি যে, করনেট ওই কেন্দ্র নিয়ে একটা সিনেমা বানাচ্ছে।’ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা চিনাট্যটার দিকে তাকাল লোকটা। ‘আমার ধারণা এটাই সেই সিনেমাটার স্ক্রিপ্ট।’

‘ঠিক ধরেছেন।’ সহজ হয়ে এসেছে ক্লেইবর্নের গলার সুর। ‘আপনি তো চিনাট্য লিখতেন এক সময়। চোখ বুলাবেন নাকি একবার?’

তাকে আশ্র্য করে দিয়ে মাথা নাড়ল লোকটা। ‘সময় নষ্ট। আজকালকের সিনেমাগুলো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। যৌগ উভেজক দৃশ্যে ভর্তি সব সিনেমা। নায়ক-নায়িকা যেভাবে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে, তাতে যে কারও কোমর ভেঙে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। আর কিছুক্ষণ পর চাদরের নীচ থেকে যখন নায়ক বের হয়ে আসে তখন কী দেখা যায়? নায়কের পরনে বক্সার! যতসব ফালতু কাজকারবার! আমাদের সময়ে এমন ছিল না।’ হাসিটা ফিরে এসেছে বুড়োর মুখে।
‘সময় বদলে যায়।’ বিয়ারের ক্যানে থাকা শেষ তরলটুকু গিলে ফেলল। ‘ফালতু খাবার, ফালতু সিনেমা। আজকাল লেখকদের অনেক ক্ষমতা।’

‘আমার বন্ধুর কাছ থেকে কিন্তু অন্যরকম কথা শুনেছিলাম।’ ক্লেইবর্ন বললেন।

‘আমি শুধু সিনেমার কথা বলিনি।’ খালি বিয়ারের ক্যানটা ছুঁড়ে ফেলল পোস্ট।
‘কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন। কিছু রাজনীতিবিদ বক্তৃতা দেয়। প্রতিপক্ষরা সেই বক্তৃতার প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতি দেয়। তারপর চিভি রিপোর্টার দুই পক্ষের বিবৃতি-পাল্টি বিবৃতির ব্যাখ্যা করে মন্দদুর পদে। এইসব বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি-ব্যাখ্যার সব কিছুই লিখে অজ্ঞাত কোনও লেখক। আর একেই আমরা “খবর” বলি।

দশ দিন বা দশ মাস বা দশ বছর পর, অন্য একজন লেখক একটা বই লিখে দাবি করে এসবই মিথ্যে ছিল। তখন আমরা তাকে “ইতিহাস” বলি। তাই আসল

কথা হলো গিয়ে, সব লেখকই পেশাদার মিথ্যুক। যাক গে ওসব কথা, আরেক রাউন্ড বিয়ার চলবে?

‘না, ধন্যবাদ।’ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। ‘বাইরে খেতে যাব আমি।’

‘আপনার সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো,’ পোস্ট বলল। ‘সন্ধ্যা বেলাতেই খেয়ে ফেলেছি। বাড়ি থেকে দূরে এসে একা খেতে ভালো লাগে না নিশ্চয়ই।’

‘আমি একা খেতে অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছি।’

‘বিয়ে করেননি?’

‘না।’ উঠে পড়লেন ক্লেইবর্ন। ক্লজিট থেকে জ্যাকেট নিয়ে বেরোবার জন্য উদ্যত হলেন।

লাইটের সুইচ অফ করে দিয়ে তার পিছু নিল টম পোস্ট। ‘আশেপাশে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে,’ বলল সে। ‘তবে সুপারমার্কেট থেকে খাবারদাবার কিনে ঘরের রেফ্রিজারেটরে রাখতে পারেন। তাহলে দরকারের সময় বাটপট ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিতে পারবেন নিজেই।’

‘পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।’ দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন।

এক ব্লক দূরের ছেট স্টেক-হাউসটায় চুকে পড়লেন তিনি। জায়গাটা কয়লার উভাপ, পিংয়াজের ঝাঁঁজ, মাংস ভাজার গন্দে এক বিশ্রী রূপ ধারণ করেছে। বুড়ো পোস্ট ঠিকই বলেছে। মোটেলেই খাবার নিয়ে খেতে হবে। এই পরিবেশে খাওয়া-দাওয়া করা অসম্ভব।

তার কেবল পোস্টের নার্ভাস হাসির কথা মনে পড়ছে। চোখ বন্ধ করতেই মনে পড়ে গেল, ব্যাটা কীভাবে তার ঘরের দরজায় উঁকিবুঁকি মারছিল। বুড়ো ধাড়ি বেজন্মা শয়তান।

উঁকিবুঁকি। তবে ওই হাসি আর অগ্রহের পিছনে অন্য কোনও মতলব লুকিয়ে আছে। পোস্টের কাছে নিশ্চয়ই ডুপ্পিকেট চাবী আছে। ব্যাটা হয়তো এখন তার কানে চুকে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে...অথবা চিত্রনাট্যটা। বুড়োকে ক্লিপটার প্রতি বেশ আগ্রহী মনে হয়েছে। আর কাহিনী শোনার পর, উটার বিষয়বস্তু বদলাতে আরও বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে। কেন?

ভাবো, নিজেকে তাগাদ দিলেন ক্লেইবর্ন। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। বুড়োটা হাসির মাধ্যমে বলতে চায়, ‘দেখো, আমি কোনও হৃষ্মকি নই। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার ওপর রেগে যেও না।’

প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া এক মোটেলে দিনের পর দিন বসে থাকতে হলে, যে কারও জীবন থেকেই আনন্দ নামক জিনিসটা উধাও হয়ে যাবে। ক্লেইবর্নই এই মুহূর্তে মোটেলের একমাত্র ভাড়াটে। তাই টম পোস্ট যদি নিঃসঙ্গতা কাটাতে তার

রুমে এসে বিয়ার গিলতে চায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বুড়ো লোকটা নিঃসঙ্গ।

লোকটা হয় নিঃসঙ্গ নয়তো শৰ্ট। সব লেখক পেশাদার মিথ্যেবাদী বলে সে কী বুঝিয়েছে?

রয় অ্যামেসও লেখক। ক্লেইবর্নের মনে পড়ে গেল, রয়ের চটকদার কথাগুলো আগেও কোথায় যেন শুনেছেন তিনি। টেবিল-হপারের মতো ওর রসিকতাগুলোও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বলা।

কিন্তু কেন? কী লাভ দৃষ্টি আকর্ষণ করে? ছবি বাতিলের ব্যাপারে দুজনের মনোভাব এক। তাহলে ছেলেটা কেনও তাকে খুশী করার চেষ্টা করেছে? তার চাইতে বড় কথা, নিজে কেন আগে আরও প্রবলভাবে চেষ্টা করল না?

একদিক থেকে চিন্তা করলে, চিরন্ত্যের নরম্যান রয় অ্যামেসের সৃষ্টি। নিজের হতাশা, রাগ তুকিয়ে দিয়েছে সে চরিটার ভেতর। যদি এটা ক্যাথারিস্ম না হয়, অন্তত ক্যাথেচিস্ম তো বটেই। ব্যাপারটা যেকোনও মুহূর্তে বিপদজনক রূপ ধারণ করতে পারে।

সব লেখক পেশাদার মিথ্যুক। লেখকদের সম্পর্কে আরেকজন লেখকের মতব্য। তার মানে একথাটিও মিথ্যা। কিন্তু সবাই-ই তো মিথ্যে বলেছে। এদের মাঝে তার রোগীরাও আছে। রোগীদের সমস্যা হচ্ছে, ওরা শুধু ক্লেইবর্নের সঙ্গেই মিথ্যে বলে না, মিথ্যে বলে নিজেদের সঙ্গেও। এক অর্থে ওরা সবচেয়ে পেশাদার মিথ্যুক। আর তিনি, ক্লেইবর্ন, একজন পেশাদার সত্যসন্ধানী।

সত্যাঘৰী, নিজেকে শুধরে দিলেন ক্লেইবর্ন। তবে তার এই অনুসন্ধান সবসময় সহজ হয় না। যেমনটি হয়নি নরম্যানের বেলায়।

খাওয়ান ডয়া শেষ করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন ক্লেইবর্ন। বুলেভার্ড ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। নিজের অজান্তেই নরম্যানকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। তার চোখ দুটো আশেপাশে এমন কাউকে খুঁজছে, যার এখানে থাকার কথা না।

তার পাশ দিয়ে হৃশহাশ করে গাড়ি, মোটরসাইকেল চলে যাচ্ছে। গাড়ির দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। সবে নয়টা বাজে। অথচ এরই মাঝে ফাঁকা হয়ে গেছে রাত্তা। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।

অনেক বেড়েছে গ্যাসোলিনের দাম। তবুও সবার নিজস্ব গাড়ি চাই-ই চাই। রাতবিরেতে শহরের রাত্তায় হেঁটে বেড়ানো খুব ঝুকিপূর্ণ। পুলিশরাও গাড়িতে বসে টহল দেয়। পুলিশের সন্দেহ তার মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো লোকজনের ওপর।

অদ্বার দেকানগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, বিভিন্নগুলোর প্রায়স্বন্ধকার প্যাসেজওয়েতে উকি মারছেন ক্লেইবর্ন। যদিও তিনি জানেন, যে আশায় উকিরুকি মারছেন, তা একেবারেই উত্তর। প্যাসেজওয়েগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে না নরম্যান। এখানে নেই সে। নাকি আছে?

যত নষ্টের গোড়া ওই চিত্রনাট্যটা। ওটা পড়ার পরই অঙ্গুত সব চিন্তা পেয়ে বসেছে তাকে।

পুরো ব্যাপারটা একটা ভ্রম। নরম্যান যদি তাকে এখানে টেনে আনত, তাহলে ওই স্টুডিওতেই ওকে পেয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি জানেন, সবকিছুই মিথ্যে: নরম্যান মৃত। কেবল চিত্রনাট্যটাই আবার ওকে জীবিত করে তুলেছে।

তারপরও ক্লেইবর্ন আবিক্ষার করলেন, বাঁয়ের শপিং মলগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পার্কিং এরিয়ার দিকে ঘুরলেন তিনি। লাইট, শব্দ, আর মানুষজনের ভিড় স্বাগতম জানাল তাকে।

পার্কিং লটে চুকে পালটে গেল তার মনোভাব। একজন মানুষ যা খায়, সে ঠিক তাই, রয় অ্যামেস বলেছিল। আসলে মানুষ যেভাবে ড্রাইভ করে, সে ঠিক তেমনই, বললেই মানাত বেশি। কারও কারও গাড়ি চালানোর ধরন দেখেই বলে দেয়া যায় সে আসলে কেমন।

পার্কিং লটে একের পর এক প্রবেশ করতে থাকা বাহনগুলোর ওপর নজর বুলালেন ক্লেইবর্ন। যত্তেব্র গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। এমনকি নো পার্কিং জোনেও দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। প্রাণোচ্ছল তরুণদের চিঞ্কার-চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

মার্কেটেও একই অবস্থা। প্যাসেজওয়ে বন্ধ করে শপিং-কার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দ মহিলারা। আশেপাশে ভিড় জমিয়েছে খন্দের।

সোয়া লিটার দুধ কিনলেন ক্লেইবর্ন। তৈরি খাবার বিক্রি হয় যে কাউন্টারে, সেখান থেকে কিনলেন শুকনো মাংস। তারপর এক প্যাকেট পনির নিয়ে ডিম কেনার জন্য এগোলেন। কিন্তু কাছে গিয়েই বাঁধা পেলেন। এক মধ্যবয়স্ক মহিলা গলগল করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ডিমের কাটন গুনছে। সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে সরে এলেন ক্লেইবর্ন। ব্যাপার না, ডিম ছাড়াই চলবে তার। এখন তার একটা জিনিসই দরকার-বিশ্রাম। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর একটা দিন পার করেছেন তিনি। কোলাহলে...লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ক্লান্ত তিনি। দুঁচোখ ভেঙে ঘুম আসছে।

বেকারির সামনে এসে দাঁড়ালেন ক্লেইবর্ন। ভেতর থেকে উচ্চ নিনাদে ভেসে আসা গানের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন ক্লেইবর্ন। ঠিক তখনই বেকারির একটা আয়নার দিকে নজর পড়ল তার। আয়নাটা লাগানো হয়েছে যেন দোকানের সামনের দিক থেকে দোকানিকে দেখা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে দোকানি না, অন্য একজনকে দেখা যাচ্ছে সেই আয়নার ভেতর দিয়ে। লোকটা এদিকে তাকাতেই চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন ক্লেইবর্ন।

নরম্যান বেটস...



উনিশ

শপিং-কাটটা একপাশে সরিয়ে রেখে দোকানের সামনের দিকে ছুটলেন ক্লেইবর্ন।
ক্রেতাদের ধাক্কা মেরে জায়গা করে নিয়ে এগোতে হচ্ছে তাকে। ফলে তার দিকে
বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা। কিন্তু সেদিকে জ্ঞানে করার সময় কই!

কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নরম্যানের মুখটা কেবল-ই চোখে ভাসছে।
দ্রুত সামনে চলে এলেন ক্লেইবর্ন।

কিন্তু উধাও হয়ে গেছে নরম্যান।

থমকে দাঢ়ালেন ক্লেইবর্ন। চারপাশের অপরিচিত মুখগুলোর ওপর চোখ
বুলালেন। তারপর ভিড় ঠিলে এগোলেন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা
সোনালী-চুলো মেয়েটার দিকে।

‘কোথায় ও?’

তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি।

‘তোমার সর্বশেষ খন্দের। এই এক মিনিট আগেও এখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে।’

শ্রাগ করল মেয়েটি, চোখ দুটো আপনাআপনি চলে গেছে বের হবার নিকটতম
দরজার দিকে। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে সেদিকে ছুটলেন ক্লেইবর্ন।

এক মিনিটের মাঝে পার্কিং লটে চলে এলেন তিনি। পার্কিং লটটা এখন
কানায় কানায় পূর্ণ। গাড়ি যাচ্ছে-আসছে। পরিচিত একটা মুখের খোঁজে পুরো
জায়গাটার ওপর চোখ বুলালেন ক্লেইবর্ন। লটের দিকে এগোলেন-উদ্দেশ্য বেরিয়ে
যেতে উদ্যত গাড়িগুলো খুঁজে বের করা।

তিন...চার...আরেকটা গাড়ি বেরোচ্ছে। গাড়িটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো বেরিয়ে
এল উন্মুক্ত লেনে। গাড়িটার দিকে ছুট লাগালেন ক্লেইবর্ন। ফ্লাডলাইটের আলোয়
উইঙ্গশিল্ডের পেছনে একজন মহিলার চেহারা দেখতে পেলেন। তার পাশে একটা
দরজার হাতলের মতো দেখতে শিশুর মাথার ছায়ামূর্তি।

হর্নের তীব্র আওয়াজে সম্মিত ফিরল ক্লেইবর্নের। ঘাট করে একপয়াশে সরে
দাঢ়ালেন তিনি। আরেকটু হলেই গাড়ির নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। এত কষ্ট
বৃথা গেল! উড়ে গেছে পাখি। তার হাত ফঙ্কে আবারও পালিয়েছে নরম্যান।

কিন্তু পালিয়ে গিয়েছেটা কোথায়?

যেহেতু শপিং করতে মার্কেটে এসেছে সে, তার মানে ধারে কাছেই কোথাও
আস্তানা গেড়েছে সে। কে জানে, রাস্তার পাশের কোনও মোটেলেও হতে পারে।
সবগুলোতে খোঁজ নেয়ার কোনও ব্যবস্থা করা যাবে কী? বড় বড় হোটেল বাদ

দিলেও, কয়েক ডজন থাকার জায়গায় আছে এখানে। তার উপর নরম্যান নিশ্চয়
নিজের নামে ঘর ভাড়া নেবার মতো বোকামি করবে না!

অসম্ভব, একা একা খোঁজ নেয়া তো একেবারেই সম্ভব না। পুলিশকে কাজে
লাগালেও সহজ হবে না। আর তাছাড়া, পুলিশ নিশ্চয় শুধু তার মুখের কথায়
কাজে নেমে পড়বে না। প্রমাণ দেখাতে হবে, নিরেট... অকাট্য প্রমাণ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্লেইবর্ন। মার্কেটে ফিরে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম চুকিয়ে
দেয়া ছাড়া করার মতো আর কোনও কাজ নেই। করলেনও তাই। মোটেলের
ফেরার মতে, বারবার তার নজর এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছিল। তিনি নরম্যানকে
দেখেছেন, সম্ভেদ নেই। কিন্তু নরম্যান তাকে দেখেছে কি? এই মুহূর্তে তাকে
অনুসরণ করে আসছে না তো?

মোটেলের ঘরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, স্পষ্টির নিঃশ্বাস বেরিয়ে
আসছে তার ভেতর থেকে। চাবী দিয়েই খুলতে হয়েছে তালা। ভেতরে কেউ
আছে বা তার অবর্তমানে কেউ ঢুকেছিল বলে মনে হচ্ছে না। নরম্যান যদি তার
ঠিকানা না জেনে থাকে, তাহলে আপাতত এখানে থাকতে কোনও বাঁধা নেই।

আর তাছাড়া, ডা. ক্লেইবর্নের ভুলও তো হতে পারে। কোলাহল, আলো,
ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা-সব মিলিয়ে হয়তো তার ভ্রম হয়েছে। পুলিশ সেকথাই তাকে
বোঝাবার চেষ্টা করবে। আসলে কোনও রোগী যদি তার কাছে এসে এসব বলত,
তাহলে তিনিও রোগীকে অমন কথাই বলতেন। তাই এ ব্যাপারে ড্রিসকল বা অন্য
কারও সাথে কথা বলেও লাভ নেই। প্রমাণ ছাড়া কেউ মেনে নেবে না। আপাতত
চুপচাপ থাকাই ভালো। অপেক্ষা করা যাক নরম্যানের। তবে নিরাপত্তায় আরও
জোর দিতে হবে। নরম্যান এখানে থাকলে, তার উপর্যুক্তি জানান দেবেই বের।

নরম্যান এখানে থাকলে...

কিনে আনা জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে, বিছানায় শুয়ে পড়লেন ক্লেইবর্ন।
ঙ্গীশুরকে ধন্যবাদ, তিনি থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্তত সবার উপরে
নজর তো রাখতে পারবেন, নিরাপত্তা দিতে পারবেন।

যুমের অতলে হারিয়ে যাবার আগমুহূর্তে প্রশ্নটা এল তার মনে।

সবার নিরাপত্তা না হয় তিনি নিশ্চিত করলেন, কিন্তু তার নিরাপত্তা নিশ্চিত
করবে কে?



বিশ

রয় অ্যামেস আর ড্রিসকলের অফিস একই ভবনে। কিন্তু দুটোর মাঝে বিন্দুমাত্র মিল নেই। লেখকের অফিসটা মনে হয় প্রযোজকের অফিসের টয়লেটেই এঁটে যাবে। সাজসজ্জার কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল।

ভেতরে প্রবেশ করেই ক্লেইবর্ন দেখতে পেলেন, অ্যামেস তার ডেক্সের পেছনে বসে আছে। ছোট জায়গায় তার কোনও অসুবিধা হয় বলে মনে হচ্ছে না। সমস্যা থাকতে পারে ছেলেটার, কিন্তু ক্লান্ট্রোফোবিয়া নেই। একমাত্র জানালা দিয়ে ভেতরে চুক্তে থাকা সূর্যের আলো চোখে পরায়, সেদিকে পিট পিট করে তাকালেন ক্লেইবর্ন। এরপর চিনাট্যের কপিটা ডেক্সের উপরে রেখে দিলেন। অ্যামেস চোখে আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকাল।

‘কেমন লাগল?’ জানতে চাইল সে।

ইত্তত করলেন ক্লেইবর্ন, গত রাতের ঘটনাটা বলা ঠিক হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারছেন না। বেশ কিছু ক্ষণ চিন্তা করার পর ঠিক করলেন, বুঁকি নিয়ে লাভ নেই। রয় হয়তো ওকে বিশ্বাস করবে না। আর এমনিতেও, এই মুহূর্তে চিনাট্যটির গুরুত্বই সবচাইতে বেশি।

‘কিছু কিছু জিনিস লিখে এনেছি।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘যদি ঢাও তো-’ একদিনেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মাঝে।

‘চাই মানে! অবশ্যই চাই।’

ব্রিফকেস খুলে হলদেটে কাগজগুলো বের করে আনলেন ক্লেইবর্ন। ‘আশা করি, আমার হাতের লেখা পড়তে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।’

হলো না। দ্রুত গতিতে লেখার উপর চোখ বুলালো অ্যামেস। চেহারায় অনুভূতির কোনও ছাপ না পড়লেও, ছেলেটার মনের মাঝে কী চলছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ডাঙ্গার। অনেকদিন আগেই, মুখের নড়াচড়া দেখে মনের কথা বুঝে নেয়ার বিদ্যা শিখে নিয়েছিলেন তিনি।

প্রথম প্রথম উপরের ঠোঁটটা কিছুক্ষণ বাঁকা হয়ে রইল। যেন কোনও প্রাণবয়ক্ষ মানুষ, কোনও বাচ্চা ছেলের দুষ্টুমি দেখে হাসছে। আন্তে আন্তে মিলিয়ে এল হাসিটা। শেষ পর্যন্ত জ্ঞ কুঁচকে গেল। ক্লেইবর্ন বুঝতে পারলেন, এবার নাক গলাবার সময় হয়েছে। ‘একটা কথা মনে রেখ,’ বললেন তিনি। ‘আমি তোমার লেখনীর সমালোচনা করছি না। ভেতরে যে নৃশংসতা আছে, তার সমালোচনা করছি।’

‘আমরা এখন আর ওই শব্দ ব্যবহার করি না।’ চোখ তুলে বলল অ্যামেস।
‘বলি বক্স-অফিসে ধূম ফেলান।’

‘জানি। ভেবেছিলাম, তুমি গংবাঁধা কাজ করতে আগ্রহী নও।’

‘ঠিক বলেছেন,’ অনেকটা অত্রক্ষার সুরে বলল ছেলেটা। ‘আপনার আপত্তির
যে যে জায়গা দেখছি, সেগুলো ভিজিনির ঢোকানো। ড্রিসকলও আপত্তি করিনি।’
‘তাহলে তো আমি আমার সময় নষ্ট করছি কেবল।’ বললেন ডাঙ্কার।
‘পরামর্শক হিসেবে আমার পরিবর্তন করার অধিকার আছে বলেই জানতাম।’

‘পরামর্শক, হ্যাঁ। পরিবর্তনের কথা বলার অধিকার? সেটাও আছে। কিন্তু
ক্ষমতা পুরোপুরি ভিজিনির হাতে। চিত্রনাট্যে পরিবর্তন, অভিনেতা নির্বাচন,
সবকিছুতে ওর কথাই শেষ কথা। বলেছিলাম না, কেবলমাত্র মেরি ক্রেনের মতো
দেখতে বলেই জ্যানকে সে বেছে নিয়েছিল?’

‘ওটাও আমার আরেকটা সমস্যার জায়গা। মেয়েটার দৃশ্যগুলোর ব্যাপারে
আমার মন্তব্য পড়েছ?’

‘পড়লাম তো।’

‘এই চরিত্রটা আমার কাছে বড় দুর্বল মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, চরিত্রটা
একদম এক পাঞ্চিক। একটু বেশি সাধারণ।’

‘আপনার চোখেও ধরা পড়েছে দেখি।’ শ্রাগ করল অ্যামেস। ‘ইচ্ছা করেই
ওরকম রেখেছি। জ্যানের অভিজ্ঞতা কম, ভারী কোনও চরিত্রের জন্য এখনও
প্রস্তুত নয় সে। তাই ওকে রক্ষা করতে চেয়েছি। দেখে বা কথা বলে মনে হতে
পারে যে মেয়েটা খুব শক্ত। কিন্তু মিশলে বুঝতে পারবেন, সেই শক্ত আবরণের
আড়ালে নরম কিছু একটা আছে।’

‘মেশার সুযোগ পাব বলে মনে হচ্ছে।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘আসলে এইমাত্র
পার্কিং লটে ওর সাথে দেখা হলো। আজকে রাতে খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে সে।’

উভয় দিল না অ্যামেস, কিন্তু ছেলেটার নীরবতা যেন চিন্কার করে তার মনের
খবর জানিয়ে দিল। কী দরকার ছিল কথাটা জানাবার? নিজেকেই বকলেন
ক্লেইবর্ন। মেয়েটাকে যে এই যুবক পছন্দ করে, সেটা তো পরিষ্কার। তোমার
দরকার ছিল এক মিত্রের। একমাত্র যে মানুষটার তা হবার সম্ভাবনা ছিল, এই মাত্র
তুমি তাকে শক্ত বানিয়ে দিলে।

‘তবে সেটা জরুরী কোনও ব্যাপার না,’ ঘটনাটাকে হালকা করার প্রয়াস
পেলেন ডাঙ্কার। ‘আপাতত চলো, চিত্রনাট্য নিয়ে মাথা ঘামাই। যে যে জায়গায়
দাগ দিয়ে দিয়েছেন?’ বৈরিতা লুকাবার বিন্দু মাত্র চেষ্টা করল না রয়।

‘অঙ্গুরচিত্ততা, গোপন মনোভাব, অবচেতন মনের চাহিদা-এসব তো মেডিকেল
রিপোর্টে মানায়, চিত্রনাট্যে না।’

‘দৃঢ়থিত, আসলে আমি চেয়েছিলাম কী-’

‘কী চেয়েছিলেন তা আমিই বলে দেই,’ মাথা নাড়ল অ্যামেস। ‘আপনি যে ডাঙ্কার, তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। মনোবিদরা আসলে কী জানেন? অর্থনীতিবিদ, নৃতত্ত্ববিদ আর ভূ-তত্ত্ববিদের মতোই আমাদের চিল ছোঁড়া মানুষ। অল্প কিছুদিনের মাঝে দেখবেন, মানব মনোবিদদের জায়গা দখল করে নিয়েছে কম্পিউটার।’

‘আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।’ মাথা ঠাস্তা রাখলেন ক্লেইবর্ন। ‘কিন্তু এখন ওসব কথা আমাদের কোনও উপকারে আসবে না। জ্যানের চরিত্রটা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছ, সেভাবেই থাক। আমাদের কাজ করতে হবে এই নৃশংসতার মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য।’

‘সেটা সম্ভব না। বললাম না, ওগুলো ভিজিনি’র ঢোকানো?’

শ্রাগ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘তাহলে চিরন্যাট্যের মূলভাবে পরিবর্তন আনতে হবে।’
‘মানে?’

‘চলচ্চিত্র জগতের আসল সমস্যা কিন্তু নৃশংসতা নিয়ে না। আসল সমস্যা হলো, নৃশংসতাকে এখানে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, তা নিয়ে। নায়ক বলো আর ভিলেন, দুপক্ষই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। দেখানো হয়, শেষ পর্যন্ত সবাইকে নৃশংসতার-ই আশ্রয় নিতে হয়। এখানে নরম্যানকে যেভাবে রেখেছ, সেভাবেই থাকুক। শুধু সেটাকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করব না।’ অ্যামেসকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে দেখে, বলে চলল ক্লেইবর্ন। ‘সত্যটাকেই বড় করে তুলব আমরাও খুন-খারাবী কোনও কিছুর সমাধান করতে পারে না। এর মাঝে বীরোচিত কিছু নেই। আসলে তোমাকে এজন্য বেশি একটা খাটতেও হবে না। অল্প কিছু পরিবর্তন আনলেই চলবে। দেখাতে হবে, নরম্যান এই জগন্য কাজগুলো করে আনন্দ পাচ্ছে না। বরং অসুস্থ এক চিন্তার হাতে বন্দী সে।’

‘এই আপনার সমাধান?’ কাষ্ঠ হাসি হাসল রয়। ‘ঘড়ির কাঁটাকে পঞ্চাশ বছর পেছনে নিয়ে গিয়ে সবাইকে জানানো-অপরাধে লাভ নেই?’

‘কেন, ক্ষতি কী তাতে? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এতো খুন খারাবী ছিল না। যা হতো, তাও অপরাধীদের মাঝেই হতো। আর আজ দেখ, বাচ্চারাও খুন হচ্ছে...খুন করছে। কেন? কারণ আমাদের চলচ্চিত্র, আমাদের টিভি, আমাদের বই জানাচ্ছে-অপরাধ করলে, পূরক্ষার মেলে।’

‘তা তো জানাবেই। আজকালকার দিনে এসবই চলে। লোকে ‘খায়’।’

‘সবাই কিন্তু তা করে না। দেখো, আমি খুব একটা ধার্মিক মানুষ নই। কিন্তু জানি, বাইবেল এখনও বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বই।’

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল অ্যামেস। এখন আর দীর্ঘায়িত প্রেমিকের দৃষ্টি নেই ওর চোখে। ছেলেটার সব চিন্তা এখন প্রতিটা লেখকের প্রেমাঙ্গনের দিকে

ন্যস্তং হাতের কাজটার দিকে। 'বুঝতে পেরেছি। আপনি চাইছেন, বাজে বা জগন্য সবকিছু থাকুক ছবিতে। কিন্তু সেই সাথে সেগুলোর ফলাফলও থাকুক। আর আসলেই কাজ কম করতে হবে আমাকে, নরম্যানের উল্লিঙ্গিত বাক্যগুলোকে দৃঢ়খী মানুষের সদোগ্নিতে পরিণত করলেই চলবে।' একটু বিরতি নিল সে। 'তবে আগে একটা কথা বলুন আমাকে, নরম্যান কি আসলেই দৃঢ়খী ছিল?'

নড় করলেন ক্লেইবর্ন। 'আমার জীবনে এর চাইতে দৃঢ়খী কাউকে দেখিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিত্রনাট্যটা হাতে তুলে নিল রয় অ্যামেস। 'কাজে লেগে পড়ি। কোথাও আটকে না গেলে, কালকের মাঝে কয়েক পাতা দিতে পারব মনে হয়।'

'আটকে গেলে ফোন দিও,' দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন। 'আমি এখন যাই।'

অফিস থেকে বেরিয়ে হলে আসতে আসতে একটা স্তুরি নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। গতরাতের পর এই প্রথম তিনি আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। অন্তত তার একটা কাজ তো শেষ হয়েছে, চিত্রনাট্যটার অনেক উন্নতি হবে এখন। রয় অ্যামেসের বন্ধুত্বও হারাতে হবে না, যেমন ভাবে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন নরম্যানের বন্ধুত্ব।

একবার...একবার সামনা সামনি বসে কথা বলতে পারলে, সব কিছু সহজ হয়ে আসত। চিত্রনাট্যটার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলতে পারতেন তিনি। বলতে পারতেন, ভয় পাবার বা চলচিত্রটাকে ঘৃণা করার কোনও কারণ নেই। হয়তো...হয়তো...নরম্যানকে শান্ত করতে পারবেন তিনি।

তবে সেজন্য আগে তাকে খুঁজে তো পেতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে লোকটাকে? খড়ের গাদায় সুই খুঁজে পাওয়াটাও এর চাইতে সোজা হবে। তবে...

আচমকা বুদ্ধিটা এল তার মাথায়। খড়ের গাদা থেকে সুই বের করতে হলে, গাদায় খুঁজে সময় নষ্ট করার তো কোনও দরকার নেই। দরকার কেবল একটা চুম্বক নিয়ে আসা। সেটাই সুইটাকে নিজের দিয়ে টেনে নিয়ে আসবে। স্টুডিও স্ট্রিটে দাঁড়াবার সাথে সাথে ক্লেইবর্ন বুঝতে পারলেন, এ ক্ষেত্রে এই স্টুডিওটাই হলো সেই চুম্বক। যেটা নরম্যানকে তার দিকে টেনে নিয়ে আসবে।

খোঁজাখুঁজির কোনও দরকার নেই। নরম্যান নিজে থেকেই স্টুডিওতে আসবে। এখন পর্যন্ত কিছু ঘটেনি, কারণ সে স্টুডিওতে এসে পৌঁছাতে দেরি করেছে। তবে এখন যেহেতু এসে পড়েছে, দ্রুতই ঘটতে থাকবে সব ঘটনা। সদর দরজার দিকে চলে গেল ক্লেইবর্নের দৃষ্টি। গার্ড লোকটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ির আসা-যাওয়ার দিকে কড়া নজর রাখছে। অবশ্য স্টুডিওতে প্রবেশ করার পথ আছে আরও অনেকগুলো। ওগুলোও একইরকমভাবে প্রহরা দেয়া হয়।

তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। নরম্যান কোনও দরজা দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টাও করবে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে পার্কিং লটের দিকে রওনা দিলেন ক্লেইবর্ন। যেতে যেতে স্টুডিও'র দেয়ালের দিকে নজর পড়ল।

নিরেট পাথরের তৈরি দেয়ালগুলো পুরু আর অনেক উঁচু। অবশ্য পুরুত্বে কিছু যায় আসে না, নরম্যান তো আর দেয়ালে ফুটো করে ভেতরে ঢুকবে না। আর দড়ি বা মই ব্যবহার করলে, উঁচু দেয়াল পার হওয়াও কোনও ব্যাপার না। অন্ধকারে যে কেউ অন্য কারও নজরে না পড়েই কাজটা করতে পারবে। আর একবার দেয়ালের উপরে উঠতে পারলে, সাবধানে নিচে নামাটা তো একেবারে ছেলের হাতের মোয়া। এরপর স্টুডিও'র ভেতরে কোথাও লুকিয়ে থাকলেই হলো।

এবার তার নজর গিয়ে পড়ল সারি বেঁধে থাকা কংক্রিটের অফিস, গ্যারাজ, ওয়ার্ড্রোব আর মেকাপ-এর জায়গাগুলো। দালানগুলোর সাথে লাগানো আছে ট্রাক, ট্রেলার আর সেমি গুলো। তারও পরে রয়েছে বিশাল সাউন্ড স্টেজ আর প্রযোজনীয় যন্ত্রপাতি। পার্কিং লটে যাবার পথে, এক জায়গায় ডানে মোড় নেয়া মাত্র দেখতে পান, ওখানে অনেকগুলো পরিত্যক্ত সেট ফেলে রাখা। ওয়েস্টার্ন ছবির বার, সদর রাস্তা, আস্তাবল, হোটেল, ব্যাঙ্ক, শেরিফের অফিস, ইত্যাদি। তার পেছনে সাদা রঙের অনেকগুলো বাড়ি। ওগুলোরও পেছনে বড় শহরের রাস্তা আর দুইপাশে অগণিত দোকান পাট। লুকাতে চাইলে, হাজারও জায়গা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

একবার দেয়াল টপকাতে পারলে, নরম্যানের কাজ হবে কেবল ক্ষণে ক্ষণে লুকাবার জায়গা পরিবর্তন করা। তাহলেই হবে, পুলিশ হাজার খুঁজেও ওকে পাবে না। আর কে বলতে পারে! ওসব সাদা বাড়ির কোনও একটায় হয়তো গত রাত কাটিয়েছে নরম্যান!

ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি, নিজেকে বোঝালেন ক্লেইবর্ন। এখন আমি ভয় পেলে, আমার দেখাদেখি অন্যান্যরাও ভয় পেয়ে যাবে। বলার মতো কিছু না পেলে, এ ব্যাপারে মুখ খোলাই উচিত হবে না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো পথে চলতে শুরু করলেন তিনি, সাউন্ড স্টেজের কাছে এসে থামলেন। বা দিকের সাত নাস্তার টেজটার দরজা এখনও খোলা। অনেকটা কৌতুহলী হয়েই, দরজা দিকে উকি দিলেন তিনি।

হালকা আলোয়, ভেতরের দলা পাকিয়ে পড়ে থাকা তারগুলোকে সাপ বলে মনে হচ্ছিল। এছাড়া ভেতরের দিকটায় ঘন, কালো অন্ধকার ছেয়ে আছে। ভেতরে প্রবেশ করলেন ডা. ক্লেইবর্ন, চোখ দুটোকে সয়ে আসার জন্য একটু সময় দিলেন। এর আগে, চলচ্চিত্রের ব্যাপারে বানানো চলচ্চিত্র ছাড়া এসব কখনও দেখেননি তিনি।

চোখে অন্ধকার সয়ে এলে, গোলাকার ছাদটা তার নজরে পড়ল। বিশাল এই স্টেজটা যে আসলে কতোটা বিশাল, তা আজকের আগে উপলব্ধি করতে পারেননি। তার মনে হচ্ছিল, জায়গাটা যেন কোনও বিশাল উপাসনালয়, অন্ধকারের কোনও দেবতাকে অর্ঘ্য দেবার জন্য বানানো হয়েছে এটাকে। তবে পুরো এলাকাটা অন্ধকার না। হালকা একটা আলো দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে একটা কর্ড থেকে ঝুলছে সেটা। যে এলাকায় আলো ফেলছে, সেটা অন্যান্য দেয়ালের কারণে দেখা যাচ্ছে না। ক্লেইবর্ন এগিয়ে গেলেন, ডান পাশে দেখতে পেলেন অনেকগুলো ভাম্যমান ড্রেসিং রুম। দরজাগুলো বন্ধ, ওগুলোর নীচ থেকেও কোনও আলো আসছে না।

লুকাবার হাজারও জায়গা আছে এখানে! একদম কাছের ড্রেসিং রুমের দিকে এগোলেন তিনি। কিন্তু দরজার কাছে যাওয়ামাত্র গতি করে গেল। যদি তার ধারনা সত্যি হয়? আসলেই যদি নরম্যান ওসব দরজার কোনও একটার ওপাশে লুকিয়ে থাকে? ইত্তেব্তু করলেন তিনি।

অপেক্ষা কীসের? কীসের এতো ভয়? নরম্যানকে ধরার জন্যই তো এখানে এসেছ, নাকি? তাহলে কাজে নেমে পড়।

আন্তে আন্তে দরজার সামনের কাঠের সিঁড়িটার সবচেয়ে নিচের ধাপে পা রাখলেন ক্লেইবর্ন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নরম্যান যদি এখানে থেকেও থাকে, তাহলে অবশ্যই খুব আতঙ্কিত হয়ে আছে।

ঠিক তার নিজের মতো!

নরম্যান যখন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, তখন আর তার আচরণ স্থাভাবিক থাকে না। বুনো জন্ম হয়ে যায় সে!

তবে ভয়ের কিছু নেই, লোকটা নেই এখানে। হাজার হাজার লুকাবার জায়গা থাকতে সে এখানে এসেই বা কেন লুকাবে?

দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ক্লেইবর্ন, ঠিক তখনই শুনতে পেলেন আওয়াজটা। একদম হালকা আওয়াজ। কেমন যেন ঘষ ঘষ শব্দ। সেই সাথে একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ। কিন্তু আওয়াজটা দরজার ওপাশ থেকে আসেনি। এসেছে আলোকিত জায়গাটা থেকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে, নিচে নেমে এলেন ক্লেইবর্ন।

আওয়াজটা হবার প্রায় সাথে সাথেই আবার নেমে এসেছে নীরবতা। কেবল মাত্র তার নিজের পায়ের আওয়াজটাই শোনা যাচ্ছে। তবে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে তিনি এগোছেন বলে, সেই আওয়াজটাও হচ্ছে থেকে থেকে।

যেখানে ছাদ থেকে বাতিটা ঝুলছিল, সেটার পাশে চলে এলেন তিনি। একটু থমকে দাঁড়িয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে উঠি দিলেন। আলোর নিচে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সেটটা একদম খালি বলে মনে হচ্ছে।

আন্তে আন্তে সামনে এগোতে শুরু করলেন তিনি। সামনেই একটা চতুর্ভুজাকৃতি ঘর। ওখানে ঢোকা মাত্র যেন ভিন্ন এক পৃথিবীতে চলে এলেন তিনি। পায়ের নিচে কার্পেট দেখা গেল। পুরাতন আর বিবর্ণ, কিন্তু কার্পেট তো বটে। পুরনো দিনের বাড়িগুলোতে এগুলো ব্যাবহার করা হয়। এই মুহূর্তে অমন কোনও পুরনো বাড়িতে আছেন বলেই মনে হচ্ছে তার। যেখানে সময় থমকে গিয়েছে।

পুরাতন দ্রেসার আর তার ওপরে রাখা জিনিসগুলোর দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। সবগুলোই পুরনো। একটা গিল্টি করা ঘড়ি, পিন-কুশন, ছোট আয়না, সেন্টের বোতল। জিনিসগুলো আর সেই সাথে একটা খোলা ক্লজিট থেকে ঝুলতে থাকা পোশাক তাকে জানান দিল, এক মহিলার শোবার ঘরে আছেন তিনি। এর জন্য খাটটা দেখারও প্রয়োজন পড়ল না।

ডান দিকের কোনায় পাতা হয়েছে খাটটা। পাশেই রাখা আছে একটা উঁচু রাকিং চেয়ার। সামনে এগোলেন তিনি। বিছানার চাদর, জানালার পর্দা এসব দেখছেন। দক্ষ হাতে এম্ব্ৰয়ডারি করা হয়েছে ওগুলোতে। তবে কাছে এসে বুৰতে পারলেন, বিছানার চাদর অপৃত হাতে জাজিমের নিচে গুঁজে রাখা। চাদর ভেদ করে বালিশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কেন যেন নিচু হয়ে চাদরটা সরিয়ে দিলেন তিনি। বালিশের উপর বাদামী চুল দেখা গেল। মাঝাখানের নিচু হয়ে থাকা অংশটা জানাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগেই এখানে কেড শুয়েছিল। তবে গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ এই বালিশ মাথার স্পর্শ পেয়েছে।

ক্লেইবর্ন বুৰতে পারছেন, ঠিক কোথায় আছেন তিনি। আগে কখনও জায়গাটা দেখেননি, কিন্তু এতোবাৰ এৱ কথা শুনেছেন...এতোবাৰ কাগজে পড়েছেন যে চিনতে বিন্দুমাত্ৰ কষ্ট হচ্ছে না।

এই জায়গাটা নৱম্যানের মায়ের শোবার ঘর!

এখানেই নৱম্যান মমি কৰে রেখেছিল মিসেস বেটসের লাশটাকে। অনেক অনেক বছৰ পড়ে ছিল ওই বিছানায়। অথচ বাইরের দুনিয়া জানত, মহিলা জীবিত। পঞ্চ, হাঁটতে চলতে পারে না, একটু পাগলাটো। কিন্তু জীবিত।

নাহ, কী সব যে ভাবছেন! এটা তো সেই ঘর না। এই ঘর আসলে সেই ঘরের আদলে বানানো একটা সেট মাত্ৰ।

ক্লেইবর্ন চাদরটা স্পর্শ কৰলেন, বালিশের গর্তটা ঢেকে দিলেন সুন্দৰ কৰে। কিন্তু কাজটা কৰতে গিয়ে, ধোঁয়ায় তার গা শিহরিয়ে উঠল। এৱকম একটা বালিশেই শুয়ে থাকত মিসেস বেটসের লাশ। একটা চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার মনে। মাত্র কয়েক মিনিট এই নকল সেটে কাটিয়েই যখন তার এই অবস্থা, তখন বছৰের পৰ বছৰ আসল বাড়িটায় নৱম্যান থেকেছে কী কৰে? রাতে নিশ্চয় আসল শোবার ঘরে বসে একটা মমিকে উদ্দেশ্য কৰে কথা বলেছে সে।

মমি...মামি...মামি...

আবার শব্দটা শুনতে পেলেন ক্লেইবর্ন। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, সেই সাথে যেন নড়ে উঠল ছায়াগুলোও। বড়-সড় রকিং চেয়ারটা থেকে আসছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা। জানালার দিকে মুখ করা আছে বলে, ওতে কেউ বসে আছে কিনা তা এতোক্ষণ বোবা যাচ্ছিল না।

আর ঘষ ঘষ শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে, রকিং চেয়ার থেকে মহিলাটার উঠে দাঁড়ানোয়। বাতাসে যেমন প্রেজ্ঞা নিঃশব্দে ভাসে, তেমনি নিরবে ক্লেইবর্নের দিকে এগিয়ে এল সে। অন্ধকার থেকে আলোর নিচে চলে এল, ধূসর চুলগুলো উড়ছে, মুখটা শয়তানী হাসিতে ভর্তি। হাত দুটো উঁচু হয়ে আছে। মাথা স্পর্শ করে, উইগ খুলে আনল একটা হাত।

ক্লেইবর্ন টের পেলেন, হাস্যরত একটা চেহারা তার দিয়ে তাকিয়ে আছে। বড় পর্দায় অগণিত বার এই চেহারাটা দেখেছেন তিনি।

পল মরগ্যানের চেহারা।



একুশ

টেল অফ দ্য ক্লক বারে, মরগানের সাথে বসে আছেন ক্লেইবর্ন। হাতে এখনও ধরে আছেন একটা বিয়ার। এদিকে মরগ্যান দ্বিতীয় দফা ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে বসেছে। এই মুহূর্তে অভিনেতার পরমে রয়েছে চামড়ার সাথে এঁটে বসা জিন্স, ইংরেজি ভি আকৃতিতে কাটা শার্টে গলার ফাঁক দিয়ে উকি দিচ্ছে সোনার একটা লকেট। একটু আগে দেখা কুঁজো হয়ে থাকা বৃন্দার সাথে বিন্দুমাত্র মিল নেই!

‘ক্ষমা চাই,’ বলল পল। ‘আপনাকে ওভাবে ভয় পাইয়ে দেয়ার কোনও ইচ্ছাই আমার ছিল না।’

‘বাদ দিন তো। এতো বার ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু হয়নি।’ নড়ে চড়ে বসলেন ক্লেইবর্ন। ‘আসলে আমার-ই ওখানে যাওয়াটা উচিত হয়নি।’

‘আমারও ওখানে যাবার কথা ছিল না।’ বারটেভার সামনে মদের গ্লাস রেখে দিলে, সেদিকে হাত বাড়াল পল মরগ্যান। ‘ভিজিনি বলেছিল বলেই না গিয়েছিলাম।’

‘ভিজিনি মানে...পরিচালক?’

‘হ্যা। আমি এধরনের চরিত্রে অভিনয় করে অভ্যন্ত নই। তাই সে চাচ্ছিল, আমার মেয়েদের পোশাক পরা দৃশ্যগুলো যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়। শুধু জামা পরাই যথেষ্ট না; কথা বলার ভঙিমা, চলার ধরন-সবকিছু একদম আসলের মতো হওয়া চাই। ভাবলাম, সেটে গিয়ে একবার দেখলে কেমন হয়? হয়তো পুরো ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে যাবে।’

দুষ্টামির হাসি হাসলেন ক্লেইবর্ন। ‘আমাকে ঠিক বিশ্বাস করাতে পেরেছেন।’

তার কথার প্রতি সম্মান জানিয়ে গ্লাসটা উচুঁ করে ধরল মরগ্যান, খুশি হয়েছে। কিন্তু আমার মনের কথা যদি জানতে পারে, তাহলে এই খুশি হাওয়ায় উড়ে যাবে-মনে মনে ভাবলেন ক্লেইবর্ন। আসলেই মরগ্যানকে বৃন্দার পোশাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল, কিন্তু নরম্যান চরিট্রা একেবারেই আলাদা। মেকাপ ছাড়াও, লোকটাকে সবাই খুব সহজে চিনে ফেলতে পারবে।

যেন ক্লেইবর্নের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই, অন্য একটা টেবিল থেকে এক মেয়ে উঠে এল। আরও দুজন বান্দবীকে সাথে নিয়ে বসেছিল মেয়েটা। সুদর্শনা, কালচে লাল চুলের মেয়েটার পোশাক তার উঠতি ঘোরনকে আড়াল করতে পারেনি। সম্ভবত সদ্য ঘোলতে পা দেয়া এক তরংণী সে, দেহ থেকে এখনও ‘বাচ্চা-বাচ্চা গন্দটা পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

‘এক্সাকিউজ মি,’ ক্লেইবর্নকে পুরোপুরি অগ্রহ্য করে, পলের দিকে তাকিয়ে বলল সে, ‘আপনি কি পল মরগ্যান?’

গ্লাস নামিয়ে রেখে নিজের ট্রেডমার্ক হাসিটা হাসল অভিনেতা। ‘কী মনে হয়?’

মাথা নীচু করে কম্পিত হাতে একটা ছোট বই আর একটা বল পয়েন্ট কলম বের করে আনল মেয়েটা। কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল কষ্ট, ‘কিছু মনে না করলে, আপনার অটোগ্রাফটা পেতে পারিঃ?’

মেয়েটা ব্রাউজের সামনে দিকে হিঁসে হলো মরগ্যানের দৃষ্টি। ‘শুধু অটোগ্রাফ কেন, চাইলে আমার সবকিছুই নিতে পারো।’

লজ্জায় লাল হয়ে গেল মেয়েটা।

‘আরে আরে,’ ওকে শান্ত করার প্রয়াস পেল পল। ‘আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। বাড়ি কোথায় তোমার?’

কাজ হলো। স্মিত হেসে মেয়েটা উত্তর দিল, ‘টলেডো। আমরা এখানে টুয়েরে এসেছি।’ এরপর বান্ধবীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘ওরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, সেজন্যই এখানে এসেছি।’

‘কোনও সমস্যা নেই।’ অটোগ্রাফের খাতাটা টেনে নিয়ে নিল অভিনেতা। ‘নাম কী তোমার?’

‘জ্যাকি। জ্যাকি শেরবর্ন।’

‘বানানটা বলবে?’

বলল মেয়েটা। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মরগ্যান কিছু একটা লিখল। ‘এতেই হবে।’ খাতাটা বন্ধ করে কলমসহ ফিরিয়ে দিল।

‘ধন্যবাদ,’ বলল মেয়েটা। ‘অনেক অনেক ধন্যবাদ।’

মেয়েটা চলে যাওয়া মাত্র মরগ্যান আবার তার গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিল। ক্লেইবর্ন দেখলেন, মেয়েটা তার বান্ধবীদের নিয়ে এক্সিটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্লাসে চুমুক দিল মরগ্যান। ‘কোনও সমস্যা?’ জানতে চাইল সে।

শাঙ্গ করে না বোঝাল ক্লেইবর্ন। তবে কথাটা মিথ্যা, কেননা সমস্যা আছে তার। অভিনেতা এইমাত্র অটোগ্রাফ খাতায় কী লিখেছে তা দেখেছেন তিনি। জ্যাকি শেরবর্নকে, মুখটা সে খুব ভালোই ব্যবহার করতে পারে।

দ্ব্যর্থবোধক বাক্য, একবার ভাবল পলকে বলেই দেয়। এখন না, পরে কখনও হবে। এখন তার মিত্র দরকার। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বললেন, ‘চিনাট্যটা-’

‘একদম বাজে।’ মরগ্যান বলল। ‘অ্যামেস কী করতে চাইছে, তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারেছি। মেয়েটার জন্য ভালো ভালো দৃশ্য লিখেছে। কিন্তু ঠিকমতো অভিনয় করতে পারবে না সে। ড্রিসকল যে কী খেয়ে ওকে বেছে নিল, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি।’

‘যতদূর বুঝলাম, এরজন্য পরিচালক দায়ী।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘একদম মেরি ক্রেনের মতো দেখতে কিন্তু। সম্ভবত বাস্তবতা আনতে চেয়েছে চলচিত্রে।’

‘তাহলে আমাকে কেন এক সমকামীর চরিত্রের জন্য বেছে নেয়া হলো?’

‘সমকামী না, ট্রান্সভেস্টাইট।’

‘কিন্তু নরম্যান ভাবে, সে আসলে তার মা-’

‘এর সাথে সমকামিতার সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই।’

‘তাহলে কীসের সাথে সম্পর্ক আছে?’ জ্ঞ কুঁচকে তাকাল মরগ্যান। ‘ডাক্তারি কথা-বার্তা বাদ দিয়ে সরাসরি বলুন। নরম্যান আসলে কেমন ছিল? কী ছিল?’

শ্রাগ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘আপনার বা আমার মতোই আরেকজন মানুষ।’ বললেন তিনি। যদি আমার বা আপনার কাছ থেকে নিজের নাম কেড়ে নেয়া হয়, পরিচিতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় শুধু একটা নাম্বার, সেল নামের একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হয়, চারপাশে তাকে কেবল অসুস্থ্রতা আর সমস্যা-’

‘ওসব আমি জানি।’ ন্যূ কঠে বলল পল মরগ্যান। ‘আমি পাগলা গারদে গিয়েছিলাম।’

ক্লেইবর্নের চোখের অবাক দৃষ্টিটা তার নজর এড়াল না। ‘ভুল বুঝবেন না। আমি পাগল হয়ে পাগলা গারদে যাইনি। ইচ্ছা করেই গিয়েছিলাম। এক মাস ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল দেহ থেকে সব মাদক বের করে দেয়া, নেশার উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া।’ গ্লাস তুলে নিয়ে এক চুমুকে ভেতরের তরলটুকু শেষ করে ফেলল অভিনেতা। ‘কাজ হয়নি। সত্যি বলতে কী, এরপর প্রায় দেড় বছর আমি কোনও কাজ-ই করিনি। আমাদের এই ব্যবসায়, এতোদিন কাজ না করে বসে থাকলে বিস্মিতির আড়ালে হারিয়ে যেতে হয়।’

‘কিন্তু ভিজিনি তো বিশেষ করে আপনাকে-ই চেয়েছিল।’

‘আমাকে না, আমার নামকে চেয়েছিল। পানির দামে পেয়েছেও। একমাত্র এই কারণেই ড্রিসকল আমার সাথে চুক্তি করতে রাজি হয়েছে। এমনকি আমার মুখের উপরেই বলেছে কথাটা।’ খালি গ্লাসটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল মরগ্যান। ‘হারামজাদা আমার উপর চাপ দিয়েই চলছে, ভাবছে আমাকে দিয়ে যা মন চায় তা-ই করাতে পারবে। কিন্তু স্টেজে যদি আপনার জায়গায় বেয়াদবটা থাকত-’ কী বলছে তা বুঝতে পেরে আচমকা চুপ করে গেল সে। ‘বাদ দিন, চলুন আরেক দফা হয়ে যাক।’

বাবের টুল থেকে নেমে গেলেন ক্লেইবর্ন, মাথা নাড়েছেন। ‘আজ আর না, মোটেলে ফেরা দরকার।’ একটু ইত্তেক করে জানতে চাইলেন। ‘আপনি ঠিক আছেন তো?’

নড় করল মরগ্যান। ‘অনুভূতিগুলো বের করে দেয়ার দরকার ছিল। এখন ঠিক আছি। আমি জানি, মরগ্যানের চরিত্রে আমি অভিনয় করতে পারব।’ অর্থ-বোধক হাসি হাসল সে। ‘ভুলে যাবেন না, আমি পল মরগ্যান।’

মোটেলে ফিরে যেতে যেতে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল ক্লেইবর্নের। পল মরগ্যানকে মেয়েদের পোশাক পরা অবস্থায় স্টেজে দেখার সূতিটা এখনও তার ভেতরে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে। সেই সাথে অটোগ্রাফ শিকারী মেয়েটার সাথে করা অযথা বাজে ব্যবহার...ড্রিসকলের ব্যাপারে কথা বলার সময় তার কঠের সুর...মোটেলে পৌঁছাবার সময় আচমকা প্রশ্নটা জেগে উঠল তার মনেঃ আসল পল মরগ্যান মানুষটা কেমন?

৬৩



বাইশ

প্রায় সাতটার দিকে ওভেনের দরজাগুলো রোস্টের অবস্থা দেখে নিল জ্যান। দরজা খোলা মাত্র জ্ঞ কুঁচকে ভেতরে তাকাল সে। এখনও রান্না শেষ হয়নি। দরজা আবার বন্ধ করে ওভেনের তাপমাত্রা বাড়িয়ে চারশ করে দিল। মিনিট পনেরো লাগতে পারে, সেই সুযোগে সালাদটা বানিয়ে ফেলব-ভাবল জ্যান। কপাল ভালো থাকলে হয়তো লোকটা আসতে দেরি করবে। রাস্তাও চেনে না।

তবে লেটুস্টা হাতে নিয়ে গাড়ির আওয়াজ শোনার জন্য কান খাড়া করে রইল সে। শুনতে পেল শুধু এক নাইট বার্ডের গান। কনি এখনও অ্যাপার্টমেন্টেই আছে, বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিছে। আশা করা যায়, লোকটা আসার আগেই বেরিয়ে পড়বে। তেল আর ভিনেগারের মিশ্রণ ঢেলে সালাদ বানানো শেষ করল জ্যান। রোস্ট হয়েছে কিনা সেই খোঁজ নেবার সময় হয়েছে। ওভেন বন্ধ করে, মাংসের অবস্থাটা দেখল। আরেকটু বাদামী হলেই, খাবার জন্য তৈরি হয়ে যাবে ওটা। হাঁটা বুবাতে পারল, নাইটবার্ডের গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাড়ির আওয়াজ শোনেনি, কিন্তু এখন দরজার চাইমগুলো টুংটাং আওয়াজ করছে। সেই সাথে গলার আওয়াজও ভেসে এল।

হারামজাদী কনি দরজা খুলেছে! অথচ বারবার করে ওকে বলে দিয়েছিল জ্যান, দরজাটা ও-ই খুলবে। ঝামেলা হয়ে গেল। এখন আর নতুন করে সাজার সময় নেই।

কোনওরকমে অ্যাপ্রনটা খুলে পেছনের চেয়ারে ছুঁড়ে দিল সে, হাত দিয়ে চুল গোছাবার চেষ্টা করল। রান্নাঘরে একটা আয়না রাখার কথা কেন ভাবল না সে? অন্তত আজকের মতো জরুরী অবস্থায় খুব কাজে আসত। তাড়াতাড়ি কাউন্টারের উপরে রাখা টিস্যু বক্স থেকে একটা টিস্যু তুলে নিল সে, কপাল আর চেহারায় ছোঁয়াল। অন্তত ঘর্মাঙ্গ নাকে তো আর লোকটার সামনে যেতে হবে না। আর তাছাড়া, ডাইনিং রুমের টেবিলে মোমবাতি জ্বালাবার পর, মেকাপের অভাবটা সে বুঝতেও পারবে না।

জ্যানের পরিকল্পনার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এই ডিনার। হালকা কথাবার্তার মাঝ দিয়ে অ্যামেস আর ক্লেইবন্স সকালে কী সিদ্ধান্ত নিল, তা জেনে নিতে চায়।

সব দোষ রয়ে-চলচিত্রটা বন্ধ করে দেবার বুদ্ধিটা যে কোথেকে তার মাথায় এল! যদি সকালে সে ক্লেইবন্সকে উচ্চা-পাল্টা বোঝায়, তাহলে এখন জ্যান তাকে

সোজা পথে নিয়ে আসবে। মোমবাতির আলোতে ডিনার, হালকা পাতলা
মদ্যপান, সালাদ, রোস্ট আর তারপর?

যা দরকার হবে তা-ই!

জ্যান রান্নাঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে, গলার আওয়াজ প্রায় অক্ষুট হয়ে
এল। সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ শুনতে পেয়ে সে বুঝতে পারল, কনি
বিদায় নিয়েছে।

দরজার গোবরাটে দাঁড়িয়ে, আরেকবার চুল ঠিক করে নিল জ্যান।

ঠিক আছে, বাছা। কাজে লেগে পড়।

আসলে শো-বিজনেসের ব্যাপারটাই তেমন। সবাই...একদম সবাই স্টেজে
নামার আগে অঙ্গুষ্ঠিতে ভোগে। অ্যাল জলসনের ব্যাপারে এমন কথা অনেকবার
শুনেছে। আসলে অভিনেতা যেখানকারেই হোক না কেউ-চলচ্চিত্র, টেলিভিশন
বা মঞ্চ নাটক, সবাই ভয় পায়। কিন্তু একবার যখন পরিচালক চিঢ়কার করে ওঠে,
'অ্যাকশন।' তখন আর সেই ভয়ের কথা কারও মনে থাকে না।

শো-বিজের কোনও তুলনা হয় না। দুনিয়ার সেরা নেশা এটাই।

জ্যান অনেক কিছু ভেবে চিন্তেই আজকের ডিনারের পরিকল্পনাটা করেছে।
কিন্তু ডা. ক্লেইবর্নের সঙ্গ ভালো লাগবে, এটা ওর পরিকল্পনায় ছিল না। প্রথম
দেখায় আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। ভরাট গলার পুরুষদের ওর ভালোই লাগে।
তবে ওর চেনা প্রায় সব অভিনেতার মাঝেই এই বৈশিষ্ট্য আছে। ক্লেইবর্নকে
আলাদা করেছে তার ন্যূ স্বভাব। লোকটার মাঝে আত্মাভিমান বলতে যেন কিছুই
নেই। চুপচাপ, শান্ত আর ন্যূভাবে কথা শুনছে ডাক্তার। নিজের ব্যাপারে কোনও
কথাই বলছে না।

ডিনারের সময় এমনসব প্রসঙ্গে লোকটা ওর প্রশংসা করল, যেগুলোর ব্যাপারে
প্রশংসা আশাই করেনি জ্যান। অ্যাপার্টমেন্টের সাজানো-গোছানো পরিবেশ,
মোমবাতি, টেবিল সাজানো এসবের খুব প্রশংসা করলেন তিনি। এমনকী কনির
প্রসঙ্গেও কথা বললেন, 'তোমার বান্ধবীও কি অভিনয় করে?' নড করল জ্যান।

'বিশ্বাস করা কঠিন। দেখে তো খুব গভীর বলে মনে হয়! কোন ধরনের চরিত্রে
অভিনয় করে সে?'

'আসলে কোনও চরিত্রে অভিনয় করে না, হাত-পা এগুলো ভাড়া দেয়।'

'মানে? বুঝতে পারলাম না।'

'কনি সবসময় কাজ করে। অগণিত টিভি বিজ্ঞাপন বা ফিল্মের অভিনয়
করেছে। তবে আপনি ওকে চিনতে পারেননি, কারণ কখনও ওর চেহারা দেখা
যায় না। এমন অনেক অভিনেত্রী আছে, যাদের হাত বা পা দেখতে ভালো না।
দেহের ওসব জায়গার ক্লোজ-আপ-এ ব্যবহার করা হয় ওকে।'

‘শুনে তো মনে হচ্ছে, পরিচালকরা সুপারমার্কেট থেকে মুরগীর কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো অভিনেত্রীদের দেহের অংশ বেছে নেয়!’ মুচকি হাসলেন ক্লেইবর্ন। ‘মেয়েটার লাজুক স্বভাবের কারণ এখন বুঝতে পারলাম। নিজেকে নিশ্চয় ওর খুব ছোট মনে হয়। জানে, ওর দেহ দেখিয়ে অন্য কেউ প্রশংসা পাবে। অথচ ও পাবে না, সবার অগোচরে থাকবে।’

‘ঠিক বলেছেন।’

‘অন্তত তোমার সেই সমস্যা হবে না।’

‘কথাটা আমি কীভাবে নেব? প্রশংসা না অ্যানালাইসিস?’

প্লেটটা সরিয়ে দিলেন ক্লেইবর্ন, হাত বাড়ালেন কফি কাপের দিকে। ‘কোনটা হলে তুমি খুশী হবে?’

‘এই ব্যবসার মেয়েরা যথেষ্ট প্রশংসা পায়। কিন্তু অ্যানালাইসিস পেতে হলে, অনেক বিখ্যাত হতে হয়।’

ক্লেইবর্ন চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলেন। ‘হতে পারে।’

‘কি অ্যানালাইসিসের প্রভাব দিচ্ছেন নাকি?’

‘তা না। আসলে তোমার সম্পর্কে আরও জানা থাকলে, আমি তা করতেও পারব না।’

‘কী জানতে চান, জিজ্ঞাসা করে দেখুন।’

‘ঠিক আছে। প্রথমে একটা গৃহৰ্ষণ ধারনা বলিঃ অধিকাংশ অভিনেত্রীর পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ভেঙে যাওয়া পরিবার। যে পরিবারের হয় বাবা মারা গেছেন, নয়তো মা-বাবার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে অথবা ছেটবেলায় বাবা, মা-মেয়েকে ফেলে চলে গেছে। তারপর থেকে মা তার মেয়েকে ব্যবহার করে, পুতুলের মতো নাচিয়ে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হাসিল করে নিতে চায়। তাই মা মেয়েকে পাদ-প্রদীপের নিচে ঠেলে দেয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রাখে নিজের হাতে। ঠিক?’

‘হ্যাঁ,’ জ্যান বিড়বিড় করে বলল।

‘দ্বিতীয় দলের অভিনেত্রীদের পরিবারের অবস্থা একটু ভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে। এদেরও বাবা নেই, আর মা থেকেও নেই। হয় মারা গিয়েছেন, নতুবা মানসিক বিকারহস্ত। মেয়েটি অনাথ। ফস্টার-হোমে কোনও নিরাপত্তা না পেয়ে, এদের বেশিরভাগ অল্প বয়েসে বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় না। তাই সে ক্ষমতাবান লোক খুঁজে বেড়ায়। ক্ষমতাবান লোকরা তাকে ব্যবহার করে, সে-ও তাদের ব্যবহার করে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে নেয়।’

‘মেরিলিন মনরোর মতো,’ নড় করল জ্যান। ‘এই দলের মেয়েদের সঙ্গেও পরিচয় আছে আমার।’

‘ভালো,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘তাহলে এবার প্রশ্নে আসি। তুমি কোন দলে?’

‘আপনি অনুমান করতে পারছেন না?’

জ্যানের হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন ক্লেইবর্ন। ‘আমার পর্যবেক্ষণ বলে দ্বিতীয় দলের।’

‘এক মিনিট! আপনি ভাবছেন, আমি মাদকাসক্ত, আত্মহত্যা প্রবণ কেউ?’

মাথা নাড়লেন ক্লেইবর্ন। ‘অবশ্যই না। ওগুলো তো পরের উপসর্গ। আমি বলতে চাইছি, তুমি যদি সমস্যাটা বুঝতে পার, তাহলে পরিস্থিতি অন্তর্দৃ যাবেই না।’

‘এসব মন খারাপ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করছি কেন আমরা?’ জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল জ্যান। জানে, ওর নিজের দোষেই হাত থেকে নাটাই ছুটে গেছে। নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে। নিজের পরিকল্পনায় অবিচল থাকতে ওকে। স্ক্রিপ্টটা... ‘আমার সমস্যা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। বাদ দিন ওসব। সকালটা রয়ের সঙ্গে কেমন কাটল?’

‘বেশ ভালো। স্ক্রিপ্টে যেসব পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়েছি, ছেলেটা মনে হয় সেগুলো মেনে নিয়েছে।’

‘কী ধরনের পরিবর্তন?’

‘আমি মূলত নরম্যানের চরিত্রটাকে কীভাবে উপস্থাপন করা উচিত, সে-ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছি। ও এখন নরম্যানের চরিত্রায়ন নিয়েই কাজ করছে।’

‘আমার দৃশ্যগুলোর কী অবস্থা?’

‘আমার মনে হয় না ওগুলোতে খুব একটা পরিবর্তন আনা দরকার আছে। তোমার সংলাপে অল্প একটু রদবদল হতে পারে। ব্যস।’

‘কেন?’

‘নরম্যানের চরিত্র বদলে গেলে, স্বাভাবিকভাবে তোমার প্রতিক্রিয়াও বদলে যাবে। সেজন্য অল্প কিছু সংলাপ ছেঁটে ফেলা হতে পারে।’

‘সংলাপ ছেঁটে ফেলা হবে?’ শক্ত হয়ে গেল জ্যানের চোখমুখ। ‘কেন? একটা কথা বলব? প্রয়োজনকে কেউ কাজ শিখাতে যায় না, পরিচালককে পরিচালনা শেখাতে যায় না, কিন্তু সবাই লেখককে লেখা শেখাতে চায়!’ ভেতর থেকে কিছু একটা সাবধান করে দিল মেয়েটাকে, শান্ত হও, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।

কিন্তু ভদ্রলোক ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন...

এদিকে মুখে পেশাদার হাসি ঝুলিয়ে ওর সামনে বসে আছেন ভদ্রলোক। ওকে বলছেন চিন্তা না করতে! নিজেকে কী ভাবেন তিনি, ওকে উপদেশ দিতে এসেছেন! কথাগুলো যেন হড়মুড় করে বেরিয়ে এল জ্যানের মুখ দিয়ে। ‘এখানে কতদিন ধরে আছেন আপনি? দুদিন, তিনদিন? এরিমাঝে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেন?’

‘না।’ দীশ্বর! লোকটাকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। আর সেই গভীর কর্ষস্থর। ‘এটা তো
একদম সহজ হিসাব! নরম্যানের চরিত্র বদলানোর অর্থ হলো তোমার সাড়া দেয়ার
ভঙ্গিটাও বদলানো।’

‘একজন ডাঙ্গারের ডায়াগনোসিস দরকার নেই আমার।’

স্তুর হয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন। কিন্তু মোটেও মজা করছে না ও। নিজেকে
বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ‘একটা কথা বলি...’

‘বলে ফেলেছ! হাসি মিলিয়ে গেছে ক্লেইবর্নের চেহারা থেকে। ‘আমি জানি কী
বলতে চাইছ তুমি। নিজের চরিত্র বাঁচাতে চাইছ।’

‘এটা শুধু একটা চরিত্র নয়, আমার ভবিষ্যৎ। আপনি বুঝতে পারছেন না?’

‘কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। কারা দেখতে চায় জানো? যারা নিজের
অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার সাহস পায় না, তারা।’ নড় করলেন তিনি।
‘তোমার কেসটা একদম...’

‘আমি কোনও কেস নই। আমি অভিনেত্রী। আর আমার অতীত সম্পর্কে কী
জানেন আপনি?’

‘জানতে পারলে আমার ভালো লাগবে।’

‘তা তো লাগবেই! আপনারা এসব শুনে বিকৃত আনন্দ পান, তাই না?
আশ্রয়হীন টিন-এজার মেয়েদের ধর্ষিতা হবার মুখরোচক গল্প আপনাদের
আনন্দময় ঘোন সুরসুরি দেয়। আশ্রয় আর প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় এর-ওর সঙ্গে
বিছানায় যাবার গল্প শুনেও আনন্দ পান।’ ক্লেইবর্নের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তার
দিকে তাকাল জ্যান। ‘আপনার জন্য খবর আছে আমার কাছে। অভিনেত্রীদের
সম্পর্কে যেসব গল্প শোনেন, তার সবই ফালতু জঞ্জাল।

জানতে চান, কেমন পরিবার থেকে এসেছি আমি? এখানে, এই নর্থ
হলিউডের এক পরিবার থেকে এসেছি আমি। আমার পরিবারের সবাই বেঁচে
আছে, নথর্জিং-এ থাকে। আমার পরিবারের কারও কখনও ডিভোর্স হয়নি।
এমনকী পরিবারের মধ্যে কখনও ঝগড়াও হয়নি। ভ্যান নুই হাই স্কুল থেকে
লেখা-পড়া শেষ করার পর সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় ড্রামা ক্লাসে ভর্তি হই। গত পাঁচ
বছর ধরে নিজের খরচ নিজেই চালাচ্ছি।

তার মানে এই না যে জায়গাটা খুব সহজ। এখানে টিকে থাকার জন্যে সংগ্রাম
করতে হয়। আর নিজের কোনও এজেন্ট, প্রযোজক বা আপনার বলা মা না
থাকলে আরও অনেক কঠিন। মাঝে মাঝে একটু বোকামি করে ফেলি। তার মানে
এই নয় যে আমি একটা বেশ্যা...’

‘হলিউড নিজে বেশ্যা,’ রায় দিলেন ক্লেইবর্ন।

নিজেকে সামলে নিল জ্যান। ‘কীভাবে?’

‘নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ না? জায়গাটা বিনোদনের রোগ বয়ে বেড়াচ্ছে। সিনেমা নিজেকে দর্শকদের কাছে বিক্রি করে, বেশ্যার মতো। সিনেমা যতভাবে সম্ভব দর্শকদের ডাকে-এসো, আমাকে ধর্ষণ করো। আমাকে চেটে পুটে খেয়ে মজা লুটো। তোমার মনোরঞ্জনের জন্যে আমি আছি’ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন ক্লেইবর্ন। ‘আমাকে ভুল বুবাবে না, বিনোদনকে খাটো করছি ন আমি। আমাদের সবাই আবেগ নিঃসরণের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন আছে বাস্তবতা থেকে পালিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলোও কল্পনার আশ্রয় নেয়ার। তবে শো শেষ হয়ে গেলেই সবাই বাস্তবতায় ফিরে আসে।

কিন্তু বিনোদন নির্মাতাদের একজন হতে গেলেই বিপদ। এই ফ্যান্টাসিগুলোতে আটকে যেতে হবে, হাতে আর কোনও বিকল্প উপায় থাকবে না। শেষমেশ সবার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাস্তবতার সাথে তাল মিলানোর সামর্থ্য হারাতে হবেই। আর যখন কারও জীবন যদি এই আবর্তে ঢুকে যায়, তাহলে ধূঃস সুনিশ্চিত।’

‘আমি কীভাবে জীবনযাপন করব, তা নিয়ে কথা বলার আপনি কে?’ উঠে দাঁড়াল জ্যান। ‘হয়তো আমার জীবনযাপনের পদ্ধতি ভালো নয়। হয়তো আমি বোকা, স্বার্থপর। হয়তো একদিন মুখ থুবড়ে পড়ব। কিন্তু আমি জানি আমি কী করছি! বিকল্প নিয়ে কথা বলতে চাইলে কাই-এর সঙ্গে দেখা করুন।’

‘কাই?’

‘আমার বোন। আমার চেয়ে আর্ট, আমার চেয়ে সুন্দরী। ভুল হলো, একসময় ছিল। ঠিক তখনই আপনার বলা কঠোর বাস্তবতা প্রবেশ করে তার জীবনে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ওর পেটে। সতেরো বছর বয়সে মা হয় ও। আঠারো বছর বয়সে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে, ওর বয়ফ্রেন্ড আর বাচ্চার সঙ্গে বনে জঙ্গলে থাকা শুরু করে। কিছুদিনের মাঝেই ওর বয়ফ্রেন্ড কপৰ্দকহীন হয়ে পড়ে। বাচ্চাটাকে ওরা অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয়। তারপর ছাড়ায়াড়ি হয়ে যায় ওদের। কাই এখন কোথায় আছে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানে! হয়তো কপাল ফিরিবে ওর। এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, যে ওকে দুচ্ছিমা করতে দিবে করবে। কাই সবচেয়ে ভালো যে কাজটা করেছে, তা হলো ক্যারিয়ার নিয়ে মাথা ঘামায়নি ও।’

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ক্লেইবর্ন। ‘নিজের সঙ্গে প্রতারণা বন্দ কর। এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আর কোনও উপায় ছিল না তোমার হাতে। সুড়ঙ্গের দুই মাথার মাঝে অনেকটা পথ থাকে। এরমাঝেই নিজের জন্য রাস্তা করে নিতে হয়।’

তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল জ্যান, জুলছে ওর চোখ দুটো। ‘আর আপনি? আপনিও তো একই কাজ করেছেন-বছরের পর বছর ধরে বইয়ে মুখ গুঁজে রেখেছেন। বাকি সবকিছুকে একপাশে সরিয়ে দিয়েছেন আজকের এই অবস্থানে আসার জন্যে। অন্যের গোলামি করছেন।’

‘ঠিক ধরেছ।’ নরম গলায় বললেন ক্লেইবর্ন। ‘কথাগুলো বলছি কারণ আমিও এই
রাস্তায় হেঁটেছি। আর আজ এমন এক জায়গায় পৌছেছি, যেখানে আমি একা। কিছু
নেই আমার। বাড়ি না, সংসার না, নেই কোনও ব্যক্তিগত জীবন। কাজপাগল হয়ে
বেঁচে থাকা কোনও জীবন নয়। আমার হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার
এখনও সুযোগ আছে। সে সুযোগ হেলায় নষ্ট করো না।’

কথাগুলো শুনছে জ্যান। রাগ করে এসেছে ওর। লোকটা হয়তো ভনিতা করছে
না, সত্যি কথাই বলছে। বেচারা। সারাটা জীবন একটা হাসপাতালে একদল পাগলের
সঙ্গে কাটিয়ে দিল। হঠাৎ করেই চিটাটা খেলে গেল ওর মাথায় - ভাবছি কতদিন ধরে
নারী দেহের স্বাদ পায় না লোকটা।

কথাটা চিটা করতেই উষ্ণ হয়ে উঠল ওর দেহ। উষ্ণতাটা ঠিক ব্যাখ্যা করতে
পারবে না। ঠিক যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, আবার সহানুভূতিও না। এ দুটোর মিলিত একটা
অনুভূতি বলা চলে। মুহূর্তেই উষ্ণ অনুভূতিটা তীব্র হয়ে উঠল। কিছু বুঝে উঠার
আগেই জ্যান দেখতে পেল, ক্লেইবর্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওর হাত দুটো। তারপর...

ডেরবেলটা বেজে উঠল।

জ্ঞান কুঁচকাল জ্যান। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

এখন আবার কে?

রয় অ্যামেস!

এমন সময়ে এসে হাজির। তার মানে হিংসা হচ্ছে তার।

‘কী চাও?’ জ্যান জিজেস করল।

ঘরের চারপাশে নজর বোলাল রয়। ‘তোমাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু তোমার
লাইন ব্যন্ত পেয়েছি।’

জ্যানের কুঁচকানো জ্ঞ আরেকটু কুঁচকে গেল। ‘সন্ধ্যার পর থেকে একবারও বাজেনি
আমার ফোন।’

টেলিফোনটার দিকে তাকাল রয়। ‘তা-ই তো দেখছি।’

রয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করল জ্যান। ‘কনি বাইরে যাবার আগে একটা ফোন
করেছিল। ও নিশ্চয়ই ফোনের রিসিভারটা হ্রক থেকে তুলে রেখেছে।’

‘তা-ই হবে হয়তো।’ ক্লেইবর্নের উদ্দেশ্যে নড় করল সে। ‘আপনাদেরই দরকার
ছিল আমার। চলুন বেরোই।’

ক্লেইবর্ন উঠে দাঁড়ালেন। ‘কোথায়?’

‘করনেটে। ড্রিসকল আমাকে ফোন করেছিল। চলুন, আমার গাড়িতে যাব।’

‘এত তাড়া কীসের?’

মুরে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল রয়। ‘কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে
সুড়িওতে।’



তেইশ

জ্যান আর ক্লেইবৰ্নকে পাশে বসিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়েছে রয়।

বুলেভার্দের বুক চিরে গাড়ি ছুটাতে সাইরেনের শব্দ শোনার জন্যে কান পেতে আছে সে। কিন্তু কোনও শব্দ আসছে না। স্টুডিওতে ঢুকে আগুনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন খুঁজে পেল না ওরা।

‘ফলস অ্যালার্ম?’ বিড়বিড় করে বললেন ক্লেইবৰ্ন।

‘অসম্ভব,’ জোর দিয়ে বলল রয়। ‘ড্রিসকল নিজে আমাকে ফোন করে বলেছে।’

তখনই ওরা খেয়াল করল, একজন গার্ডের সঙ্গে ড্রিসকল স্বয়ং হাজির হয়ে গিয়েছে।

গেট দিয়ে তাড়াভুংড়ো করে ঢোকার সময় তাকে খেয়াল করেনি ওরা। রাগী দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ড্রিসকল।

‘কোন জাহানাম থেকে এসেছে এই দুইজন?’ ঘাউ করে উঠল লোকটা।

‘জ্যানের সঙ্গে ডিনার করছিলেন ড. ক্লেইবৰ্ন,’ রয় জবাব দিল। ‘এই পরিস্থিতিতে, আমি ভেবেছিলাম, তাদের জানা উচিত...’

‘পরিস্থিতি চুলোয় যাক!’ রয়ের সঙ্গীদের দিকে ঘুরল সে। ‘চলে যখন এসেছেন, কিছু করার নেই। তবে মনে রাখবেন, আপনাদের দুজনের মুখই যেন বদ্ধ থাকে।’ উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফিরতি পথ ধরল সে। ‘এসো।’

‘কী হয়েছিল, বলবেন না আমাদের?’ ক্লেইবৰ্ন প্রশ্ন করলেন।

‘দেখতেই পাচ্ছেন। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।’

স্টুডিও যাবার রাস্তা পার হতেই ওদের গন্তব্য বুঝে ফেলল রয়। বাঁ দিকের একটা সাউন্ড স্টেজে আগুন ধরে গেছে।

আগুন তার লকলকে শিখা দিয়ে চাটছে সাত নম্বর স্টেজ। ড্রিসকল সেদিকে নিয়ে চলল ওদের।

ওখানে ঢুকে সাজসজ্জা দেখেই রয় চিনে ফেলল ওটা নরম্যানের মায়ের বেডরুমের সেট ছিল। ঠিক যেভাবে ক্রিপ্টে লিখেছিল ও, সেভাবেই সাজানো হয়েছিল বেডরুমটা।

দুজন লোক অপেক্ষা করছিল ওখানে: গাঁটাগোটা, গোঁফওয়ালা মাদেরো আর একজন সিকিউরিটি গার্ড, বুড়ো চাক এসিংগার। এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা দুজন।

আগুনের তীব্র আলোতে চোখ পিটিপিট করল রয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, সেটের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু বাতাসে কাপড় পোড়ার কটু গন্ধ পেতেই রয়ের ভুল ধারণা ভেঙে গেল।

তারপরই পুড়ে যাওয়া বিছানার চাদর, বালিশ চোখে পড়ল ওর।

‘দীশ্বরকে ধন্যবাদ, সময়মতো এসে পড়েছিলাম,’ বলছে গ্রিসিংগার। ‘আমি যখন আসি, তখন দরজাটা খোলা ছিল। ভেতর থেকে টিমটিমে আলো আসছে দেখে সন্দেহ হয় আমার। সাথে সাথে ধোঁয়ার গন্ধও পাই। ভেতরে ঢুকে দেখি বিছানায় আগুন ধরে গেছে। তাই দেয়াল থেকে এক্সটিংগুইসার নামিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলি।’

‘আর সেই সাথে নিজেকেও পুড়িয়ে কাবাব বানানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলে প্রায়।’ ফাঁক মাদেরো মাথা দোলাল। ‘এমন পরিস্থিতিতে আমাকে ডাকার কথা তোমার।’ রেগে আছে মাদেরো। সেটাই স্বাভাবিক, স্টুডিওর ফায়ার পেট্রোল বিভাগের প্রধান লোকটা।

‘তোমার মাথা! গ্যারেজ থেকে ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসতে আসতে পুরো জায়গাটায় আগুন ধরে যেত। ওই গ্যাসোলিনটা যদি বিস্ফোরিত হতো...’

‘গ্যাসোলিন?’ আবার রাগী ভাবটা ফিরে এসেছে ড্রিসকলের চেহারায়। ওদের দুজনের দিকে এগিয়ে গেল সে।

‘বিছানার নিচে এটা খুঁজে পেয়েছি,’ পাঁচ গ্যালনের একটা ড্রাম তুলে ধরল মাদেরো।

ড্রামটা হাতে নিয়ে ঝাঁকি দিল ড্রিসকল। ‘ক্যানটা এখনও খোলা হয়নি।’

‘চাকনির প্যাঁচ কিন্তু টিলে হয়ে আছে। তার মানে আগুন লাগানোর ঠিক আগ মুহূর্তে বাধা পেয়েছিল লোকটা।’ তাকে বলল মাদেরো।

‘তুমি কীভাবে জানো?’ হাঁটু গেড়ে বসল ড্রিসকল। উঁকি মেরে তাকাল বিছানার নিচে। ‘দেখ, এখানে রঙের ক্যান, ব্রাশও আছে। বেজন্যা অলসগুলো কাজ করার পর এগুলো আর স্টোর রঞ্জে নিয়ে যায়নি, এখানেই ফেলে গেছে। ওদের কেউ বোধ হয় কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিল এখানে। ঘুম থেকে উঠে সিগারেট টানে। সিগারেট থেকে আগুন ধরে যায় বিছানায়। শালা তখন ভয়ের চোটে ভাগে।’

মাথা নাড়ল মাদেরো। ‘আমার কথা লিখে রাখুন, কেউ ইচ্ছে করে লাগিয়েছে এ-আগুন। একে বরং...’

‘হয়েছে, থামো।’ গার্ডের দিকে ফিরল ড্রিসকল। ‘ট্যালবটের সঙ্গে কথা বলেছ?'

নামটা চিনতে পারল রয়: ট্যালবট স্টুডিও’র সিকিউরিটি প্রধান।

ড্রিসকলের কুপিত দৃষ্টির সামনে অবস্থি নিয়ে নড়েচড়ে দাঁড়াল গ্রসিংগার। ‘সে সুযোগ পাইনি। আপনি জানেন, ও কোথায় থাকে। আমি ভাবলাম, থাউজ্যান্ড ওকস থেকে সে আসতে আসতে...’

‘তুমি কী ভেবেছ না ভেবেছ তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। নাইট শিফটের আর কেউ এ ঘটনার কথা জানে?’

‘না। জিমি গেটে। ফ্রিটয় আর ম্যানহফ পেছনের গেটে।’

মাদেরোর দিকে ঘুরল ড্রিসকল। ‘তোমার লোকজন জানে?’

‘পেরি আর কজেনের ডিউটি ছিল। কিন্তু গ্রসিংগার যখন আমাকে ডাকতে যায়, ওরা দুজন তখন ঘুমাচ্ছিল। তাই আমি একাই আসি এখানে।’

‘তাহলে এখানে কী হয়েছিল, তা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না।’

‘যে লোকটা এ কাজ করেছে তাকেও কেউ দেখেনি।’ ড্রিসকলের হাতের ড্রামটার দিকে ইশারা করল ফ্লাক মাদেরো। ‘আমি জানি আপনি কী ভাবছেন। কিন্তু কাজটা অবৈধ...’

মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল ড্রিসকল। ‘তুমি ভুল করছ। এটা দুর্ঘটনা ছিল।’

লাল হয়ে গেল মাদেরোর মুখ। ‘আপনার আদেশ কবে থেকে মানতে শুরু করলাম আমি?’

‘বারানি ওয়েংগারটন যেদিন ইউরোপ চলে গেছে, সেদিন থেকে,’ ড্রিসকল বলল। ‘রংবেন গিয়েছে নিউ ইয়র্ক। তার মানে, আমিই এখানে সর্বেসর্বী। তুমি যখন ফোন করেছিলেন তখনও অফিসে ছিলাম আমি। এত রাত পর্যন্ত কোন ঘোড়ার ঘাস কাটতে অফিসে ছিলাম, বলো তো? আমি আমার কাজ করতে জানি, অন্য কারও কাছে শিখতে হবে না।’

গলা চড়ে গেল মাদেরো। ‘হয়তো তা-ই। তবে আপনি যদি এ ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু ভুগতে হবে...’

‘চোপরাও! শোনো। ঝামেলা যখন চাইছ, তাহলে যাও পুলিশের কাছে। ওদের কাছে রিপোর্ট লেখাও। ওয়েংগারটন ফিরে এসে যখন দেখবে আজ রাতের সিকিউরিটি ব্যবস্থা কর্তৃ দুর্বল ছিল, যখন জানতে পারবে তোমার গার্ডরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিল, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, তোমাদের দুজনের পাছায় লাথি মেরে ঢাকরি থেকে বের করে দেবে ও।’

‘এ কাজ করে পার পাবেন না।’ নিচু হয়ে এসেছে মাদেরোর গলার স্বর।

‘আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,’ রঘ, জ্যান ও ক্লেইবর্নের দিকে ফিরল ড্রিসকল। ‘আমি চাই আপনারাও মুখ বন্ধ রাখবেন। কেউ যদি জিজেস করে আজ রাতে এখানে এসেছিলেন কেন, তাহলে বলবেন, প্রভাকশন মিটিং ছিল।’

গ্রসিংগার এগিয়ে এল। ‘আরেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন। প্রমাণটা...’

‘কীসের প্রমাণ?’ গ্যাসোলিন ড্রামের একপাশে টোকা মারল মার্টি ড্রিসকল। ‘এটা আমি দেখব।’ বিছানার দিকে তাকাল ও। ‘তুমি আর মাদেরো বিছানার চাদরটা সরিয়ে ফেলো। কাল হসকিনসকে বলব, আমাকে যেন আরেকটা বিছানার চাদর ডিজাইন করে দেয়। দেয়ালের দাগগুলো মুছে ফেলো। এয়ার-কন্ডিশনার ছেড়ে দাও, যাতে ধোঁয়া আর কাপড় পোড়ার গন্ধ বেরিয়ে যেতে পারে।’

শ্রাগ করল মাদেরো। ‘ঠিক আছে। তবে কোনও কিছু যদি গড়বর হয়...’

‘যদি তোমার লম্বা নাকটা না গলাও, তাহলে হবে না।’ ড্রিসকল হাসল। ‘শুধু আমি যা বললাম তা-ই করো। আগামীকাল থেকে পুরোপুরি ঝামেলামুক্ত হয়ে যাবে তুমি। ঠিক আছে তাহলে। কাল সকালে সেটে তোমার সঙ্গে দেখা করব।’

দুই সঙ্গীর পিছু পিছু অন্দরকার সড়কে এসে হাজির হলো রয়। জ্যান বা ক্লেইবর্ন কেউই কথা বলছে না। কিন্তু রয় জানে ওরা কী ভাবছে।

ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে একটা অপরাধ। আর ওরা সবাই সহযোগী।

জ্যানকে ধরার জন্য দ্রুত পা চালাল সে। চকচক করছে জ্যানের চোখ দুটো। চাঁদের আলোয় ওর ফ্যাকাসে মুখটাকে আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ক্লেইবর্নের চেহারা দেখার সুযোগ হয়নি ওর। ড্রিসকলের পাশে চলে গেছেন তিনি।

‘আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার,’ বললেন তিনি।

‘বলুন।’

‘একটু একা বলতে চাই।’

মাথা নাড়ল প্রযোজক। ‘দেখুন, আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। আপনার যা বলার আছে, সবার সামনেই বলুন।’

রয় ও জ্যান এগিয়ে আসতে ড্রিসকলের হাতের জিনিসের দিকে নজর ফেরালেন ক্লেইবর্ন।

‘ওই গ্যাসোলিন ড্রাম,’ বিড়বিড় করে বললেন তিনি। ‘ঠিক এ-রকম একটা ড্রাম দেখেছি গত রবিবার। নরম্যান যখন ভ্যানটা পুড়িয়ে দিয়েছিল।’

‘ওহ, যীশ! আবার! প্রতিবাদে কুঁচকে গেল ড্রিসকলের টেকো ললাট। ‘আপনি বলতে চাচ্ছেন, নরম্যান এই আগুন লাগিয়েছে?’

‘আপনাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম, ও বাগড়া দেয়ার চেষ্টা করবে,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘আর কার ঠেকা পড়েছে আগুন লাগানোর?’ ক্যান্টির দিকে নড় করলেন তিনি। ‘এই যেমন ধরন পদ্ধতি...’

‘কাকতাল। যখনই কেউ আগুন ধরাতে যায়, তখন প্রথমে গ্যাসোলিনের কথাই ভাবে।’

‘তাহলে আপনি স্বীকার নিচ্ছেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে লাগিয়েছিল আগুনটা।’

‘এমন কোনও স্বীকারেক্তি দেইনি আমি! আবারও বলছি, এটা স্বেচ্ছ একটা দুর্ঘটনা। আমাকে ভয় দেখানোর কথা ভাবলে, ভুলে যান।’

‘ভয় দেখাতে পারলে তো ভালোই হতো।’ এবার ক্লেইবনেও চেহারা দেখতে পাচ্ছে রয়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ডাঙ্গারের কপালে। ‘এজন্যই মুখ বন্ধ রেখেছিলাম আমি। কারণ চাইনি কেউ ভয় পেয়ে যাক। আর আমি নিশ্চিতও ছিলাম না। কিন্তু আজ রাতের ঘটনার পর আর কোনও সন্দেহ নেই। নরম্যান আছে আশেপাশে।’

‘আপনি আবোলতাবোল যা-ই বকুন না কেন,’ গ্যাসোলিন ড্রামটা ঘোরালো ড্রিসকল, ‘তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।’

‘কিন্তু ওকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।’

‘কী...’

‘ওকে দেখেছি আমি,’ আবারও বললেন ক্লেইবর্ন। এবার তার গলার স্বর আরও কোমল। ‘কাল রাতে।’

কেউ কথা বলছে না। সবাই তাকিয়ে আছে ক্লেইবনেরও দিকে। আরও কিছু শোনার অপেক্ষা করছে তার মুখ থেকে।

পারফেক্ট সোটিৎ, আনমনে বলল রয়। এবার গল্প বলা শুরু করো!

কিন্তু কোনও গল্প বলছেন না ক্লেইবর্ন। তার বলা কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রয়ের কানে। ভেঞ্চুরার সুপারমার্কেটে। দোকানিদের ভিড়ে। উজ্জ্বল আলোয়। আয়নায়। ওকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, এখন যেমন আপনাকে দেখছি। পালিয়ে গেছে...হাত ফক্সে...

‘তাহলে এত নিশ্চিত হলেন কী করে?’ ড্রিসকল বলল। ‘আপনি হয়তো ভুল দেখেছেন।’

‘আপনাকে আরও আগে না জানিয়ে ভুল করেছি। আর কোনও ভুল করিনি। আমার পরামর্শ মেনে নিয়ে যদি সবকিছু বন্ধ করে দিতেন, তাহলে আজ এ দুর্ঘটনা ঘটত না।’

‘কিছুই হয়নি।’ ড্রামটা বগলে নিয়ে বলল ড্রিসকল। ‘কিছু হবে না।’

‘কিন্তু ও চেষ্টা করবে...’

‘ভাববেন না। এখন থেকে আরও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে। ডিউটির সময় আর কোনও আলসেমি নয়। আমার এখনও মনে হচ্ছে, আপনি ভুল করছেন। আর যদি আপনার কথা ঠিকও হয়, বেজন্মাটার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকব আমরা।’

রয় এগিয়ে এল। ‘যুঁকি নিচেন কেন শুধু শুধু? পুলিশ যতদিন ওকে খুঁজে না পায়, ততদিন শুটিংটা অন্তত স্থগিত করতে পারেন।’

রয় তাকে সমর্থন করায় হাসিমুখে নড় করে ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন
ক্লেইবর্ন। কিন্তু অঙ্গীকৃতি জানাল ড্রিসকল।

‘অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাদেরো আর গ্রসিংগার ইতোমধ্যে সব প্রমাণাদি
মুছে ফেলেছে। আর সবাই যখন জানতে চাইবে, আগুন লাগার ব্যাপারে আর
কাউকে জানাইনি কেন, কী জবাব দেব আমরা?’ মাথা নাড়ল সে। ‘নাহ, কোনও
পুলিশ নয়।’

‘কিন্তু ছাগিত তো করতে পারেন...’

‘ব্যাপারটা আমি ভোবে দেখব।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হাঁটতে শুরু করল ড্রিসকল।

‘তার মানে কিছুই বন্ধ করবে না ও,’ বিড়বিড় করে বলল রয়। ক্লেইবর্নের
দিকে ফিরল ও। ‘আপনি নিশ্চিত, নরম্যানকেই দেখেছিলেন?’

‘নিশ্চয়ই।’

জ্যানের চোখে ছিধা। ‘ভেঞ্চুরার ওই সুপারমার্কেট,’ বলল ও। ‘আমি যেটার
কথা ভাবছি, সেটা এখান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে।’

‘যদি আমাকে সে গতরাতে দেখে ফেলে,’ ওকে বললেন ক্লেইবর্ন। ‘তাহলে
আর অসাবধানে ঘোরাফেরা করবে না। কিন্তু এখানে যদি কোথাও লুকানোর
জায়গা পেয়ে যায়...’

রয় সবিস্ময়ে দেখল, ওর আরও কাছে ঘেঁষে এসেছে জ্যান। হাত দুটো
বাড়িয়ে দিয়েছে রয়ের হাতের দিকে। জ্যানের মুখের দিকে তাকাল রয়। নিজের
সমস্ত অভিনয় দক্ষতা দিয়ে ভয় ঢাকতে চেষ্টা করছে ও। কিন্তু আঙুলের
কাঁপাকাঁপিই বলে দিচ্ছে, সেই চেষ্টায় ব্যর্থ ও। রয়ের সামনে এখন কোনও
মুখোশ-পরা অভিনেত্রী দাঁড়িয়ে নেই। ওর সামনে এক ভীতসন্ত্রস্ত মেয়ে দাঁড়িয়ে
আছে।

নিরাপত্তা আর আশ্বাসের আশায় ওর দিকে ফিরেছে মেয়েটি। কিন্তু এই মুহূর্তে
কারও কাছে নেই মহামূল্যবান এই জিনিস দুটো।

‘চলো,’ বলল সে। ‘এখান থেকে বেরোই।’



চরিশ

ছুরির ফলাটা ছয় ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া। দুই পাশ দিয়েই কাটা যায়, প্রচন্ড ধারালো।

ছোরাটা শক্ত মুঠিতে ধরে ওটার তীক্ষ্ণ ধারালো ডগার দিকে তাকিয়ে আছে স্যান্টো ভিজিনি।

ক্লেইবর্ন রুমে প্রবেশ করতে চমকে গেল সে।

‘মি. ভিজিনি...’

‘বলুন?’

‘আমি ডা. ক্লেইবর্ন। আপনার অফিস থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, আপনাকে এখানে পাব। আশা করি, বিরক্ত করছি না।’

‘মোটেও না। একেবারে সময়মতো এসেছেন আপনি।’ ছুরিটা টেবিলে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল সে। ‘খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায়,’ বলল সে। ‘আপনার আসার খবর পাবার পর থেকেই দেখা করার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।’

ভিজিনির শরীর থেকে যে সুগন্ধীর গন্ধ আসছে ক্লেইবর্ন ওটার সঙ্গে পরিচিত নন। পরিচালক আরেকবার ছুরিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বিড়বিড় করে মন্তব্য করল, ‘বড় পাতলা।’

ছুরিটার দিকে কোনও নজর নেই ক্লেইবর্নের। ভিজিনিকে দেখছেন তিনি।

‘আপনার কি মনে হয়?’ আবারও বলল পরিচালক। ‘আরও চওড়া ছুরি দরকার আমাদের-?’

‘হ্যাঁ।’ নড় করলেন ক্লেইবর্ন। জোর করে ভিজিনির ওপর থেকে নজর সরিয়ে ছুরিটার দিকে তাকালেন।

‘এই প্রথম ডিপার্মেন্টটা,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিজিনি। ‘কোনও কাজের না। চাইলাম কী আর দিল কী! ঢোক পাকাল সে। ‘আমি যতই বলি নরম্যান বেটস এই খেলনা জিনিস ব্যবহার করেনি, ওরা ততই আমাকে উল্টো বোঝায়। বলে, আজকাল তো সবাই সুইচ-ব্রেড ব্যবহার করে।’ আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ‘অবিশ্বাস্য।’

‘আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি,’ আগের কথার খেই ধরল ভিজিনি। ‘একসঙ্গে প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র বাছাই করব আমরা।’

রংমটা ওকে ঘুরে দেখাতে শুরু করল ভিজিনি। কামরায় ঢোকার পর এই প্রথম পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হলেন ক্লেইবর্ন।

বাঁ পাশে অন্তর্ভুক্তির পাবেন, কেরানি বলেছিল তাকে। আসলেই তাই। কিন্তু অন্ত ভাস্তুর বললে, খুব কম-ই বলা হয় ঘরটাকে।

ঘরটা অঙ্গারের খুদে সংস্করণ। ডানপাশের দেয়ালের কাছে একগাদা প্রাচীন অন্তর্শন্ত্র রাখা আছে। বর্ষা, পাইক, যুদ্ধ-কুঠার, ল্যান্স, গদা প্রভৃতি অঙ্গের সবগুলোর গায়ে ট্যাগ নাম্বার লাগানো।

বিপরীত পাশের দেয়ালে রাইফেল সাজিয়ে রাখা থরে থরে। নানা ধরনের, নানা কোম্পানির-ফ্লিন্টলক, উইনচেস্টার, মাউজার, গারান্ড আরও অনেক। এরপর সাজিয়ে রাখা আছে লং-বো, ক্রস-বো, ইভিয়ান তীর ভর্তি তৃণীর। মাথার ওপর গ্লাস কেসে হ্যান্ডগান, ডুয়েলিং পিস্টল, পিপারবক্স, কোল্ট, লুগার, সার্ভিস রিভলভার, পুলিশ মডেল ও স্যাটারডে নাইট স্পেশাল দেখতে পেলেন।

তবে ভিজিনির মতো ক্লেইবর্নও পেছনের দিকের দেয়ালে রাখা অন্তর্গুলোর দিকে আকৃষ্ট হলেন বেশি। এখানে, এই অন্ধকারেও বার্নিশ করা স্টিল চকচক করছে। রোমান তলোয়ার, খাঁজকাটা অ্যাজটেক তরবারি, একধারী তলোয়ার, খঙ্গর, অটোমান সাম্রাজ্যের ক্ষুর, ভাইকিংদের দ্বন্দ্যবুদ্ধে ব্যবহৃত তরবারি এবং নেপোলিয়নের ক্যাভালরিতে ব্যবহৃত তরবারি সাজিয়ে রাখা এখানে।

ওপরের শেলকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা জিনিসগুলোর ওপর নজর ভিজিনির। ‘দেখুন কেমন এলোমেলো করে রেখেছে সব! স্রেফ পাগলামি।’ শ্রাগ করল সে। ‘তবে এর ভেতর থেকেই কিছু না কিছু খুঁজে বের করব আমরা।’ গাদাগাদি করে রাখা অন্তর্গুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা ভারি হাতলওয়ালা ছুরি বের করে আনল সে।

‘এটা কী?’

‘দেখে তো মনে হচ্ছে বাউয়ি নাইফ,’ জবাব দিলেন ক্লেইবর্ন। ‘বুনো পশ্চিমের দিনগুলোতে ফ্রন্টিয়ারে ব্যবহার করা হতো।’

‘এখন আর ব্যবহার করা হয় না?’ নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ছুরিটা রেখে দিল ভিজিনি। ‘এই ছুরিটা হলে খুব ভালো হতো।’

তার হাত এখনও শেলক হাতড়াচ্ছে। আচমকা থেমে গেল হাতটা। টেনে একটা ছুরি নামিয়ে আনল সে। ছুরিটা আট ইঞ্চিং লম্বা, দুই দিকেই ধার আছে, আর হাতলটা বেশ চওড়া। আলোআঁধারিতেও চকচক করছে রেডটা।

‘কসাইয়ের ছুরি। এটাই ব্যবহার করবে ও।’

‘এটা কি...’

‘সিনেমায় ব্যবহার করব,’ সবকটা দাঁত বেরিয়ে গেছে ভিজিনির। ‘সাইজ, দৈর্ঘ্য একদম ঠিকঠাক। ছবিও আসবে দারুণ। কয়েকটা ডুপ্পিকেট বানাব এটার।’

ঘুরে দাঁড়াল ও। ছুরির স্টিলের টোকা মেরে বলল, ‘দারুণ একটা আবিষ্কার। শত হলেও, ছুরিটাই আসল স্টার। কী বলেন?’

তার তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন। ‘একদিক দিয়ে, হ্যাঁ...’
‘স্ক্রিটটাও গুরুত্বপূর্ণ,’ ভিজিনি বলল। ‘আজ সকালে সংশোধিত জায়গাগুলো
রয় দেখিয়েছে আমাকে।’

‘এজন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম আমি,’ হড়বড় করে বললেন
ক্লেইবর্ন। ‘আপনার কী মনে হয়?’

‘কিছু কিছু জায়গায় বেশ ভালো। ও যেভাবে নরম্যানের রিঅ্যাকশনগুলোর
যেভাবে সামলেছে, সেটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। এতে চরিত্রের গভীরতা
বেড়েছে। কিন্তু মার্ডার সিনগুলোতে কাঁচি চালানো...আমাদের জন্য ঠিক হবে না।’

‘সেটার দায় আমার,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘আমার পরামর্শে কিছু জায়গায়
অতিরিক্ত সহিংসতা কেটে ফেলা হয়েছে।’

‘কেন?’ হাসি মিলিয়ে গেছে ভিজিনির মুখ থেকে। ‘শত হলেও, আমরা একটা
গল্প বলছি।’

‘সিনেমায় যা দেখানো হয়, লোকজন তা-ই বিশ্বাস করতে পছন্দ করে।’

‘নিশ্চয়ই! কিন্তু আমাদের গল্পটা খুনের। আর লোকজনকে সেটা দেখাতে হবে
আমাকে। আপনার ভাষায়, বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য।’

‘হিংস্রতাই একমাত্র বাস্তবতা নয়।’

‘তাই?’ দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল ভিজিনি। ‘এখানে দেখুন। এই
অন্তর্গুলো মানবসভ্যতার ইতিহাস। এখানে শুধু বর্তমান যুগের নিউক্লিয়ার অন্তর্ভু
নেই। সভ্যতার উন্নয়ন! হ্রেঁ! যন্তসব ফালতু কথা।’

‘কিন্তু আপনি যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছেন...’

‘আমার সেই অধিকার আছে।’ ছুরিটার দিকে তাকাল ভিজিনি। ‘দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধে যখন সিসিলি আক্রমণ করা হয়, তখন বাচ্চা ছিলাম আমি। কিন্তু সব
লুটপাট, অত্যাচার আর হত্যাযজ্ঞ নিজ চোখে দেখেছি। তারপর অনেক সময়
চলে গেছে। কিন্তু সহিংসতার ইতিহাস বদলায়নি। বিয়াফ্রা, বাংলাদেশ, গুলাগ
আর্টিপেলাগো, পাপা ডক জেলখানা, ভিয়েতনাম-কোথাও বদলায়নি। সহিংসতা
এখন সব জায়গায় স্বাভাবিক।’

‘দয়া আর সমরোতাও স্বাভাবিক।’

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল ভিজিনি। ‘দয়া আমার কাছে বিলাসিতা ছাড়া
আর কিছুই না। পৃথিবী আগের মতো নেই। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।
নরম্যান বেটসের মতো বেজন্যা লোকের সংখ্যা বাড়বে দিন দিন। ওর মা একটা
বেশ্যা আর ও আমাদের যুগের জন্য দেয়া সন্তান।’ ছুরির হাতলটা শক্ত করে ধরল
পরিচালক। ‘এটা আমার বিশ্বাস। আমার ছায়াছবিও এই মেসেজ দেবে।’

আবারও অন্যদিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। ভিজিনির চেহারা দেখতে চাচ্ছেন না
তিনি। কিন্তু তাকে কথা বলতে হবে।

‘আমাদের অনেকেই এখনও বিশ্বাস করে, পৃথিবীটা ভালো একটা জায়গা।’
‘হয়তো তা-ই। কিন্তু ভালো জিনিসে বিশ্বাস করতে হলে খারাপটাকেও মেনে
নিতে হবে আপনাকে।’
ছুরিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটা ধরল ভিজিনি।
‘সব মানুষের ভেতরই একটা শয়তান আছে। আপনাদের সেই শয়তানটাকেই
দেখাব আমি।’
নির্বাক ক্লেইবর্নের সামনে রূম থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। মানসিক বৈকল্য।
একটা অসুস্থতা, একটা রোগ, খুব সম্ভবত বিপদও। কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তিত নন
তিনি। এমন বৈকল্য আগেও বহুবার দেখেছেন।
তিনি আসলে চমকে গেছেন ভিজিনির চেহারা দেখে। এই চেহারা আগেও
দেখেছেন ক্লেইবর্ন।
কারণ, স্যান্টো ভিজিনি দেখতে অবিকল নরম্যান বেটসের মতো।



পঁচিশ

লেখক হিসেবে, সব ধরনের গৃহবাঁধা বুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে রয়। কিন্তু ক্লেইবর্নকে দেখে যে কথাটা ওর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, সেটাকে গৃহবাঁধা না বলে উপায় নেই। ‘কী হয়েছে? ভূত দেখেছেন নাকি?’

আসন গ্রহণ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘এইমাত্র ভিজিনির সঙ্গে দেখা করে এলাম।’

‘কাটাঁট করতে নিশ্চয় অঙ্গীকার করেছে ও।’ নড় করল রয়। ‘কী বলল সে? সহিংসতা নিয়ে বাণী ঝাড়ল?’

‘হঁ্যা, তবে...’

‘ওসব ভূলে যান। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন টক শো আর সেমিনারে ওই বাণী ঝাড়ছে ভিজিনি, আমি জানি। কারণ, আমারই এক বক্ষ লিখেছিল ওই বক্তৃতা...দুশো ডলারের বিনিময়ে। যদিও কখনও টাকাটা পায়নি ও।’

‘সেটা আমার সমস্যা না,’ হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে ক্লেইবর্নকে। ‘কথা হচ্ছে, আমাকে আগে বলনি কেন?’

‘কী বলিনি?’

‘ভিজিনি যে দেখতে অবিকল নরম্যান বেটসের মতো।’

‘মজা করছেন?’ রয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। ‘আমাদের কাছে নরম্যানের যে ছবি আছে...’

‘ওটা অনেক বছর আগের ছবি। নরম্যানকে এখন অবিকল ভিজিনির মতো দেখায়।’

তার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রয়। তারপর মুখ খুলল, ‘তাহলে সেদিন সুপারমার্কেটে আপনি কি ভিজিনিকে দেখেছিলেন?’

‘হতে পারে।’ বিরতি নিলেন ক্লেইবর্ন। ‘ওর সম্পর্কে তুমি কী জানেন?’

‘বেশি কিছু না। পত্রপত্রিকায় যা পড়েছি তা-ই জানি। ইতালিতে স্প্যাগেটি ওয়েস্টার্ন দিয়ে এ পেশায় ওর যাত্রা শুরু। হরর ফিল্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, পরিচালনা শুরু করে সে। চলে যায় ফ্রান্সে। ওখানে কয়েকটা ছবি পরিচালনা করে। লোপগারো ওর প্রথম হিট সিনেমা। ওই মুভিতেই ওর বিশেষ মিশ্রণ ব্যবহার করে সে।’

‘বিশেষ মিশ্রণ?’

‘যৌনতা ও সহিংসতা।’ শ্রাগ করল রয়। ‘ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দর্শকরা এ ছবিটা লুকে নেয়।’

‘তোমার ভালো লাগেনি?’

‘কেউ জানতে চায়নি। দর্শকরা ক্ষিমে যা দেখেছে, তা-ই পছন্দ করেছে। আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়েছে অ্যাকাউট্যান্টরা। তিনটা সিনেমা বানানোর চুক্তিতে এই স্টুডিও-তে আসে সে। তারপর বাকিটা ইতিহাস।’

‘ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানো?’

‘সবসময় লো প্রোফাইল বজায় রেখেছে। তবে অনেক গুজবও শুনেছেন নিশ্চয়ই ওর ব্যাপারে? তার নাকি পাঁচবার বিয়ে আর ডিভোর্স হয়েছে, সমকামী। ড্রাগে আসঙ্গ-চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছে না ইত্যাদি।’

‘তোমার কী ধারণা?’

‘শুধু ওর কাজ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারি। আমার ধারণা ভিজিনির সমস্যা আছে। সে এমন ধরনের মানুষ, যে পারলে ইলেকট্রিক ছুরি নিয়ে জ্যাক দ্য রিপারের ফেলে যাওয়া কাজ আবার নতুন করে শুরু করবে।

মার্ভার মুভি বানাতে ওস্তাদ ভিজিনি। বোধহয় জানেন, ড্রিসকলের কাছে ও-ই প্রথম প্রজেক্টটা নিয়ে আসে। আমাকে ডাকার আগেই একাজ করে সে। তবে আমি শুনেছি ভিজিনির আসল পরিকল্পনা ছিল, নরম্যানের চরিত্রে ও নিজেই অভিনয় করবে।’

‘আমি জানতাম না।’ মাথা নাড়লেন ক্লেইবর্ন। ‘ওদের দুজনের চেহারায় মিল আছে...’

‘ড্রিসকল নিশ্চয়ই হটিয়ে দিয়েছে ওকে। বলেছে, ওদের বড় স্টার দরকার। এজন্য পল মরগ্যানকে বেছে নেয়। কিন্তু ভিজিনি নিজে পলকে কোচিং করাচ্ছে। এমনকি সে-ই উইগ আর পোশাক নির্বাচন করেছে।’

‘আর ছুরিটাও,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘এইমাত্র ছুরি বাছাই করতে দেখে এলাম। দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন জানে, নরম্যান কোন ছুরি ব্যবহার করেছিল।’

গভীর নিঃশ্বাস নিল রয়। ‘আপনি যে চমকে গেছেন, তাতে আশ্র্য হওয়ার কিছু নেই। ও যদি সত্যিই নরম্যানের মতো দেখতে হয়...’

উঠে দাঁড়ালেন ক্লেইবর্ন। ‘আমার মনে হয়, মি. ড্রিসকলের সঙ্গে কথা বলা উচিত আমাদের।’

কিন্তু বাধ সাধল অনিতা কেজি।

তারা ড্রিসকলের অফিসে পৌছতেই মাথা নাড়তে শুরু করল মেয়েটি। ‘দুঃখিত। তিনি ভেতরে নেই,’ ওদের বলল সে। ‘দুপুরে ফিরবেন কিনা বলতে পারছি না...’

‘ভালো মেরে।’

দরজার পেছনে দাঁড়ানো মার্টি ড্রিসকলের দিকে তাকাল মিস কেজি। অতিথিদের উদ্দেশ্যে নড় করল সে। ‘অভিনন্দন। স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়েছে আমার।’

ক্লেইবর্নের দিকে এক নজর তাকাল রয়। ‘ভিজিনির পছন্দ হয়নি।’

‘জানি,’ ড্রিসকলকে আপসেট দেখাচ্ছে। ‘এ ব্যাপারে কথা বলতে চান?’
ইশারায় ওদের দুজনকে তার পিছু নিতে বলল সে।

‘মি. ড্রিসকল।’ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল অনিতা কেজি। ‘নিউ ইয়র্ক থেকে
আপনার ফোন কল আসার কথা...’

‘চিন্তা করো না।’ ঘড়ির দিকে তাকাল প্রযোজক। ‘ওখানে এখন সাতটার বেশি
বাজে। খুব সম্ভবত ও এখন ডিনারে গেছে। যদি চেক ইন করে, তাহলে রাতে
আমাকে বাসায় ফোন করতে বলো।’

অনিতার অকুটির সামনে দরজা বন্ধ করে রয় আর ক্লেইবর্নের মুখোমুখি বসল
সে। ‘আপনারা আসায় খুশি হয়েছি। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে
যাচ্ছিলাম, ভিজিনি তো খেপে বোম। কেবল কান ভারী করে গেল।’ রয়ের দিকে
তাকিয়ে হাসল সে। ‘আপনাকে খুব যত্নণা দিয়েছে?’

‘আমি কথা বলেছি ভিজিনির সঙ্গে; ক্লেইবর্ন বললেন। ‘মার্ডার সিনগুলোর
সহিংসতা কমিয়ে দেয়ায় তার আপত্তি আছে মনে হয়।’

‘আমার নেই,’ চওড়া হাসি উপহার দিল ড্রিসকল। ‘একটা কথা মনে রাখবেন।
ভিজিনি এখন প্রচুর চাপের মধ্যে আছে। শুটিং শুরুর তারিখ নিয়ে আমরা সবাই-
ই চাপে আছি।’

‘সে-ব্যাপারেই কথা বলতে চাইছি,’ ক্লেইবর্ন বললেন তাকে।

‘বলুন।’

ক্লেইবর্ন ড্রিসকলকে ঘটনাটা আবার বলার সময় প্রযোজকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য
করল রয়।

দেখে মনে হচ্ছে, মনোযোগ দিয়েই শুনছে সব। নরম্যানের সঙ্গে ভিজিনির
চেহারার মিলের কথায় আসতেই বাধা দিল সে।

‘আমার তো এমন কিছু মনে হয় না,’ বলল সে।

‘কিন্তু এটাই সত্যি। ভিজিনি কিন্তু জানে ব্যাপারটা। সে কিন্তু নরম্যানের চরিত্রে
অভিনয়ও করতে চেয়েছিল।’

‘জর্জ ওয়ার্ড আপনাকে পছন্দ করবে।’ খলখল করে হাসল ড্রিসকল। ‘এ-
ধরনের কৌতুক ও-ই চালু করে প্রথমে।’

‘আমি কিন্তু সিরিয়াস। এই লোকটা...’

‘একজন পরিচালক,’ ক্লেইবর্নের হয়ে কথাটা শেষ করে দিল ড্রিসকল। ‘ওকে
ছাড়া চলবে না আমাদের। পল মরগ্যানের চেহারা অল্পবল্ল টিকিট বেঁচে দিতে
পারবে। কিন্তু ওর মাধ্যমে আমাদের অ্যাকাউন্ট ফুলবে না। জ্যান কিছুই না।
ভিজিনিকে বিক্রি করছি আমরা। ও-ই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু।’

‘এমনকি ও যদি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়, তা-ও?’

‘সব পরিচালকই কমবেশি পাগল। এসবে পাত্তা দেবেন না।’

‘কিন্তু আমাকে পাত্তা দিতে হচ্ছে।’ জ্ঞ কুচকে গেছে ক্লেইবর্নের। ‘কাল রাতে আগুনের কথা শুনে রয়েকে ফোন করেন আপনি। ভিজিনিকে জানানোর চেষ্টা করেননি কেন?’

‘চেষ্টা করেছি,’ দ্বিধাজড়িত গলায় বলল ড্রিসকল। ‘ওর অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ দিয়ে রেখেছিলাম।’

‘তার মানে বাইরে ছিল ও,’ আরও গভীর হলো ক্লেইবর্নের অর কুঁচকানি। ‘ও কোথায় ছিল, সেটা বলেছে আপনাকে? আপনাকে কি আদৌ ফিরতি কল করেছিল ও?’

‘হীণ! ডেক্সে থাবা মারল ড্রিসকল। ‘আপনি বলতে চাইছেন, ভিজিনি তার নিজের সিনেমায় স্যাবোটাজ করার জন্য আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল?’

‘কেউ একজন তো লাগিয়েছে।’

ঝোপের মতো ঘন জ্ঞ উঁচু করল ড্রিসকল। ‘দেখুন, ডাঙ্কার। গতকাল রাতে যা ঘটেছে, তা যেন বাইরের কারও কাছে ফাঁস না হয় সে-ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে চাই আমি। এজন্য আজ সকাল সাতটায় ট্যালবটকে আমার অফিসে ডাকি।’

‘আপনার সিকিউরিটি চিফ?’

‘হ্যাঁ। পুরো ঘটনাটা বুঝতে পেরেছে সে। আর গ্যাসোলিন ক্যানটাও পরীক্ষা করে দেখেছে। ক্যানটায় আমার আর মাদেরোর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। তবে অন্য একটা হাতের ছাপও পাওয়া গেছে। আর সেটা ভিজিনির হাতের ছাপ নয়।’

সামনে ঝুঁকল রয়। ‘এতো নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?’

‘স্টুডিও’র সব কর্মচারীর হাতের ছাপের সাথে মিলিয়ে দেখেছি আমরা। অন্য ছাপটা লয়েড পার্সনসের। লোকটা সেট-ড্রেসার। আজ দুপুরে ওর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছি আমি আর ট্যালবট।’

‘আগুন নিয়ে?’

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল ড্রিসকল। ‘কাল রাতে আপনাকে কী বলেছিলাম, মনে আছে? আমি যা বলেছিলাম, তা-ই ঘটেছে। কাল কাজ শেষে ক্যানটা ভুলে ওখানে ফেলে আসে ও। ও হ্যাঁ, কাজ শেষে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ওই বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট টানে ব্যাটা।’

‘কিন্তু এসব তো বাইরে গিয়েও করতে পারত! বললেন ক্লেইবর্ন।

‘আমরাও তো সেকথাই বলেছিলাম। কিন্তু লোকটা আমাদের ভুজুং-ভাজুং দিয়ে গেল। খুব নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমার ধারনা, গাঁজা টানছিল লোকটা। এখানকার অনেকেই টানে। এটা অবশ্য তার ঘুমিয়ে পড়ার একটা কারণ হতে পারে। আগুন জুলে ওঠায়, জেগে ওঠে লয়েড। ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করে। ঠিক আমি যেমনটা বলেছিলাম। পুড়ে যে মরেনি, এই কত!’

‘এই গন্ধ বিশ্বাস করেন আপনি?’ রয় জিজেস করল।

‘ও যদি মিথ্যাই বলত, তাহলে এমন কিছু বলবে কেন? যখন সে জানে যে ওর
বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ আনতে পারি?’

‘আনবেন নাকি?’

‘অভিযোগ করে বীমার লোকজনের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াই আরকি! তাহলেই
হয়েছে!’ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ড্রিসকল। ‘ওকে সেকথা বলিনি আমি। ও
বারবার আমাকে অনুরোধ করেছে, ওকে যেন ইউনিয়নের সামনে হাজির না
করি। আমি বলেছি, ঠিক আছে। তবে এক শর্তে। ওকে যেন আর সিনেমার
সেটে দেখা না যায়। আমি জানি না, লয়েড কী অজ্ঞাত দেখিয়েছে। তবে আজ
বিকেলে ছবির সেট ছেড়ে চলে গেছে সে। দুশ্চিন্তা করবেন না। এমনটা ঘটবে না
আর।’

ক্লেইবর্নের প্রতিবাদের অপেক্ষায় আছে রয়। কিন্তু শুধু নড করলেন তিনি।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসেও তার নীরবতা ভাঙল না। শেষমেশ রয়-ই ভাঙল
এই মৌনতা।

‘কী মনে হয় আপনার? লোকটা কি সত্যি কথা বলেছে?’

‘সেটের লোকটার ব্যাপারে জিজেস করলে, আমি জানি না। তবে ড্রিসকলের
ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার।’

‘সন্দেহ দূর করার কোনও উপায় আছে?’

অন্তরুত সূর্যের দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। ‘থাকতেই হবে।’



ছাবিশ

গোধূলীকে সঙ্গী করে, পাহাড়ের ঢালে নেমে এসেছে কুয়াশা। নীরবে...অনেকটা সাপের মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এসে উপস্থিত হয়েছে সে। রাত্তাঙ্গলো কখন যে দখল করে নিয়েছে, বোঝাই যায়নি! আন্তে আন্তে ঘন হয়ে এখন গিলে নিতে চাইছে আকাশ আর তারাঙ্গলোকে। জানালা দিয়ে বাইরের পরিবেশ দেখতে দেখতে ফোনে জ্যান বলল, 'বুঝতে পারছি না। এক ঘন্টা আগেই হাতে পেয়েছি নতুন লেখা কাগজগুলো। আর এখন কিনা তুমি বলছ-'

'ওই পাতাঙ্গলোর কথা ভুলে যাও।' বলল স্যান্টো ভিজিনি। 'ভুল হয়েছে আমাদের। চিত্রনাট্যে কোনও ধরনের পরিবর্তন আসবে না।'

'ভুল?'

'তেমন গুরুতর কিছু না। কাল রিহার্সালে যখন আসবে, তখন সব বুঝিয়ে বলব।'

'কখন আসব?'

'সন্ধ্যার দিকে এসো। পলের সাথে কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমি ফোন করব।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে-' খেমে গেল মেয়েটি, বুঝতে পারছে যে পরিচালক ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে। রিসিভার নামিয়ে রাখার সময়, হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পেল একটা। তবে আওয়াজটা বাইরে থেকে এসেছে। কাঁদছে কেউ একজন!

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জ্যান। ঘন কুয়াশা যেন চারপাশটা গিলে নিয়েছে। না কোনও অবয়ব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আর না কোনও ছায়া। কিন্তু কান্নার শব্দটায় কোনও বিরাম নেই। কুয়াশায় পথ হারানো কোনও বাচ্চা না তো? সদর দরজা খুলে, বাইরে বের হলো ও। কোনার বাতিটা থেকে আবছা আলো ভেসে আসছে, তবে সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। এমনকি কোনও শব্দও নেই। আছে কেবল শীতল নিষ্কৃতা।

সব দোষ ভিজিনির। একথা-ওকথা শুনিয়ে ওকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। গুরুতর কিছু না? যদি তাই হবে তো ওকে ফোন করল কেন? চিত্রনাট্যে যদি কোনও পরিবর্তন না-ই আসবে, তাহলে স্টুডিও থেকে ওকে নতুন পাতাঙ্গলো পাঠানো হলো কেন?

একসাথে অনেক কিছু ঘটতে শুরু করেছে। আগুন লাগল স্টুডিওতে, এদিকে আবার ক্লেইবর্ন লোকটা নাকি নরম্যানকে দেখেছে! আতঙ্ক যে জ্যানকে পেয়ে বসবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! আর কনিটাও যে কী না! মাঝে মাঝে দু-এক রাত

বাসায় থাকলে এমনকী হয়? এই মুহূর্তে কোনও মানুষের সঙ্গের জন্য মুখিয়ে
আছে জ্যানের মন।

আচ্ছা, রয় কে ফোন দিলে কেমন হয়? সদর দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢোকামাত্র
বাজতে শুরু করল ফোন। কী যেন বলে একে? টেলিপ্যাথি?

তবে না, ভুল হয়েছে ওর। ফোন রয় করেনি, করছেন অ্যাডাম ক্লেইবর্ন।
‘বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।’ বললেন ডাক্তার। ‘নতুন করে লেখা পাতাগুলো
পেয়েছ কিনা, সেটা জানার জন্য ফোন করেছি।’

‘পেয়েছি।’

‘কী মনে হয়?’

ভিজিনির সাথে হওয়া কথোপকথনটুকু জানাল জ্যান।

‘মানে সে চিকিৎসাট্যের পরিবর্তন মানতে রাজি নয়?’ এমন সুরে জানতে চাইল
ক্লেইবর্ন যে জ্যান নিজেই অস্থিবোধ করতে শুরু করল।

‘হচ্ছেটা কী বলো তো!’ জানতে চাইল সে, কখন যেন ক্লেইবর্নকে তুমি বলতে
শুরু করেছে। ‘কেউ আমাকে সব কথা খুলে বলছে না কেন?’

এক মুহূর্তে চুপ করে রইলেন ক্লেইবর্ন। ‘আসলে হয়েছে কী, ব্যাপারটার সাথে
অনেককিছু জড়িত-’

‘জড়িত তো আমিও।’ বলে উঠল জ্যান। ‘এক কাজ করো, খুব ব্যস্ত না হলে
আমার এখানে চলে এসো। ড্রিংকের আমন্ত্রণ রইল।’

ইতস্তত করলেন ক্লেইবর্ন। তার ইতস্ততভাবটা বুঝতে পেরে কাতর কষ্টে জ্যান
অনুরোধ করল, ‘পিল্জ এসো। আমার জানা খুব দরকার।’

‘ঠিক আছে, আসছি।’

স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জ্যান। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার
শুনতে পেল কান্নার আওয়াজ। ঘরের ভেতরে বসে খুব বেশি কানে লাগছে।
কান্নাটার মাঝে এমন একটা জরুরীভাব আছে যে অনেকটা বাধ্য হয়েই সে
পেছনের দরজার কাছে চলে গেল। আওয়াজটা ওপাশ থেকেই আসছে। কৌতুহল
রূপতে না পেরে, খুলে দিল দরজা। আর তখনই দেখতে পেল বিড়ালটাকে।

ছোট খাটো হলদে একটা বলের মতো গুঁটি পাকিয়ে শুয়ে আছে ওটা। দরজা
খোলা মাত্র সবুজাভ চোখে তাকাল জ্যানের দিকে। কোলে তুলে নেবার সময়
মেয়েটার মনে হলো, যেন কোনও হালকা পালক তুলছে। নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে,
গরগর করে উঠল বিড়াল। ‘কোথেকে এসেছ সোনা? হারিয়ে গিয়েছ? আহা
বেচারা! একদম ভিজে গিয়েছ দেখছি!'

র্যাক থেকে একটা ডিশ মোছার তোয়ালে তুলে নিয়ে, তেজা পশ্চমগুলো ঘৰতে
শুরু করল জ্যান। প্রথম প্রথম কাঁপছিল প্রাণিটা, বেশ কিছুক্ষণ পর শান্ত হলো।

‘এই তো হয়েছে। এখন ভালো লাগছে না?’ তোয়ালেট সিঙ্কের উপর রেখে দিল ও। ‘খিদে পেয়েছে?’

‘রাও,’ উত্তর দিল যেন বিড়াল বাবাজী।

‘দেখি তাহলে, কিছু পাওয়া যায় কিনা?’ বিড়ালটাকে কোল থেকে নিচে নামিয়ে দিল জ্যান। চুপচাপ... পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল ওটা। কিন্তু সবুজ চোখ জোড়া ঠিক জ্যানের উপর নিবন্ধ। ফ্রিজ খুলে এক কার্টন দুধ নিয়ে আসতে দেখল মেয়েটাকে।

কাপ বোর্ড থেকে একটা পিরিচ বের করে তাতে দুধ ঢেলে আপেক্ষমান অতিথির দিকে এগিয়ে দিল ও। ঠিক তখনই এসে উপস্থিত হলো তার অন্য অতিথি।

চাইমের শব্দ শোনা মাত্র তাড়াতাড়ি লিভিং রুমের দিকে এগোল জ্যান। তবে এবার আগে বাইরের বাতি জ্বালিয়ে, পিপ-হোল দিয়ে দেখে নিল আগন্তুককে। তারপর দরজা খুলল।

ভিজে একসা হয়ে যাওয়া অ্যাডাম ক্লেইবর্ন ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

‘তাড়াতাড়িই এসেছ।’ বলল জ্যান।

‘আমার মোটেলটা কাছেই। ভেঙ্গুরায়।’ জানালার দিকে চলে গেল ক্লেইবর্নের নজর। ‘তবে আরেকটু হলেই পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমনকী রাস্তার পাশে লাগানো সাইনগুলোও দেখতে পাচ্ছিলাম না। এখানে মানুষ একা থাকে কী করে?’

‘আমি একা, তা তোমাকে কে বলল?’ দুষ্টুমি করল জ্যান। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিড়ালটার গোলাপী জিহ্বা এখনও দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে।

হাসলেন ক্লেইবর্ন। ‘তোমার বন্ধু নাকি?’

‘বন্ধু না, বান্ধবি। আশা করি। এই কয়েক মিনিট আগে দেখা হলো।’

‘বান্ধবি? এই বিড়াল যে মেয়ে, তা কী করে বুবালে?’

‘মেয়েদের মন, অনেক কিছু বুবাতে পারে।’ বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিল জ্যান। ‘যাওয়া হয়েছে সোনামনি? এবার আমাদের খেতে দাও।’

‘রাও।’ বলে জ্যানের কোলেই শুয়ে রইল প্রানিটা।

বিড়ালটাকে কোলে নিয়েই লিভিং রুমে চুকল মেরেটি, পিচু পিচু ক্লেইবর্নও। প্রানিটাকে নামিয়ে রাখবে, এমন সময় ছোট ছোট থাবা দিয়ে ওটা আঁকড়ে ধরল জ্যানের সোয়েটার। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না জ্যান।

‘ছাড় রে বাবা! কিছুটা বিরক্তির সাথেই বলল সে।

‘অসুবিধা নেই,’ বলে বারের দিকে এগিয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন। ‘আমিই করছি। ক্ষচ অ্যান্ড রকস চলবে?’

‘চলবে মানে! দৌড়াবে।’ বলতে বলতে সোফায় বসে পড়ল জ্যান, কোলে শোয়া বিড়ালটা গরগর করছে। প্রানিটার উষ্ণ মাংসে ঘোরাফেরা করছে ওর হাত।

এমনকী ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়াও পরিকার বুঝতে পারছে। কী নাজুক একটা দেহ! অবচেতনমনেই জ্যানের হাত চলে গেল বিড়ালটার গলায়। এই তো নড়ছে, রক্তবাহী নালিকা থেকে থেকে লাফিয়ে উঠে জানান দিচ্ছে প্রাণের উপস্থিতির! আসলে আমরা সবাই...সব প্রাণিই এক। নাজুক...স্পর্শকাতর। মাত্র এক ইঞ্জির এক ভগ্নাংশ পুরুত্বের চামড়া আমাদেরকে রক্ষা করে চলছে-

‘পেনি’

চোখ তুলে ক্লেইবর্নের দিকে তাকালো জ্যান। ডাঙ্গারকে একটা গ্লাস ওর দিকে বাঢ়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল। ‘মানে?’

‘তোমার চিন্তা আমায় শোনালো, পয়সা পাবে?’ মুচকি হেসে বললেন ক্লেইবর্ন।

‘ওহ, নাহ। তেমন কিছু না।’ গ্লাসটা হাতে নিতে নিতে বলল ও।

‘তাহলে টাকা দেই? মুদ্রাস্ফীতির এই যুগে পয়সা দিয়ে কিছু হয় না!’ মেয়েটার পাশে বসে পড়লেন ক্লেইবর্ন। পিটপিট করে তাকাল বিড়াল, ডাঙ্গারকে দেখে যেন ভয় পেয়েই কার্পেটে নেমে পড়ল।

‘এই মাত্র কাকে নিয়ে ভাবছিলে? সত্যি করে বলো তো।’

‘মেরি ক্রেন।’ নামটা উচ্চারণ করার আগে নিজেও বুঝতে পারেনি যে অনেক বছর আগে খুন হওয়া মহিলাকে নিয়েই ভাবছিল ও।

‘মেরি ক্রেনের কোন ব্যাপার নিয়ে?’

‘আসলে ঠিক ওকে নিয়ে না, আমাকে নিয়েই ভাবছিলাম।’ ক্লেইবর্নের তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে সাহস হলো না জ্যানের। ‘পেশাগত বিড়ম্বনা বলতে পার। আচ্ছে আচ্ছে আমরা চরিত্রের সাথে এক হয়ে যাই।’

‘আর যা-ই করো, এই কাজটা করো না।’

ক্লেইবর্নের চোখে চোখ রাখল জ্যান, লোকটার মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে।

‘আমার হওয়া উচিং, হাজার হলেও আমি ওই চরিত্রেই অভিনয় করছি।’

‘উহ, ভুল করবে।’

গ্লাসের তরলটুকু গলায় ঢেলে দিল জ্যান। কিন্তু জিনিসটা পেটে গিয়ে যেন ওর রাগ আরও বাঢ়িয়ে তুলল। লোকটার সরল ব্যবহারে, চলচিত্র নিয়ে তার বাতিকের কথা ভুলতেই বসেছিল ও। কিন্তু না, মেজাজ হারালে চলবে না।

‘গ্লাজ,’ গলার ঘৰ নিয়ন্ত্রণে এনে বলল ও। ‘আগেও অনেকবার এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভিজিনি পরিবর্তিত চিত্রনাট্য মানবে না বলেই...’

‘আরও কিন্তু আছে।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘আজকে বিকালেই ঘটেছে ঘটনাটা।’

আরাম করে বসে, ডাঙ্গারের কথা শুনতে শুরু করল জ্যান। প্রথমে শুনল ভিজিনির সাথে মিটিংটার কথা। এ-ও জানল পরিচালক দেখতে অনেকটাই নরম্যান বেটসের মতো। রঘ আর ড্রিসকলের সাথে দেখা করার কথাও শুনল।

আগনের ব্যাপারে প্রযোজকের ব্যাখ্যা আর ভিজিনির ব্যাপারে ক্লেইবনের সন্দেহের কথাও শুনল।

‘এই সব?’ কথা শেষ হতে বলল মেয়েটা।

চোখ ছোট ছোট হয়ে এলো ক্লেইবনের। ‘আরও লাগবে?’

গ্লাস নামিয়ে রাখল জ্যান। ‘বিশ্বাস করা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছ।’

‘আমাকে বিশ্বাস না হলে, রয় অ্যামেসকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।’

‘কীভাবে তোমার কথা বিশ্বাস করব, বলো? প্রথমে বললে, নরম্যান বেঁচে আছে। এখন বলছ ও মৃত আর ভিজিনি স্টুডিওতে আগুন ধরিয়েছে।’

‘নরম্যানের ব্যাপারে আমি এখনও নিশ্চিত নই। মানছি, ভিজিনির ব্যাপারেও আমার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু ও যে নিজেকে নরম্যানের সাথে এক করে ভাবছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাই মেরি ক্রেনের মতো করে নিজেকে ভাবার ব্যাপারে না করছি।’

কখন যেন বিড়ালটা এসে জ্যানের পায়ে গা ঘষতে শুরু করেছে। প্রান্টাকে আদর করল ও।

‘আমি তো এই বিড়ালের মাঝেও নিজেকে খুঁজে পাই। কারণ কী জানো? কারণ আমি একজন অভিনেত্রী।’

‘প্রায় সবাই তাই করে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রেখে।’

‘প্রায় সবাই?’ সোজা হয়ে গেল জ্যান। ‘শুধু মনোবিদরা বাদে, তাই না? ওরা সব ধরনের মানসিক দূর্বলতার উর্ধ্বে।’

‘রাও।’ বিড়ালটাও যেন মেয়েটার সাথে একমত।

তবে জ্ঞ কুঁচকে তাকালেন ক্লেইবন। ‘আমাকে মনোবিদ হিসেবে না দেখে, মানুষ হিসেবে দেখ।’ বললেন তিনি। ‘আমরা কোনও কিছুর উর্ধ্বে বা নিচে না। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি। আমরা জানি, যিশু খ্রিস্ট বা অ্যাডলফ হিটলার, কারও মাঝেই নিজেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা ঠিক না।’

চোখে চ্যালেঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল জ্যান। ‘তুমি কার মাঝে নিজের ছায়া দেখতে পাও?’

‘সবার মাঝে।’ শ্রাগ করল ক্লেইবন। ‘অস্তত চেষ্টা করি। নরম্যানকে বুঝতে চেষ্টা করেছি-আমি ওর আবন্ধ মনোভাব বা ওর ঘৃণা বুঝতে পারি। মার্টি ড্রিসকলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার মাঝেও আছে। রয় অ্যামেসের মতো আমিও লেখক হতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম নরম্যানকে নিয়ে একটা বই লিখতে।’

জ্যানের মনে পড়ল ক্লেইবনের সাথে কাটানো গত সন্ধ্যাটার কথা। হঠাৎ করে অ্যাচিত কিছু অনুভূতি ভরে তুলল ওর মন্টাকে। মনের কেমন একটা উত্তাপ...আন্তে আন্তে বেড়ে উঠতে থাকা একটা রাগ অনুভব করছে সে। ক্লেইবন

কি বলছে, সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। কিন্তু ওর কষ্ট...সেই ভারী কষ্টটা কেন জানি ওকে উত্পন্ন করে তুলছে। ক্লেইবর্ন অভিনয় করছে, সে আসলেই চায় ওকে বোঝাতে। হঠাৎ ক্লেইবর্নকে সম্পর্শ করতে উদ্বৃত্তি হয়ে উঠল তার মন। কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিল সে। শারীরিক সম্পর্শের চাইতে, শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি নিরাপদ।

‘পল মরগ্যান?’ জানতে চাইল জ্যান।

নড করল ক্লেইবর্ন। ‘ওর সব আচরণ আমার পছন্দ হয় না। কিছুটা নিচতা আছে তার মাঝে। কিন্তু তার মতো আমিও হীনমন্যতায় ভুগি। নিজের ইমেজ নিয়ে চিন্তা করি। ভিজিনির ক্ষেত্রেও তাই। হয়তো বা আরও বেশি। কেননা আমিও এক এতিম।’

‘তুমি?’

নম্র গলায় কথা বলে উঠল ক্লেইবর্ন। ‘হ্যাঁ। এমনকী আমার বাবা-মা’র নামটা পর্যন্ত জানি না। আমার আসল নামটাও না। পার্থক্য কেবল একটা। ওর মতো আমি এতিমখানা থেকে পালাইনি।’ একটু বিরতি নিল সে। ‘তোমার ছোট বোনের কথা যখন বললে, তখন মনে হচ্ছিল সব কিছু যেন আমার চোখের সামনেই ঘটছে। হয়তো আমার মা...আমার মা’র অবস্থা হয়েছিল তোমার বোনের মতোই। মনে হচ্ছিল, আমি আর তোমার বোনের বাচ্চা যেন জমজ! চোখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। বুবাতে পারছ তো। অন্যের মনে কী চলছে, তা বোঝার জন্য তোমার নিজের ছায়া তার মাঝে খুঁজে বের করার কোনও দরকার নেই। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে, সবার মাঝেই নিজেকে খুঁজে পাবে।’

নড করল জ্যান। ‘আমিও মেরি ক্রেনের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাই। কিন্তু চেহারার মিল থাকার জন্য মাঝে মাঝে মনে হয়...আমি আসলেই মেরি ক্রেন। মনে হয়, যদি আমি ভালো অভিনয় করি, তাহলে হয়তো মেরিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হবে-’

‘যদি এর মানে হয়, তোমার নিজের জীবনের সমাপ্তি, তাহলে?’ সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি, হাতে হাত রাখলেন। ‘আমি জানি, এই চরিত্রটা তোমার কাছে কতোটা দামি। কিন্তু মনে রেখ, মেরি ক্রেন কেবল মাত্র একটা চরিত্র। সে মারা গিয়েছে, তুমি বেঁচে আছ। তোমার কী হলো, এখন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।’

ক্লেইবর্নের চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। বুবাতে পারল, লোকটা আসলে মন থেকেই বলছে কথা গুলো। জ্যানের কী হলো না হলো, তাতে ওর অনেক কিছু যায় আসে। নিজের হাতে লোকটার হাতের ঘর্মাঙ্গ সম্পর্শ টের পেল সে। লোকটা ওকে উষ্ণ করে তুলেছে, ব্যাপারটা অবশ্য ভালো। কেননা এতে অন্যান্য সব চিন্তা ওর মন থেকে দূরে সরে থাকছে। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে জ্যান, কিন্তু

ভয়টা এখনও আছে। তাই এখন আর এই মুহূর্তে, এই স্পর্শ আর অনুভূতির মাঝে ডুবে থাকতে চায় ও।

ক্লেইবর্নের আলিঙ্গনের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিল জ্যান, ঠোঁট দিয়ে খুঁজল লোকটার ঠোঁট। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল কেবল ওদের হস্যপন্দন একে অন্যের সাথে মিলে গিয়েছে। এখন সেই সাথে যোগ হলো ওদের দেহও। বুকে পুরুষালী আঙুলের স্পর্শ টের পেল জ্যান, কোমরে লোকটার হাত। নামছে, আরও নিচে নামছে ওটা-কিন্তু পরক্ষণেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ক্লেইবর্ন।

চোখ খুলে তাকাল জ্যান। ‘কী হয়েছে?’

‘জ্যান, আমার কথা শোন।’ ন্ম্ব কঠে বললেন লোকটা। ‘আমি জানি তুমি কী করতে চাইছ। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। তোমার নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ, ক্যারিয়ার চুলোয় যাক। এভাবে আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে কোনও লাভ নেই।’

ঘাট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল জ্যান। ওকে উঠতে দেখে ভয় পেয়ে লাফ দিল বিড়ালটাও। চুপ করিয়ে দিয়ে মানে? হারামজাদা, কী ভাবিস তুই নিজেকে—

‘আমি দুঃখিত।’ উঠে দাঁড়াচ্ছেন ক্লেইবর্ন। ‘আমি ওভাবে বলতে চাইনি। আমি তোমাকে চাই, সেটা তুমি জানো। কিন্তু এভাবে...এই পরিস্থিতিতে—’

গালে জ্যানের থাপ্পড় থেয়ে চুপ করে গেলেন তিনি। ‘এভাবে মানে? তুমি নিজে নিজে ঘটনা বানাচ্ছ। কিন্তু না, আর না। অনেক হয়েছে। বের হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, আমার জীবন থেকে।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে সদর দরজার কাছে চলে গেল জ্যান, হ্যাচকা টানে খুলে ফেলল ওটা।

‘বোকামী করো না,’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘তোমার বুঝতে হবে—’

রাগে যেন জ্যানের কান কাজ করা বন্ধ করে দিল, কিছু শুনতে পাচ্ছ না ও। এমনকি ক্লেইবর্নকে ঠিকমতো দেখতেও পাচ্ছ না। লোকটা যখন ওর কাছে এসে দাঁড়াল, এক ঘটকা দিয়ে সরে গেল সে। স্পর্শ করতে দিতে চায় না। ‘বেরিয়ে যাও বলছি।’

নেমে এল ক্লেইবর্নের হাত, নত মুখে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলল জ্যান। নিজেকে সামলাতে দরজার সাথে হেলান দিয়ে বসল, কাঁপছে। গাড়ির ইঞ্জিন চালু আর আস্তে আস্তে দূরে যাওয়ার শব্দ শোনার আগে, অনেক কষ্ট করেও স্বাভাবিক হতে পারল না। ঠিক হয়ে এল দৃষ্টি আর শ্রবণ শক্তি।

. সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, লিভিং রুমের চারপাশে নজর বুলালো ও। একদম খালি, এমনকী বিড়ালটাও নেই।

শোনার মতো কোনও শব্দও নেই।

এমনকী মিউ মিউ পর্যন্ত না!



সাতাশ

দুই ঘন্টা আর সাত গাস ক্ষচ শেষ করারও পরও, ঘূম ধরছে না জ্যানের। একা একা বিছানায় শুয়ে, মনে মনে ক্লেইবর্নের মুভু চিবাচ্ছে সে। অবশ্য থেকে থেকে নিজের উপরেও রাগ হচ্ছে ওর। দোষটা তো অনেকটাই ওর। প্রথমে মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এরপর হারিয়েছে ক্লেইবর্নকে। এমনকী বিড়ালটাও ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে গিয়েছে। অথচ সত্যি কথাটাই বলেছেন ডাঙ্গার। নিজের করে লোকটাকে পেতে চেয়েছিল জ্যান, কিন্তু শারীরিক আকর্ষণটাই একমাত্র কারণ ছিল না। ডাঙ্গারের ভেতর থেকে চলচ্চিত্রটার প্রতি বৈরিতাও সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। উন্মাদিনী-নামটা এখন মনে হচ্ছে ওর ক্ষেত্রেও খাটে।

পাগল ছাড়া অন্য যে কেউ বুবাতে পারত ক্লেইবর্নের আসল উদ্দেশ্য। তিনি আসলেই ওকে নিরাপদে রাখতে চেয়ে কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু কোন বিপদের হাত থেকে? আন্দাজ তো আর প্রমাণ হতে পারে না। হয়তো কিছু কথা ওর কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছে। রয়কে জিজ্ঞাসা করে দেখবে নাকি?

যা ভাবা সেই কাজ। বিছানার পাশের বাতিটা জালিয়ে, ফোনের দিকে হাত বাঢ়াল ও। রয়ের নাস্তার ডায়াল করল, কিন্তু কেউ ধরল না। রিসিভার রেখে দিয়ে, বাতি বন্ধ করে দিল আবার। কাঁধ পর্যন্ত কম্বল তুলে নিতে নিতে ভাবল, রয় ফোন ধরেনি, ভালোই হয়েছে। সম্ভবত সে-ও একই কথা বলত। উন্মাদিনী-তে অভিনয় না করানোর জন্য রাজি করাবার চেষ্টা চালাত। জ্যান পাগল হতে পারে, কিন্তু এতোটা পাগলও না। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। ওকে রাজি করাতে হলে, শক্ত প্রমাণ লাগবে।

গত পাঁচটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছে ও। বয়স তো দিন দিন কমে না, বরং বাড়ে। তাই এতো বড় সুযোগ এতো সহজে ছাড়বে না জ্যান।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মার্টি ড্রিসকল। সাধারণত, প্যাটিওর সামনে লাগানো কাঁচের দরজা দিয়ে আকাশের তারা আর নিচের উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ তারার কোনও হন্দিস নেই। সত্যি বলতে কী, বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেউ যেন ধূসর একটা দেয়াল খাড়া করে রেখেছে। মুখ কুঁচকে ফেলল ড্রিসকল, নিজেকে হঠাতে করে বড় বেশি বুড়ো মনে হচ্ছে।

বর্তমান যুগ, যৌবনের যুগ। দুধের বাচ্চারা এখন চলচ্চিত্র ব্যবসার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। বয়স্ক যে দু-চারজন আছে, তারাও নিজেদের আসল বয়স কমিয়ে

বলতেই পছন্দ করে। এই উপলক্ষি যখন হলো মার্টির, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মাথায় কলপ লাগিয়ে বা আলগা চুল লাগিয়ে ঘোরাফেরা করার দিন শেষ। এখন ওসব পরে ঘুরলে, লোক হাসবে। এখন ওর হাতে মাত্র একটা উপায় অবশিষ্ট আছে...এই মুহূর্তে বোকা বনে থাকাই, বুদ্ধিমানের মতো আচরণ।

একদম অভ্য আর গেঁয়ো আচরণ করে ড্রিসকল। নিজেকে উপস্থাপন করে অন্য সব প্রয়োজনকের মতো করেই-রচিছীন, প্রতিভাহীন একজন এক নায়ক হিসেবে। প্রিস্টনের ডিগ্রী আছে না নেই, তা নিয়ে এখানকার কারও কোনও মাথা ব্যথা নেই। যেমন মাথা ব্যথা নেই চলচিত্রের মান নিয়ে। দরকার শুধু বক্স অফিসে হিট করার, শুনগত মান চুলোয় যাক।

কাজে দিয়েছে বুদ্ধিটা। আর সেজন্যই ড্রিসকল এই মুহূর্তে নিজের বিশাল এক বাড়িতে বসে আছে। যেখান থেকে নিচের দিকে তাকালেই পরিষ্কার দেখা যায় স্টুডিওটাকে। আসলে ওর সর্বশেষ লক্ষ্য সম্ভবত সেটাই ছিলঃ সব আঙিক থেকে স্টুডিওকে পায়ের নিচে দেখা।

স্টুডিও'র ওরা ভাবে, ড্রিসকল মিয়া কালপা আর মিয়া ফারো-এর মাঝে পার্থক্যই করতে পারে না। এমনকী ওর স্ত্রীও এই রহস্যটা ধরতে পারেনি। ডেবরাহ-এর ধারনা, মার্টি এক মোটা সোটা টাকার কুমির মাত্র। বাচ্চাদেরকে নিয়ে এক সঙ্গাহের জন্য বেড়াতে গিয়েছে সে। আসলে বেড়াতে না, ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু প্রতিদিন একবার ফোন করে, ব্যাক অ্যাকাউন্ট রূপী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করে না। আচ্ছা, ড্রিসকল যে দেনার সাগরে ডুবে আছে, এ কথা জানলে মেয়েটা কী করবে? এই বাড়ি আর ঝর্ণার পাশে কেনা আরেকটা বাড়ি দ্বিতীয়বার বন্দক রাখা। বিল-টিলের কথা নাহয় বাদই থাক।

অবশ্য ড্রিসকলের কপাল ভালো থাকলে, এসব খবর ডেবরাহ কোনওদিন জানতেই পারবে না। কপাল-কপালটাই আসল। গত তিনটা চলচিত্র ভালো ব্যবসা করতে পারেনি। তিন নাঞ্চারটা বেরোবার পর, শুরু হয়েছে বাড়ি বন্দক রাখা।

কিন্তু উন্মাদিনী নিয়ে যখন ভিজিনি ওর সাথে দেখা করতে এল, তখন থেকে আবার ফিরতে শুরু করেছে ওর কপাল। তবে কপালের কথা কী আর বলা যায়? নরম্যানের পলায়ন আর ওর হাতে পাঁচ জন মানুষ খুন হবার পর, আবারও ভাগ্য ওকে ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। নিউ ইয়ার্কের ওরা তো পুরো প্রজেক্টটাই বাতিল করতে চেয়েছিল। রুবেন সেরকমই জানিয়েছে ওকে। ওদের ধারনা, এই ঘটনা পুরো ছবিটাকেই পুরাতন ইতিহাস বানিয়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে রুবেনকে বুঁবিয়ে-সুঁবিয়ে কয়েকদিন সময় চেয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল সে। তবে আগামীকাল সকালে আবার নতুন করে বসবে নিউ ইয়ার্কের হোমরা-চোমরারা। মিটিং-এ নেয়া হবে শেষ সিদ্ধান্ত।

সেই সাথে আবার যোগ হয়েছে ক্লেইবর্ন লোকটা। এখন পর্যন্ত রয় অ্যামেসকে সামলাতে পেরেছে সে। কিন্তু ক্লেইবর্ন ঝামেলার জন্ম দিয়েছে। আন্তে আন্তে আরও গাঢ় হচ্ছে তা। উন্মাদিনী থেকে যে কিছু লাভ তুলে আনবে, সে সম্ভাবনা হাওয়া হয়ে গিয়েছে প্রায়। আর আজ বিকালের কথা আর কী বলবে! স্যান্টো ভিজিনিকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলা সহজ, কিন্তু তার অর্থ তো এই না যে ওকে আগুন লাগাবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে। ড্রিসকল একটা সিগার ধরাল।

উচিং হয়নি, কেননা সিগারের আগুন ওকে অনেক কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কয়েকদিন আগের কথা, প্রোডাকশনের বীমা সংক্রান্ত নিয়মগুলো পড়ার সময় একটা বিশেষ লাইনে আটকে যায় ওর চোখ। যদি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবাই পূর্ণ পারিশ্রমিক পাবে। যেমন প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের মৃত্যু বা আহত হওয়া অথবা আগুনে পুড়ে সেট বা অভিনয়ের সরঞ্জামাদি নষ্ট হওয়া। কপাল ফিরছে বলে মনে হয়েছিল ওর। শুধু শুধু ঝুঁকি নেবার কী দরকার! টাকাটা তো চাইলে এখনই নিতে পারে সে। প্রযোজক হিসেবে স্টুডিও থেকে যে ফিং-টা পাবার কথা ছিল সেটা। যত টাকা এখন পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছে বলে দেখাতে পারত, তার পুরোটা ফেরত পেত! টিশুরের ইচ্ছার উপর তো আর মানুষের হাত চলে না। এই টাকাগুলো পেলে, শোধ হয়ে যেত সব ধার।

পরিকল্পনা একদম সহজ ছিল। গ্যাসোলিনের ক্যানটা সেটে নিয়ে যেতে কোনও কষ্ট-ই হয়নি। ভুল করে ফেলেছে গ্যাসোলিন ছড়িয়ে দেবার আগে বিছানার চাদরে আগুন ধরিয়ে। শিখাটুকু আর্ডের মনে সন্দেহ জাগাতে যথেষ্ট ছিল। বিছানার নিচে ক্যানটা ঠেলে দেবার সময় পেয়েছিল সে কেবল। এরপর পড়িমরি করে পাশের দরজা দিয়ে পালায়। অফিসে ফেরার পথেও কেউ দেখেনি ওকে। কিন্তু আসল কাজটার সময়-ই ভাগ্য পক্ষ নিল না।

নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়েই ক্লেইবর্নকে ওই বানানো গল্প শোনাতে হয়েছে ওকে। দিন দুয়োকের মাঝে চলে যাবে ওই মনোবিদ, রুবেনদের মিটিং-ও শেষ হয়ে যাবে। জর্জ ওয়ার্ড উন্মাদিনী'র প্রচারণা নিয়ে যে কথা বলছে, সেটা ওদেরকে বোঝানো কষ্টই হয়ে যাবে।

তবে তাতে কিছু যায় আসে না। মার্টি ড্রিসকল কষ্ট করে এতদূর এসেছে, সামনেও কষ্ট করেই চলবে। রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে পায়চারী করছে সে। বাতির আলো ঢেকে দিয়েছে কুয়াশা, কিন্তু আগামীকাল আবার জুলবে সেটা। বিশ্রাম নেয়া দরকার...দরকার আর মাত্র একটা দিন। যদি এগিয়ে যাবার নির্দেশ আসে, তাহলে অন্যরা কোন চুলোয় গিয়ে মরল, তাতে ওর কিছু যায় আসে না। খ্যাপাটে লেখক, মাথা নষ্ট মনোবিদ, বোকা মেয়েটা, প্রায় উন্মাদ পরিচালক আর নিজের প্রেমে মন্ত নায়ক-সবাই চুলোয় যাক।



আটাশ

রাতের অন্ধকারে ভিজিনি'র মনে হলো, মৃতরা ওর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।
মনে হলো, হট-টাবের বুদবুদ ভেদ করে উঠে আসছে ফুঁসকুড়ি পড়া দেহ আর
মাংসহীন সব মুখাবয়ব। কিন্তু এখানে তো কোনও হট-টাৰ নেই!

এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে সে, তা-ও জানে না। জায়গাটা কুয়াশা দিয়ে
ঢাকা, ও নিজেও তাই। কুয়াশা, বাঞ্প না। ঠাণ্ডা, গরম না। পাহাড় ধরে
শিকারীর মতো হাসছে সে, জানে আজকে নেশা করা উচিত হয়নি। এ-ও জানে,
আজ বাড়িতে থাকলেই ভালো করত। কুয়াশা আর রাতের চাদরে ঢেকে দিতে
হতো অঙ্গুত এই চিন্তাগুলোকে। কিন্তু এই চিন্তাগুলোর মন্ত্রণাতেই পিল খেতে বাধ্য
হয়েছে ভিজিনি। আর পিল ওকে বাধ্য করে ঘর ছেড়ে বেরোতে। নাহ, ভুল
হলো। চিন্তা নয়, সৃতি...সৃতি ওকে টেনে এনেছে এখানে। যে সৃতিগুলোর হাত
থেকে পালাতে চায় ও। মৃতদের যে সৃতিগুলো ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়। মামা মিয়া-
হ্যাঁ, মামা মিয়ার সৃতি। যে দিন তার গ্রামে সৈন্যরা এসেছিল, সেদিনের সৃতি।

সেদিন মামা মিয়া ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল টাউন ক্ষয়ারে।
রবিবারের লম্বা বিকাল বেলায় ওখানে পিকনিক করতে যেত ওরা। চমৎকার সব
সুর বাজাতো ব্যান্ড দল। তবে সেদিন ব্যান্ড দল ছিল না। যেখানে দাঁড়িয়ে গান
করত লোকগুলো, সেই জায়গাটাও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। সুর বলতে কিছু ছিল
না, ছিল পাথরের উপর বুটের আওয়াজ। চতুর্দিক থেকে ক্ষয়ারকে ঘিরে
ফেলেছিল সৈন্যরা। প্রথমে মদের নাগাল পেয়েছিল তারা, এবার মেয়েদের। মামা
যখন লোকগুলোকে দেখে পালাবার প্রয়াস পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে
গিয়েছে। ছোট ভিজিনিকে একটা টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল শুধু।
তার পরেই ধরা পড়ে সৈন্যদের হাতে।

পাঁচ-ছয় জন ছিল তারা, বেশি হতে পারে। নাকি অন্যরা পরে এসে যোগ
দিয়েছিল? জানে না ভিজিনি। কেননা সেই মুহূর্তে ও ছিল টেবিলের নিচে। নিজের
কান্না, সৈন্যদের উল্লাস আর মামার চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।
আচমকা বার বার একটা শব্দ হতে শুরু করল-ব্যাম, ব্যাম, ব্যাম। সেই সাথে
নড়ছিল টেবিলটা। ভিজিনির পুরোটা দুনিয়া তখন শব্দময় হয়ে গিয়েছিল-ব্যাম,
ব্যাম, ব্যাম। উধাও হয়ে গিয়েছিল চিৎকার, উধাও হয়ে গিয়েছিল হাসি। ছিল শুধু
ব্যাম, ব্যাম, ব্যাম। আর ছিল গুঙ্গিয়ে ওঠার আওয়াজ, মামা মিয়ার গোঙানি।
টেবিলের সামনে লেগে গিয়েছিল লম্বা একটা লাইন। অনেকক্ষণ পর পর এক
জোড়া বুট পরা পা সরে যাচ্ছিল ভিজিনি'র চোখের সামনে থেকে। সেখানে এসে

দাঁড়াচ্ছিল একই রকম বুট পরা অন্য এক জোড়া পা। ময়লা, কাঁদায় মাখামাখি হয়ে ছিল ওগুলো। আর পঞ্চম...নাকি পঞ্চদশ বুট জোড়ায় ছিল লালচে আভা। ওগুলো যে রক্ত, তা বুবাতে পেরেছিল ভিজিনি। কিন্তু মাথার ভেতরে, আর মাথার উপরে হতে থাকা শব্দের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেদিকেই তাকিয়ে ছিল।

সেই তখন থেকে ওর মাথার ভেতরে জায়গা করে নিয়েছিল শব্দটা-ব্যাম, ব্যাম

ব্যাম। পিল ছাড়া যার হাত থেকে কোনও রেহাই নেই।

সেদিন অনেক...অনেকক্ষণ পর বন্ধ হয়েছিল শব্দটা। হাসতে হাসতে বিদায় নিয়েছিল সৈন্যরা। চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেলে, বেরিয়ে এসেছিল ভিজিনি। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হা করে সবকিছু দেখছিল। মাত্র পাঁচ বছর বয়স ছিল সারা দেহ অসংখ্য ক্ষতে ভর্তি, রক্ত ঝরছিল। ওকে দেখতে পেয়ে ফিসফিস করে মামা বলেছিল। 'স্যান্টো!' পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারেনি। দুই ঠোঁটে মাঝখান থেকে রক্তমাখা একটা বুদবুদ বেরিয়ে এসেছিল কেবল।

অঙ্গন হ্বার আগে, সেটাই ছিল তার শেষ স্মৃতি।

হয়তো ঠিক তখনই মারা গিয়েছিল মামা মিয়া, হয়তো পরে। ভিজিনি জানে না, কারণ ওর পরবর্তী স্মৃতি কাতানিয়ার এক হসপিটালে জেগে ওঠা। ওর মামা মিয়ার কী হয়েছিল, তা কেউ জানত না অথবা তাকে বলেনি। ভিজিনি, যে শহরের নামে ওর নাম, সে শহরে আর কখনও পা রাখেনি সে। এতিমধ্যান্তে কেউ ওর পদবীর কথা জানত না বলে, স্যান্টো ভিজিনি-ই হয়ে গিয়েছিল ওর নাম।

আচ্ছা, সিসিলিয়ান মায়ের তাদের ছেলের এমন নাম রাখে কেন? অ্যাঞ্জেলো, স্যালভাতোর, স্যান্টো? নামে কী যায় আসে? তেরো বছর বয়সে যখন ও পালের্মোতে পালিয়ে আসে, তখন অ্যাঞ্জেলো নামের একজন ওকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। শিখিয়েছিল কীভাবে চুরি করতে হয়। হ্যাঁ, ওকে অনেককিছু শিখিয়েছে লোকটা। কিন্তু দেব-দূতের সাথে এই অ্যাঞ্জেলোর ছিল যোজন যোজন শিখিয়েছে লোকটা। কারাবিনিয়ারিং যখন ভিজিনিদের ছোট অপারেশনটা উদ্বারকর্তা হয়ে এসেছিল। কারাবিনিয়ারিং যখন ভিজিনিদের ছোট অপারেশনটা বরবাদ করে দেয়, তখন স্যালভাতোর বাঁচিয়েছিল ওকে। কিন্তু যে মাদক ব্যবসা করত ওরা, সেই মাদকের হাত থেকে বাঁচায়নি।

স্যান্টো নিজেও তো কোনও সেইন্ট বা সাধু ব্যক্তি না। কোনও সাধুর পক্ষে রোমা, মিলান আর মার্সেইতে যা হয়েছে, তা থেকে বেঁচে ফেরা সম্ভব না। যখন নগ্নতাকেই অশ্রীলতা ধরা হতো, তখন কোনও সাধু কী পারত স্লাফ ফিল্মঃ বানাতে?

উপরে উঠতে গিয়ে হোচ্চট খেল ভিজিনি। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে এখন। কুয়াশা এতটাই ঘন যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও, সাইনপোস্ট পড়া তো দূরে

থাক। এখন কোথায় আছে সে? ভাবছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের নিচে শক্ত
রাস্তা পেয়ে বুঝতে পারল। পাহাড়ের শীর্ষে এসে পৌঁছেছে। নাহ, ভুল হলো।
পাহাড়ের শীর্ষে না, সারা দুনিয়ার শীর্ষে। পকেটে একটা পিল এখনও আছে।
পানি ছাড়াই সেটা গিলে ফেলল ও।

সবকিছু ভুলে যাওয়ায় ভালো। মনে রেখে লাভ কী? মামা মিয়ার কথা ভুলে
যাও, ভুলে যাও আমাকে বড় করে তোলা যাজিকাদের কথা। আরএফ ফিল্মের
ওই কুন্টিটার কথা মনে রেখেই বা লাভ কী? ওই কুন্টিটার যা প্রাপ্য ছিল, তাই
পেয়েছে। মরাই উচিং ছিল তার। ছুরিটা বের করার আগ পর্যন্ত হাসছিল সে।
গুঙ্গিয়ে উঠছিল থেকে থেকে...থেকে থেকে করছিল শীত্কার।

আচ্ছা মামা-মিয়ারও কি ভালো লাগছিল তখন? ব্যথা পেয়ে গুঙ্গিয়ে ওঠা আর
আনন্দে গুঙ্গিয়ে ওঠার মাঝে পার্থক্য কী? পাঁচ বছরের এক বাচ্চার সেটা বোঝার
কথা না। আর এখন নিশ্চিত হবার কোনও উপায় আছে কি। খোপের আড়ালে
যখন এক নামহীন পুরুষের সাথে গড়াগড়ি করছিল সে, যখন ভিজিনিকে পেটে
ধরার প্রক্রিয়া সমাধা করছিল, তখন নিশ্চয় খুব ভালো লেগেছিল মামা মিয়ার!

বাকি রইল নরম্যান বেটসের মা-কামিয়ে ফেলা গোঁফের জায়গায় আঙুল
বুলালো ভিজিনি। নরম্যানের চরিত্রে কিন্তু তাকে খুব মানাত। কেননা ভিজিনি
নরম্যানকে বোঝে। কিন্তু না, চরিত্রটা পেল কে? পেল নরম্যান। অথচ নরম্যানের
ব্যাপারে তার কোনও ধারনাই নেই। আসলে কারওই ধারনা নেই, এমনকি
ডাঙ্কারদেরও না। শুধু আছে ওর, স্যান্টো ভিজিনির।

গত বছর ফেয়ারভিলে গিয়েছিল ও। হোটেলের ধ্বংসাবশেষ, বাড়িটা-সব
দেখে এসেছে। ভেবেছিল একদম আসলের মতো করে বানাবে উন্মাদিনী। সফল
হবে চলচ্চিত্রটা।

ড্রিসকল এসব বোঝে না, লোকটা শুধু টাকা চেনে। তার দরকার শুধু
অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হওয়া, গুণগত মান চুলায় যাক। কিন্তু ভিজিনির মতো
একজন আর্টিস্টের কাছে মানটাই আসল। এমন এক দুনিয়ায় আছি আমরা,
যেখানে মেয়েরা তাদের সব নং রহস্যগুলো স্কার্টের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। তাই
এই দুনিয়ায় দরকার ওর মতো...নরম্যানের মতো মানুষদের। গোপন রহস্যটা
বের করার জন্য, অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ করে শান্তি দেবার জন্যই ওদের জন্য। মেরি
ক্রেনের সাথে সেটাই করেছে নরম্যান...যেমনটা ও করবে জ্যানের সাথে।

পিট পিট করে তাকাল ভিজিনি, কুয়াশা ভেদ করে দেখার প্রয়াস পাচ্ছে।
পিলের সংখ্যাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। বাইরের মতো, ওর মাথার ভেতরেও
কুয়াশা ভর করে আছে। তবে কেন এখানে এসেছে, তা এখনও ভুলে যায়নি।

জ্যান, মেরি ক্রেনের মতো দেখতে মেয়েটা। এই একটামাত্র কারণেই ওকে
বেছে নিয়েছে ভিজিনি। তবে শুধু দেখলেই তো হবে না, ওকে মেরি ক্রেনের

মতো আচরণ করা শেখাতে হবে। বেচারা নরম্যানের দিকে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল চোরটা। জ্যান হার্পারের ভেতর থেকে বাড়তি সবকিছুকে সরিয়ে ফেলতে হবে ওর। এমনভাবে কাজটা করতে হবে, যেন ওর শুধু মাংসটুকুই অবশিষ্ট থাকে। এরপর শাওয়ারে যে মেরি ক্রেন ছিল, ঠিক ওর মতো বানাতে হবে জ্যানকে।

আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশা। মনের চোখে ভিজিনি দেখতে পেল জ্যানকে। নগ্ন মেয়েটা চরম পুলকে শীৎকার করছে। আসল চরম পুলক কখন হয়, জানে কি মেয়েটা? যখন মৃত্যু আসে।

নরম্যানকে পছন্দ করি আমি। মেরি ক্রেনকে নিশ্চয় সে বুবিয়ে দিয়েছে, বুবিয়ে দিয়েছে কে আসল পুরুষ। ভিজিনি'ও তাই করবে। জ্যানের সাথে...

...গুঙিয়ে উঠল জ্যান। বিছানায় দারুণ খেল দেখাচ্ছে রয়। অসাধারণ! ছেলেটার চেহারার দিকে তাকিয়ে তার আদর উপভোগ করতে আরও ভালও লাগছে। আচমকা রয়ের চেহারা হয়ে গেল ক্লেইবর্নের চেহারা। ওর দেহের উপর শুয়ে আছে ডাঙ্গার, ঠিক যেমনটা ও চেয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ এক রাইল না চেহারাটা। এই যে এখন...পল মরগ্যান সঙ্গম করছে ওর সাথে! চোখ বন্দ করে ফেলল জ্যান, নিষেধ করছে ওকে। কিন্তু আবার যখন চোখ খুলল তখন বুবাতে পারল, কোথাও কোনও সমস্যা আছে। পলের চেহারা উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন তার হান নিয়েছে স্যান্টো ভিজিনি।

পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে লোকটা, বগল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে সুগন্ধিযুক্ত ঘাম।

উঠে বসল জ্যান, হাত দিয়ে ভিজিনির চেহারা খামচে ধরার প্রয়াস পেল। কিন্তু এখন ওই দেহটার কোনও চেহারা নেই। চেহারার জায়গা কেমন যেন ধোয়াশে হয়ে আছে। কিন্তু জ্যানের অন্তরাত্মা জানে, লোকটা নরম্যান বেটস না হয়ে যায় না। এতক্ষণ ধরে দেখা চেহারাগুলো আসলে মুখোশ। এখন লোকটার আসল চেহারা বেরিয়ে এসেছে। আচমকা সেই চেহারাটা দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল ওর মনে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র চিঢ়কারে আসলেই চোখ খুলে তাকাল সে, ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রথম প্রথম শোবার ঘরের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। কিন্তু আবার হলো সেই চিঢ়কার, সেই সাথে দরজায় দম-দম ঘুষির শব্দ। দেহের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে, বাতি জ্বালাল ও। বিছানা ছেড়ে স্লিপার পায়ে গলাতেও বেশিক্ষণ লাগল না। দৌড়ানোর মাঝেই হাতে তুলে নিল রোবটা।

‘আমাকে টুকতে দাও-’ দরজার ওপাশ থেকে কনিং আওয়াজ ভেঙ্গে এল।

দরজা খোলার পর জ্যান দেখতে পেল, মেয়েটা প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে! কুয়াশার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়, চোখ দিয়ে পানি ঝাড়ছে ওর।

‘কী হয়েছে?’

‘কেবল বাসায় এলাম।’ বাচাদের মতো বেঁকে গেল ক্রম্পনরত চেহারাটা।

নড় করল জ্যান, বুবতে পেরেছে। জানতে চাইল, ‘তোমার চাবী কই?’

‘পার্সে-খুঁজে পাচ্ছি না। লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে।’

‘লোকটা? কোন লোকটা?’

কনি হাত দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার দিকে ইশারা করল। ‘গাড়ি থেকে বের হয়ে দেখি, গাছের নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল... মনে হচ্ছিল আমাকে ধরতে এসেছে।’

কাঁপতে থাকা মেয়েটার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিল জ্যান। ‘আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।’

‘আমার চিংকার শুনে পালিয়েছে হয়তো। কিন্তু আসলেই কেউ ওখানে ছিল। আমি দেখেছি।’

রোবটা গায়ের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে, রাস্তার দিকে এগোতে শুরু করল জ্যান।

সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে বাঁধা দিতে চাইল কনি। ‘না! যেও না!’

কিন্তু জ্যান ততক্ষণে গাছগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। নিচু হয়ে ছোট বিড়ালটাকে তুলে নিল ও। বাঁধা দিল না বিড়ালটা, এমনকী নড়লও না এক বিন্দু।

নড়বে কীভাবে?

ওটার গলা যে কেউ একজন প্রবল আক্রোশে কেটে ফেলেছে!



উন্নিশ

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন ক্লেইবর্ন, কিন্তু নিজেকে তার বড় ঝুল্ট মনে হচ্ছে। মনের মধ্যে অনেক কিছু চলছে, হিসাব মিলাতে হচ্ছে অনেক কিছুর। উঠে দাঁড়িয়ে কামিয়ে নিলেন তিনি। পোশাক পরার অবকাশে গত চবিশ ঘন্টার ঘটনাবলী আরেক বার মনে করে নিলেন। ভিজিনির মুখোমুখি হওয়া, ড্রিসকলের সাথে দেখা হওয়া, এমনকী জ্যানের সাথে তর্কাতর্কিও বাদ পড়ল না।

তর্কাতর্কি? শুধু তর্কাতর্কি বললে, কমই বলা হয়। একবার যদি মেয়েটাকে বোঝাতে পারতেন সব কিছু! জ্যানের নিরাপত্তা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জ্যান নিজে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পারেননি বোঝাতে। একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। শনিবার আজ, সময় আর বেশি নেই হাতে। তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গিয়ে স্টাইনারকে কল করলেন তিনি।

‘হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন,’ বলল ঝুরারা। ‘বৃহস্পতিবার রাতে তাকে কাউন্টি জেনারেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে যে তার নিউমোনিয়া হয়েছে। সারা সপ্তাহ এখানে বৃষ্টি হয়েছে—’

মেয়েটাকে বকবক করার সুযোগ না দিয়ে, বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করলেন তিনি। না, ডা. স্টাইনারকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে নেয়া হয়নি। কিন্তু কোনও ফোন বা অতিথির সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। সামনের কয়েক দিনে দেয়াও হবে না। আর না, করোনারের অফিস থেকেও তেমন কিছু জানাইনি। যতদূর সে জানে, সোমবারের আগে জানা যাবেও না। ‘ততদিনে অবশ্য আপনি এখানে ফিরে আসবেন। আপনিও নেই, ডা. স্টাইনারও নেই। হাসপাতালে যে কী চলছে—’

ঝুরাকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে, ফোন রেখে দিলেন তিনি। কয়েকদিন হলো এখানে এসেছেন, অর্থচ বলতে গেলে কোনও কাজই করতে পারেননি। ঠিক বলেছিলেন স্টাইনার, ক্লেইবর্ন গোয়েন্দা নন। তার উপর মনোবিদ হিসেবে যে কাজটা করা তার একদম উচিত হয়নি, সেটাই করে বসেছেন, মানুষের প্রতি এতোটা আগ্রহী হয়ে পড়েছেন যে এই মুহূর্তের সমস্যার দিকে নজর দেননি।

বিছানায় বসে পড়লেন তিনি; এখন কী করা যায় আর কোন পথে এগোনো যায়, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করলেন। কী ভেবে আবার ফোন তুলে নিলেন হাতে। দুটো নাস্থারে কল করলেন তিনি। এরপর বাথরুমে গিয়ে, মাথা রাখলেন পানির ট্যাপের নিচে। জানেন যে এখন আবার চুল আঁচড়াতে আর শার্ট

বদলাতে হবে, কিন্তু ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ বেশ ভালো লাগল। পকেটে চাবী আছে নিশ্চিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন, অনেক আগেই বারোটা বেজে গিয়েছে। অথচ এখনও নাস্তা করা হয়নি তার। এখন অবশ্য সময় নেই আর। আর যা শুনলেন, তার পর-

‘হ্যালো।’ টম পোষ্ট তার অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ‘কফি চলবে নাকি?’

‘একটু ব্যস্ত আছি। একজনের সাথে দেখা করতে হবে।’

‘দেরি হবে না। বানানোই আছে।’

পোষ্ট পথ দেখিয়ে তাকে অফিস ঘরে নিয়ে এসে বসাল। ‘তেতরে বসে আরাম করেই থাই।’

ঘরটাকে আরামদায়ক বলা যায়, অন্তত এককালে ছিল। আসবাব পত্র তখন নতুন ছিল নিশ্চয়। এখন ধূলো পড়েছে ওতে, স্যাত স্যাতে হয়ে গিয়েছে পরিবেশ। ল্যাম্পের আলোতে কেবল দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো এখনও চকচক করছে।

বুড়ো লোকটা কফি ঢালার কাজে ব্যস্ত হলে, ক্লেইবর্ন দেয়ালের দিকে নজর দিলেন। বাইরের অফিসের দেয়ালের মতো এখানকার ছবিগুলোও কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর। তবে একজনকেও চিনতে পারলেন না তিনি। টম পোস্ট এগিয়ে এসে তার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিল। ‘ক্রিম আর চিনি লাগবে?’

‘নাহ, কালো কফিই ভালো। ধন্যবাদ।’

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেইবর্ন বুঝতে পারলেন, এমন কিছুর অপেক্ষাতেই ছিলেন তিনি। কালো কফি, ঠাণ্ডা পানির চাইতে অনেক বেশি জাদু দেখাল।

‘গরম পড়েছে সকালে,’ বলল পোস্ট। ‘তবে রাতে কুয়াশা এসে সব ঠাণ্ডা করে দেবে। এই সময়টায় সাধারণত এরকমই হয়।’ দেয়ালের দিকে চলে গেল তার নজর। ‘চেনা যায় কাউকে?’

‘নাহ।’

‘অবাক হলাম না। এরা যখন বিখ্যাত ছিল, তখন সম্ভবত আপনি ছায়াছবি দেখা শুরুও করেননি।’ একটা সরু আঙ্গুল দিয়ে ছবির দিকে নির্দেশ করে আবার বলল, ‘এ সল মরিস। করনেট স্টুডিওস এর প্রধান ছিল। আর এ হচ্ছে—’ একে একে সবার সাথে ক্লেইবর্নকে পরিচয় করিয়ে দিল টম। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো শেষ হলে, ঘরের অন্দরকার কোনার দিকে চলে গেল পোস্ট। একদম একা, সবার থেকে আলাদা হয়ে ঝুলতে থাকা ছবির উপরের বাতিটা জুলাল।

অসাধারণ আর অভিজ্ঞত। তৈলচিত্রটাকে এরচেয়ে কম কোনও বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। ছবির মেয়েটা বয়সে তরুণী আর চোখ ধাঁধানো সুন্দরী।

মেয়েটার চোখ আর হাসিও খুব পরিচিত বলে মনে হলো। ‘ডন পাওয়ারস।’ হাসল
বৃক্ষ। ‘এই মোটেলের নামটাও তার নামানুসারে।’

‘আমি সম্ভবত এই নায়িকার ছবি দেখেছি।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘অভিনেত্রী
ছিলেন নিশ্চয়?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু সাইলেন্ট ছবিতে অভিনয় করেছেন শুধু। ইতিহাসের সেরা
অভিনেত্রী হবার যোগ্যতা আর সন্তানবনা, সবই ছিল তার।’ শেষের দিকে আবেগে
যেন মুদে এল টম পোস্টের গলা।

চকিতে লোকটার দিকে তাকালেন ক্লেইবর্ন। ‘প্রেমে পড়েছিলেন নাকি
মেয়েটার?’

‘এখনও পড়ে আছি।’

‘কী হয়েছিল তার ভাগ্যে?’

শ্রাগ করল পোস্ট। ‘কিছু না। এই ইভাস্ট্রির বাইরের একজনকে বিয়ে করে
ছিল। অনেক আগেই মারা গিয়েছে।’ বাতি বন্ধ করে, ক্লেইবর্নের দিকে তাকাল
সে। ‘এই যতজনের ছবি দেখলেন, তারা আর কেউ এখন নেই। অতি দ্রুত
আমিও থাকব না। হয়তো সেটাই সবার জন্য ভালো হবে। আমার জন্যও।’

‘এতো তাড়াহুড়োর কী আছে! এখনও স্বাস্থ্য আপনার ভালো।’

‘যখন খারাপ হতে শুরু করবে তখন?’ মাথা নাড়ল পোস্ট। ‘আমি নার্সিং
হোমগুলো ঘটক্ষে দেখেছি। ওখানে মানুষ থাকে নাকি?’

ক্লেইবর্ন কফির খালি কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন। ‘যেতে হয়-’

‘মাফ করবেন, অনেক বক বক করে ফেলেছি।’

‘ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। আমার ভালোই লেগেছে।’

‘ধন্যবাদ।’ মুচকি হাসল পোস্ট।

ক্লেইবর্ন এগিয়ে যেতে, অনুসরণ করল সে-ও। ‘একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে
ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি একটা ছবির কথা বলছিলেন, উন্মাদিনী। ওটার কী
থবর?’

‘সে এক লম্বা কাহিনী।’

‘শুনতে আপত্তি নেই।’ পোস্ট দরজা খুলে ধরলে, বেরিয়ে গেলেন ক্লেইবর্ন।
‘আপনি যদি ছয়টার দিকে ফি থাকেন, তাহলে রাতের খাবারটা আমার সাথেই
খান না কেন? আমি বিশ্ব সেরা রাঁধুনি নই। তবে যা রাঁধি, তা মুখে তোলা যায়।’

‘কোনও অসুবিধা নেই।’ বলল ক্লেইবর্ন। ‘বিকালেই ফিরে আসব। তখন
জানাই?’

‘আমি এখানেই থাকব।’ আবারও হাসল পোস্ট।

গাড়িতে উঠে বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার পরও যেন হাসিটা বাজাইল ওর
কানে। টমের এই আন্তরিক ব্যবহারের কারণটা কি শুধুই একাকীত্ব আর

কৌতুহল? যতদূর মিশেছে, তাতে তো লোকটাকে দিন-দুনিয়ার উপর বীতশ্রদ্ধ বলে মনে হয়। অন্ধকারে দিনের পর দিন একা একা বসে থাকা, অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকা, মৃতকে জীবিত করার চেষ্টা করা-এসব তো নরম্যানও করত। বেটস মোটেল নামে একটা মোটেলও ছিল ওর।

নাহ, একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে। পোস্টের মধ্যে তার মা সংক্রান্ত কোনও জটিলতা নেই, আর মহিলার মৃতদেহও লুকিয়ে রাখেনি। শুধু ভালোবাসত, এমন এক মেয়ের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে অফিসে। তবে মেয়েটা মৃত-এমন এক মৃত মেয়ে যার হাসি আর চোখ অন্য একজনের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক আগে দেখা একটা ফটোগ্রাফ...মেরি ক্রেনের ফটোগ্রাফ। সেই হাসি...সেই চোখ।

ধূর ছাই, কী সব ভাবছে এগুলো। দুনিয়াতে মোট সাইত্রিশ ধরনের চেহারা আছে। অন্য সব চেহারা সেই সাইত্রিশটারই সংযোজন বা বিয়োজন। ক্রেন মেয়েটার মতো হাসি বা একই রকম চোখ, এরকম মেয়ে খুঁজলে হাজারটা পাওয়া যাবে। এই যেমন জ্যান হার্পার।

মেয়েটার কথা মনে পড়তেই, মাথা নাড়লেন ক্লেইবন।

চাইলেই তুমি মেয়েটাকে গত রাতে পেতে পারতে। তাহলে এই সাধু গিরি কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্লেইবন। এই কেন'র উত্তরটা তিনি জানেন। তিনি মেয়েটাকে চান, তবে একরাতের জন্য না। চান অসীম কালের জন্য। যদি মেয়েটা ওকে মাফ না করে, বা মেয়েটার কিছু হয়ে যায়-একটু আগে করা ফোনকল দুটোর কথা মনে পরে গেল ওর। এই প্রথম, সন্দেহ ছাড়াও দেখাবার মতো কিছু প্রমাণ আছে তার হাতে। মার্টি ড্রিসকলকে পেলে, সেটা অন্ত হিসেবে ব্যবহার করতেও পিছ পা হবে না ও।

কিন্তু পার্কিং লটে গাড়ি রেখে যখন তিনি প্রাশাসনিক ভবনের দিকে এগোলেন, তখন দেখতে পেলেন, ড্রিসকলের অফিস তালা দেয়া। এমনকী মিসেস কেজিও শনিবার বিকালে কাজ করেন না। আসলে তার ফোন করে আসা উচিত ছিল। তবে কপাল ভালো থাকলে, রয় অ্যামেসকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অ্যামেসের কিউবিকলটার দরজা খোলা, কেউ নেই ভেতরে। তাহলে কি এখনও লটেই আছে ও।

খালি রাস্তায় ফিরে গিয়ে, স্টেজ সেভেনের দিকে এগোলেন তিনি। আজকে না জ্যানের রিহার্সালের জন্য আসার কথা? ভিজিনিও থাকবে সম্ভবত। হয়তো রয় ওখানেই গিয়েছে।

কেউ একজন আছে ওখানে, কেননা দরজাটা হা হয়ে আছে। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ বা আলো আসছে না বললেই চলে। হালকা একটা আভা

ভেসে আসছে বেডরুম থেকে, আগুন যেখানে ধরেছিল। সেখানেই তিনি দেখেছিলেন বেটস মোটেলের ছয় নাম্বার স্টলের বাথরুম আর স্টল।

নিজে অবশ্য স্বচক্ষে ওটা কখনও দেখেনি। নরম্যান তার রোগী হবার অনেক আগেই জায়গাটা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তবে নরম্যানের মুখ থেকে শোনা গল্পে, খুব পরিচিত মনে হতো জায়গাটাকে। লোকটার বর্ণনায় বাদ পড়েনি ওখানকার টাইলস করা দেয়াল, পোর্সেলিনের জিনিসপত্র, উজ্জ্বল ফসেট আর শাওয়ারের ভারী পর্দা। অপরাধ সংগঠন ছুল। এক মুহূর্তের জন্য অপরাধ সংগঠনের মুহূর্তটাও চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনি। দেয়ালে লেগে আছে লাল লাল ছোপ, স্টলের মেরোতে পরে থাকা দেহটাকে ঘিরে আছে গোলাপী রঙের পানি। অন্য অবয়বটা দাঁড়িয়ে আছে লাশ্টার পাশে।

কিন্তু না, এটা সেই অকুস্তল না। এটা ছবির জন্য ব্যবহৃত একটা সেট। আর অন্য অবয়বটা রয় অ্যামেস।

‘আপনি এখানে কী করছেন?’ জানতে চাইল রয়।

‘তোমার খোঁজেই এসেছি।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘কাল রাতে ফোন করেছিলাম। কই ছিলে?’

‘এখানেই।’ নড় করল লেখক। ‘নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই পুরো স্টুডিওতে। সেটাই প্রমাণ করতে চাইছিলাম। হয়তো কুয়াশা ছিল বলে কাজটা সহজ হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা হলো, যে কেউ ওই দেয়াল ভেদ করে এপাশে চলে আসতে পারবে। দেশুরকে ধন্যবাদ যে জ্যান আজকের রিহার্সেলটা বাতিল করেছে।’

‘বাতিল?’

‘আজ সকালেই কথা হলো। গত রাতের ঘটনাটার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি।’ রয়ের কঠে অভিযোগ না থাকলেও, লোকটার চোখে চোখ রাখতে পারলেন না ক্লেইবর্ন। রয় আসলেই মেয়েটাকে ভালোবাসে, নিজেকে বললেন তিনি। ধ্যান্তেরি, অন্যদের জীবনে কেন যে নাক গলাই আমি। রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, ‘আমাদের মাঝে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বটে। কিন্তু তাই বলে—’

‘নাহ, সেই ঘটনার কথা বলছি না।’ বলে বিড়ালটার ব্যাপারে জানাল অ্যামেস। শুনতে শুনতে ছোট হয়ে এল ক্লেইবর্নের চোখ। ছোট্ট একটা প্রানির গলা কাটা!

আচমকা ভিজিনি আর ছোরার কথা মনে পরে গেল তার। কিন্তু কেন-?

‘জ্যানের অনিচ্ছার কারণ বুঝতে পারলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী হয়েছে বলে মনে হয়?’

‘ভাবতে দাও।’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘আগে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নেই।’

‘বলুন।’

‘আজ দুপুরে আমি কয়েক জায়গায় ফোন করেছিলাম। প্রথমে করি এখানকার নিরাপত্তা বিভাগে। যে লোকটা দায়িত্বে আছে, তাকে চেয়েছিলাম।’

‘মানে, ট্যালবটকে?’

‘হ্যাঁ। লোকটা আজ অফিসে আসেনি। তবে এখান থেকে তার বাড়ির নাম্বার নিয়ে ওখানে ফোন করেছিলাম।’

‘কোনও বিশেষ কারণ?’

‘গতকাল আগুন ধরার পর, মার্টি ড্রিসকলের সাথে ওর যে কথা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আর গ্যাসোলিনের ক্যানে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম।’

‘নতুন কিছু জানতে পারলেন?’

‘কয়েকটা জিনিস জেনেছি।’ নড় করলেন ক্লেইবর্ন। ‘প্রথমত, ট্যালবট ক্যানটা পরীক্ষা করেনি। সে গত বৃহস্পতিবার থেকে লাস ভেগাসে আছে। আস সকালে এসে পৌঁছেছে। তার মানে, সে গতকাল স্টুডিওতে আসেইনি।’

‘তাহলে যে লোকটা আগুন ধরাল-’

‘লয়েড পার্সনস? ও নামে কেউ স্টুডিওতে কাজ করে না। ট্যালবটের মতে, কেউ কখনও করেনি।’

‘ড্রিসকল মিথ্যা বলেছে।’ জ্ঞ কুঁচকে ফেল অ্যামেসের। ‘ভিজিনি’র অপরাধ ঢাকতে চাইছে?’

‘হয়তো...’ আন্তে আন্তে সব কিছু খাপে খাপে মিলে যেতে শুরু করেছে।

‘জানি, শুনতে অবিশ্বাস্য শোনায়-’

‘আর বিড়ালের ব্যাপারটা...’ বললেন ক্লেইবর্ন। ‘ভেবে দেখ, জ্যানের চুল সোনালী। বিড়ালের দেহের রঙ হলুদ। হয়তো জ্যানকে হাতের কাছে না পেয়ে, তার জায়গায় বিড়ালটাকে হত্যা করেছে।’

‘হায় স্টশুর! ভিজিনি এমন কাজ করবে।’

‘আমি জানি না,’ শ্রাগ করলেন ক্লেইবর্ন। ‘কিন্তু নরম্যান হলে করত।’

‘কী বোঝাতে চাইছেন?’

‘আগের কাজ আগে। এখন দরকার ড্রিসকলের সাথে কথা বলা। ওর বাড়ির নাম্বার আছে?’

‘হ্যাঁ। আমার অফিসে আছে।’

‘তাহলে ওখান থেকেই ফোন করবে। এবার আর ওকে এড়িয়ে যেতে দিব না। হয়তো সে উন্মাদিতী বানানো বন্ধ করবে, আর নয়তো আমরা পুলিশের কাছে যাব।’

দুজনের কেউই জানে না, অন্ধকারে অঞ্চলগুপ্ত করে থাকা একজন ওদের সব কথা শুনছে!



ত্রিশ

পুলিশ!

স্যান্টো ভিজিনি টের পেল, অঙ্গুত এক আক্রোশ ওর ভেতর মাথাচাঢ়া দিয়ে উঠছে। আক্রোশটা যেন তিতা কোনও বন্ধ, কেননা এই মুহূর্তে ওর মুখের ভেতরটা কেমন এক তেতো স্বাদে ভবে উঠেছে। কিন্তু কোনও কথা না বলে, চুপ করে রইল সে। আগে যখন স্টেজে এসে আরেকটু হলে ধরা পড়তে নিয়েছিল, তখনও নিরবতা ওকে রক্ষা করেছে। এখনও করবে। অ্যামেস আর ক্লেইবর্নকে বেরোতে দেখে, অন্ধকারের মাঝে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। অন্য পাশের খোলা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে, উপস্থিত হলো স্টুডিও স্ট্রাইটে। এরপর কী মনে করে যেন পিছু নিল দুজনের।

প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে অ্যামেস আর ক্লেইবর্ন অদৃশ্য হয়ে গেলে, আর অন্ধকারের আড়াল প্রয়োজন হলো না ভিজিনি'র।

হলে প্রবেশ করে সে টের পেল, রাস্তার মতো ওটাও ফাঁকা। ভালো তো, সৌভাগ্য এখনও ওকে ছেড়ে যায়নি। অ্যামেসের কিউবিকলের দরজাটা খোলা, ওটার পাশের অফিসটার দরজাতেও তালা দেয়া নেই। ভিজিনি সাবধানতার সাথে দরজাটা খুলে, দেয়াল যেঁষে দাঢ়াল।

অ্যামেস ফোনে কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। এখান থেকে সব শুনতে না পারলেও, টুকরো টুকরো কথা ঠিক শোনা যাচ্ছে। 'নাহ, ফোনে ওসব কথা হবে না। দেখ, আমি তর্ক করতে চাচ্ছি না। তুমি শুনতে না চাইলে, পুলিশকে খবর দিব।' পুলিশ, আবারও সেই আক্রোশ জন্মানকারী শব্দ! 'অবশ্যই আমি সিরিয়াস! এখন সবকিছু তোমার হাতে। তোমাকে শেষ একটা সুযোগ দিছি...কখন? তার আগে পারবে-ই না? ঠিক আছে, তাহলে সেই সময়টাতেই আমরা থাকব।' ফোন রেখে দিল অ্যামেস।

ক্লেইবর্নের কথা শুনতে পেল ভিজিনি। 'কী বলল?'

'একঘন্টা পর একটা মিটিং-এ বসবে ড্রিসকল। রুবেন, বার্নি ওয়েনগাটেন আর নিউ ইয়ার্ক অফিসের কয়েকজনের সাথে। তার পর, আজ রাত আটটার দিকে আমাদের সাথে দেখা করতে পারবে।'

'তোমার কী মনে হয়, পারবে?'

'পারতে হবে। আমার তো মনে হয়, ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। তেড়িবেড়ি করবে না।'

‘ঠিক আছে। আজ রাতে আমার মোটেল মালিকের সাথে খাবার খাওয়ার কথা।
আমাকে ঠিকানাটা দিয়ে দাও। আমি সরাসরি ওখানেই চলে যাব।’

লোক দুজনকে বেরোতে দেখে, আরও ভালো করে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল
ভিজিনি।

‘ঠিকানা একদম সহজ। ওর বাড়িটা ভেঙ্গুরার অন্য দিকে। ভাইনল্যান্ড ধরে
এগিয়ে-’ আর কোনও কথা শোনা গেল না।

মিটিং! আটটার সময়! শক্ত হয়ে গেল ভিজিনি'র চোয়াল। সবাই ওর সাথে
তেড়িবেড়ি করছে। প্রথমে জ্যান রিহার্সেল বাতিল করে দিল। এখন ড্রিসকল
মিটিং করছে। নিশ্চয় উন্মাদিনী বাতিল করে ওকে ঠকাবার ফন্দি করছে সবাই।
নিউ ইয়র্কের লোকগুলোর ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না ও। তবে জ্যান...

জ্যান মেয়েটাকে হাতের মুঠোয় আনতে একদম কষ্ট হবে না।



একত্রিশ

‘আবার কুয়াশা জমতে শুরু করেছে,’ কনি জানালার দিক থেকে মুখ সরাল। ‘তুমি নিরাপদে থাকবে তো?’

‘দুশ্চিন্তা করো না,’ টেবিল থেকে চামড়ার কভারে বাঁধানো স্ক্রিন্ট তুলে নিল জ্যান। ‘ভিজিনি কী বলেছে, তা তো তোমাকে বলেছি। পল মরগ্যান আমার সাথে রিহার্সেল করবে। তাই কঠোর নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে।’

‘আমি তোমার মতিগতি বুঝি না।’ কনি মাথা বাঁকাল। ‘সারা বিকাল ধরে আমাকে বোঝালে, তুমি আর এসবের মধ্যে নেই... এখানে সুযোগ খুঁজতে গিয়ে কোনও লাভ নেই... ইত্যাদি। কিন্তু ভিজিনির ফোন পাওয়ার সাথে সাথে আবার গলে গেলে! এখনই ছুটে যাওয়ার দরকার কী? আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে বললেই হতো।’

‘তখনও আমরা রিহার্সেল চালিয়ে যাব।’ পার্স হাতে দরজার দিকে পা বাড়াল জ্যান। ‘বুবতে পারছ না? ছবির কার্যক্রম শিডিউল অনুযায়ী-ই এগোচ্ছ।’

কনি দরজা খুলে বাইরে বেরোল, কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে চারদিক। ‘চলো, তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।’

‘এটুকুই তো রাস্তা-’ জ্যান মৃদু হাসল। ‘ধন্যবাদ, কনি, এজন্যেই তোমাকে এতে পছন্দ আমার।’

গাড়িতে উঠে পড়ল জ্যান, ইঞ্জিন চালু করার শব্দ ভেসে এলো কনির কানে। সেই শব্দ ছাপিয়ে আরও জোরে চিংকার করল সে, ‘কথা দিচ্ছ কিন্তু, সাবধানে থাকবে।’

‘তুমিও সাবধানে থেকো।’
কনি মাথা নাড়ল। ‘চিন্তা করো না, তুমি ফেরার আগ পর্যন্ত আমি দরজায় তালা দিয়ে রাখব। আর যদি কিছু ঘটে যায়...’

‘কিছুই ঘটবে না।’ ব্রেক ছেড়ে দিয়ে গাড়িটাকে ড্রাইভওয়ে বরাবর নামিয়ে নিল জ্যান। হাত নেড়ে বিদ্যায় জানিয়ে কনিকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখা গেল, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ও।

কুয়াশা আরও ঘন হয়ে আসছে। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে জ্যান, আশেপাশে অন্য কোনও যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দারা বেধহয় আজ রাতটা নিজেদের বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে; পরিবারের সদস্যারা একসাথে আড়তায় মেটে উঠবে, বাচ্চারা টেলিভিশনের সামনে হই-হল্লোড় করবে। খোলা একটা গ্যারেজের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে এক ভুঁড়িওয়ালা লোককে দেখতে পেল

ও। টি-শার্ট পরা লোকটা যান্ত্রিক করাত হাতে কাঠ কাটছে; পাশেই একটা বেঢ়ের ওপর বিয়ারের ক্যান রাখা, একটা ডালমেশিয়ান কুকুর নীচে বসে মালিককে কাজ করতে দেখছে। পেছনের আরেকটা বাড়ি থেকে জোরে গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

‘আমি তোমার মতিগতি বুঝি না।’ কনির কথাটা কানে বেজে উঠল।

এখানে বোঝার কী আছে? জ্যান ভয় পেয়েছিল, পাবারই কথা-একটা উন্মাদ বিড়াল খুন করে বেড়াচ্ছে, এমন কথা শুনলে কে না ভয় পায়? তবে সেটা গত রাতের কথা। এরপর থেকে কোনও দুর্ঘটনার কথা শোনা যায়নি, উল্টোপাল্টা কিছু হবে বলেও মনে হচ্ছে না। আর হ্যাঁ, ইদানিং আশেপাশে উন্মাদ লোকের অভাব নেই, সাবধানে থাকাটা জরুরী। তবে সাবধানতা অবলম্বন আর বাড়াবাড়ি উদ্বেগের মাঝে পার্থক্যটা বুঝতে হবে; বন্ধ দরজার পেছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখে জীবন কাটানো স্বত্ব নয়।

এই সহজ কথাটাই কনি, রয় এবং ডা. ক্লেইবর্ন বুঝতে পারছেন না। শনিবার রাতটা চারদেয়ালের ভেতর আবন্দ অবস্থায় পার করতে চায় না জ্যান। নিজের জীবনকে উপভোগ করার জন্য কী করতে হবে, তা ওর জানা আছে।

ভিজিনি লোভী হতে পারে, তবে বোকা নয়। সিনেমার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলার খবর পেয়ে, সুর বদলেছে লোকটা। উন্মাদিনী ওর জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই জ্যানকে কুপ্রস্তাব দিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারবে না সে। মরগ্যনের সাথে রিহার্সেলের জন্য ডাকার ঘটনাটা থেকে সহজেই বোঝা যায়, ব্যবসায়িক দিকটা ওর মাথায় আছে।

আর নিরাপত্তার বিষয়ে মিথ্যা বলেনি সে। স্টুডিওতে ঢেকার মুখে, দু'জন লোককে গেটে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল জ্যান। কমবয়স্ক গার্ড বেশ সতর্কতার সাথে ওর স্টিকার পরীক্ষা করে ভেতরে চুক্তে ইশারা করল। গাড়ি পার্ক করার পর স্টেজ সেভনের রাস্তা ধরে এগোনোর সময় চাক ইসিংগার-কে দেখতে পেল ও, কাঁধের হোলস্টারে রিভলভার গুঁজে রাখা।

জ্যান হ্বিলি নিশ্চাস ফেলল; এবার আর বিপদের স্থাবনা নেই। আজ রাতে তো নয়ই, এমনকি আর কখনোই নয়। শুভ সময় আসলু...সবকিছুর জন্য এখন সে প্রস্তুত।

কুয়াশা ভেদ করে জ্যান দেখতে পেল, সাউন্ড স্টেজের বড়সড় দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা। পাশের ছোট দরজাটার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে স্যাটো ভিজিনি।

‘একদম সময়মতো এসেছ,’ সে বলল। ‘ভালো লক্ষণ, কী বল?’

জ্যান মাথা নাড়ল। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ভিজিনি’র সব কথায় সম্মত জানাবে, তবে একটু সাবধানে। নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে সবকিছু। ভীত বিড়ালের মতো হওয়া চলবে না-বিড়ালের কথা ভুলে যাও, নিজেকে বোঝাল সে। ওসব চিন্তা করে আর লাভ নেই, সবকিছু ঠিকঠাক আছে এখন।

ভিজিনি একপাশে সরে গিয়ে স্টেজের দিকে ইঙ্গিত করল।

জ্যান প্রবেশ করার পর, বন্ধ করে দিল দরজাটা।



বত্রিশ

ক্লেইবর্ন গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন।

পাহাড়ের ওপর কুয়াশা জমাট বেঁধে ভারী হয়ে আছে। অর্ধবৃত্তাকার ড্রাইভওয়েটার দিকে তাকালেন তিনি, সীমানার ওপারে কী আছে বোঝার কোনও উপায় নেই।

ক্লেইবর্ন ঘড়ি দেখলেন, আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। রয় অ্যামেস কোথায়?

হাতল ঘুরিয়ে জানালা নামালেন তিনি। আরেকটা গাড়ি এগিয়ে আসার শব্দ কানে এল, কিন্তু নাচের রাস্তায় কিছু দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পর তিনি খেয়াল করলেন, শীতে কাঁপতে শুরু করছেন। বাধ্য হয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন আবার।

অঁধার আর স্যাঁতসেঁতে কুয়াশার বিরক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে পাতলা কাঁচের জানালা। তবে কুয়াশার আড়ালে কী লুকিয়ে আছে, সে দুশ্চিন্তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। সেই দুশ্চিন্তা কুয়াশার চেয়ে শীতল, রাতের চেয়েও অন্ধকার। ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরম্যান। ওর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছেন তিনি। বুবাতে পারছেন, আশেপাশেই কোথাও অপেক্ষা করছে লোকটা।

কল্পনাশক্তি ক্ষতিকর নয়, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণহীন হতে দেয়া বড়ই ক্ষতিকর।

উপদেশ হিসেবে ভালো, তবে এর মানে কী? কল্পনা কাকে বলে, আর চিন্তাভাবনার সাথে তার পার্থক্য-ই বা কী? অনুভূতির মতোই একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কি এটা না?

তবে উত্তরটা তার জানা নেই। এতো বছর পরে এসেও তিনি সঠিকভাবে সবকিছু সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন না-ইঙ্গিত, বিভ্রান্তি, ভ্রম।

কজিতো, আর্গো সামঃ আমি ভবি, তাই আমি আছি। কিন্তু আমিটো আসলে কী? যুক্তি তর্ক দ্বারা পরিচালিত এক মানুষ? কিন্তু মানুষ তো আসলে যুক্তি সম্পর্ক প্রাণী নয়; অন্তত এতোদিনের অভিজ্ঞতা তাকে সেটাই শিখিয়েছে। মানুষ বেঁচে থাকে তার সহজাত প্রবৃত্তি আর অনুমানশক্তিকে কাজে লাগিয়ে, তিনি নিজেও এর ব্যতিক্রম নন।

নিজেকে সারানোর ক্ষমতা তার নেই, কারণ নিজেকে তিনি ঠিকমতো চেনেন না। চেতনাই মানুষের কাছে সব, তবে তা তো এক অস্থায়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি মাত্র; ঘুমের সময় আমরা তাকে হারিয়ে ফেলি, নেশাজাত দ্রব্য তার পরিবর্তন ঘটায়, আবেগের বশবর্তী হয়ে তার বিকৃতি সাধন করি, বিবেকের কাছে হার মেনে আত্মসমর্পণে বাধ্য হই। চেতনা আসলে পাতলা কাঁচের জানালাটার মতোই-বাইরের কুয়াশার বিরক্তি যা দুর্বল প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে রাখতে পারে। তবে কুয়াশার চিরন্তন অস্তিত্বকে মুছে দিতে পারে না।

যুক্তি, তাত্ত্বিক আলাপ আপাতত ভুলে যাওয়া যাক। কুয়াশার আড়ালে লুকাইত বাস্তবকে খুঁজতে হবে। ক্লেইবর্ন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, গতরাতের ঝাপসা কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দৃশ্য তার মানসপটে ভেসে উঠল। গাছের নীচে জড়সড় হয়ে থাকা বিড়াল, ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। জ্যানের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল নরম্যান, তার বদলে বিড়ালের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ধারালো অঙ্গ। কেন নয়? অন্ধকারে সব বিড়ালই ধূসর...

কাঁচের জানালায় ঠকঠক করে শব্দ হলো। তিনি ঘুরে তাকালেন, হাত সরে গিয়ে নীচু হয়ে থাকা একটা মুখের দেখা পেলেন।

‘শুনছেন? উঠে পড়ুন! বলল রয় অ্যামেস।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লেন ক্লেইবর্ন। ‘আমি ঘুমিয়ে পড়িনি,’ বললেন তিনি। একই সাথে নিজেকে তার চিন্তার স্বার্থকতা বোঝালেন, চেতনাকে হারিয়ে ফেলা করতোই না সহজ। অ্যামেস গাড়ি চালিয়ে এখানে এসেছে, তিনি ঘুনাক্ষরেও টের পাননি। কুয়াশার আড়াল থেকে যে কেউ বেরিয়ে আসতে পারতো, এমনকি নরম্যান-ও--

এসব চিন্তাবনাকে জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন, ‘আটটা দশ। তুমি দেরী করে ফেলেছ।’

‘সেজন্য দুঃখিত,’ অ্যামেস মুখ খুলল।

আজকের রাতটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে; ক্লেইবর্ন সামনের দরজার দিকে এগোতে শুরু করলেন। ‘ব্যাপার না। চলো ভেতরে যাই... অন্ততপক্ষে এক কাপ কফি তো খাওয়াবে ড্রিসকল।’

অ্যামেস তাকে অনুসরণ করল। পাশে দাঁড়িয়ে কলিংবেল চাপতেই ভেতর থেকে সুমধুর রিনিভিন শব্দ ভেসে এলো কানে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে রইল। আবার কলিংবেল চাপল অ্যামেস। রিনিভিন শব্দের প্রতিক্রিন্নি শোনা গেল আগের মতোই, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

‘এসবের মানে কী?’ অ্যামেস বিরক্ত হলো। ‘আপনার কী মনে হয়, আমাদেরকে ইচ্ছা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে?’

‘আমি সন্দিহান,’ ক্লেইবর্ন পর্দায় ঢাকা জানালার দিকে তাকালেন। ‘ভেতরে বাতি জুলছে।’

অ্যামেস মুঠ পাকিয়ে সজোরে ঘুষি মারল দরজায়। ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল দরজাটা, ভেতরের দিকে খুলে গেল।

‘খোলাই ছিল,’ বলল সে। ‘আসুন, ঢুকে পড়ি।’

ভেতরে পা দিতেই সাদা রেলিং দেয়া প্যাঁচানো সিঁড়ি চোখে পড়ল। দোতলা বাড়িটা তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। হলঘরের প্রবেশপথ আলোতে ঝলমল করছে।

রয় অ্যামেস মুখের কাছে দুঃহাত জড়ো করল, ‘কেউ আছেন?’

কোনও উত্তর নেই। তাই বলে নীরবতা বজায় নেই সেখানে; ডানপাশের দরজার ওপাশ থেকে মৃদু সুরে সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে।

‘আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না,’ ক্লেইবর্ন বললেন। ‘টেলিভিশন দেখছে বোধহয়।’

ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজন। কার্পেটে মোড়নো সিঁড়ি বেয়ে নীচের ডেনের দিকে এগোল। জায়গাটা একদম ফাঁকা, তবে ওয়াল স্ক্রিন চালু করা আছে। সেই সাথে ভেসে আসছে সিঙ্গোনি অর্কেস্ট্রার সুমধুর সুর, দ্য পাইনস অফ রোম।

‘আমাদের আগে কেউ এসেছিল এখানে।’ কফি টেবিলের পাশে সাজানো চেয়ারগুলোর দিকে দেখালেন ক্লেইবর্ন। টেবিলটা ঘরের একদম মাঝখানে, তার ওপর কয়েকটা গ্লাস আর ছাইদানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা।

‘যে-ই আসুক, সে আর এখানে নেই,’ কুয়াশায় ঢাকা কাঁচের দরজার ওপারে দেখার চেষ্টা করল অ্যামেস। ঘরের আরেক প্রান্তে ছেট্ট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ট্যালেটে আছে হয়তো।

নীচের হলঘর পেরিয়ে হাতের বামদিকে অবস্থিত বাথরুমের দরজা খোলা, সেখানেও কেউ নেই। উল্টোদিকের শোবার ঘরেরও একই অবস্থা।

অ্যামেস ভেতরে ঢুকে জাঁকালো সাজসজ্জা পর্যবেক্ষন করতে লাগল। ‘আয়নাগুলো দেখেছেন? জায়গাটাকে খেলাঘর বলে মনে হচ্ছে।’

ক্লেইবর্ন মাথা নাড়লেন। সুরে তাকাতে যাবেন, এমন সময় অ্যামেস হলঘরের দিকে পা বাড়ল। ঘরের দূরবর্তী প্রান্তে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। ডাক্তারকে পাশে দেখতে পেয়ে থেমে গেল সে। নীচের রান্নাঘরের দিকে তাকাল দুঁজন।

অন্যন্য ঘরের মতো, রান্নাঘরটাও বিশালাকৃতির এবং অতিমাত্রায় সুসজ্জিত। মেঝে থেকে শুরু করে স্তুপগুলোতে দামী ওক কাঠের কারুকাজ দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের তাক, কাপবোর্ড, কেবিনেট, সিঙ্ক, রেফিজারেটর-সবখানে ওক নির্মিত প্যানেল। ঘরের মৃদু আলোকসজ্জাকে যেন শুষে নিচ্ছে খয়েরি কাঠ। ওদিকে ঘরের মাঝখানে অবস্থিত তাকে ঝুলানো ধারালো ছুরি আর চামচের সারি থেকে আলো তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

চকচকে ধাতব সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে, স্টুডিও পপ ডিপার্টমেন্টের অক্ষসম্ভারের কথা মনে পড়ল ক্লেইবর্নের। তবে এখানকার ছুরিগুলো শুধুমাত্র সাজসজ্জার অংশ নয়, নকল নয় ওগুলোর নীচে অবস্থিত ওক কাঠের বিশাল ব্লকটাও।

সেকেলে ধাঁচের কসাইদের ব্লক এটা, একটা গরুর এক চতুর্থাংশ সহজেই আঁটানো যাবে। একপাশে ফেলে রাখা কাটারিটা সে কাজের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। অবশ্য কাজটা আগেই করে ফেলা হয়েছে।

কসাইয়ের ব্লকের ওপর রক্তাক্ত মাসের তালটা আসলে মার্টি ড্রিসকলের কাঁটা মাথা।



জ্যানকে স্টেজের আরেক প্রাণ্তে নিয়ে গেল স্যাটো ভিজিনি, শাওয়ার স্টলের সেটের বাইরে একটা ক্যাম্পার ভ্যান দাঁড় করিয়ে রাখা। দরজা খুলে ভেতরটা দেখাল সে।

‘তোমার ড্রেসিং রুম’

জ্যান ভেতরে উঁকি দিল। বড়সড় আয়না, কাউচ, আরাম কেদারা, ড্রেসিং টেবিল, কাপেটি বিছানো মেরো-এতো কিছু দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ।

‘ঝাকঝাকে পরিষ্কার।’

ভিজিনি মাথা নাড়ল। মেয়েটাকে সবকিছু গুছিয়ে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। বুরতে পারবে যে, যত্ন-আন্তির কোনও কমতি হচ্ছে না।

জ্যানের হাসি কিছুটা মলিন হয়ে এলো। ‘মরগ্যান কোথায়?’

‘পল যেকোনও মুহূর্তে এখানে এসে পড়বে। তুমি ততোক্ষণে পোশাক বদলে নিচ্ছ না কেন? আমি দেখে আসি, ও পৌছাল কি না।’

পার্স আর চামড়ায় বাঁধানো স্ক্রিপ্ট হাতে ক্যাম্পারে প্রবেশ করল জ্যান। ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর ফুলদানিতে তিনটা লাল গোলাপ রাখা।

‘ফুল!

‘পছন্দ করো না?’ ভিজিনি কাঁধ ঝাঁকাল। ‘তারকাদের ড্রেসিং রুমে সবসময় তাজা ফুল থাকা উচিত।’

জবাবের অপেক্ষা না করে নেমে গেল সে, স্টেজের দিকে পা বাঢ়াল। জানে যে, দরজাটা বন্ধ করে দেবে জ্যান।

সবকিছু পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে। হ্যাঁ, এখন বাতিল হয়ে যাবে উন্মাদিনী। কিন্তু তাতে কী? এখন ভিজিনি’র স্বপ্ন পূরণ হবার পথে। পরিচালকের কাজই তো তাই, স্বপ্নকে...কল্পনাকে সত্যিতে পরিগত করা। এখন পর্যন্ত সেই কল্পনাগুলোকে রূপালী পর্দায় বাস্তব করে তুলেছে ও। কিন্তু এখন...এখন হাতের কাছে পেয়েছে মৃত মেরি ক্রেনের চেহারা আর উষ্ণ জীবিত এক মেয়ের দেহ।

মানস চোখে ভিজিনি জ্যানকে দেখতে পেল, ড্রেসিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ছোট ছোট স্কার্ট আর টপস মোহনীয় কোমর আর সুগঠিত দেহকে ঢাকতে পারেনি। স্কার্টটা আন্তে আন্তে উপরে উঠবে...দৃশ্যটা কল্পনা করার সাথে সাথে, নিজের তলপেটে ছাড়িয়ে পড়া একটা উষ্ণতা টের পেল লোকটা। মামা মিয়া-

পার্শ্ব দরজা খুলে, কুয়াশার দিকে তাকাল সে। নিশ্চিত হয়ে নিল যে গার্ড চলে গিয়েছে। আগেই বলে রেখেছিল লোকটাকে। আমরা রিহার্সেল করব, কেউ বিরক্ত না করলে ভালো হয়। সন্দেহ করেনি কেউ। কে সন্দেহ করবে ওকে? মামা-ও করত না।

স্যান্টো খুব ভালো ছেলে, সবসময় বলত সে। এখনও বলছে, ভিজিনি যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে কঠটা। কুয়াশার মাঝে যেন দেখতেও পাচ্ছে সেই চেহারাটা, দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল ও। মহিলাকে আসতে দিবে না ও, কাউকেই দেবে না। ক্ষমতা এখন ওর হাতে।

ক্ষমতা।

ক্ষমতা ওকে উপহার দিয়েছে পিলগুলো। ওগুলো ওকে দিয়েছে নানা ধরনের কথা শোনার ক্ষমতা, দিয়েছে ওকে পরিষ্কার সব কিছু দেখার ক্ষমতা!

এই বিকাল থেকে আবার অ্যামিটাল পিলগুলো খাওয়া শুরু করেছে সে। কত গুলো তা মনেও করতে পারছে না। আসলে পরিকল্পনাটা বাদে আর কিছুই মনে করতে পারছে না। সেই পরিকল্পনার প্রথম ধাপই ছিল জ্যানকে ফোন করা।

তারপর থেকে ঝড়ের গতিতে ঘটতে শুরু করল সব ঘটনা। সব কিছু ঠিক করে নেবার পর যখন জ্যান এসে উপস্থিত হলো, থেমে গেল গতি। কিন্তু কপাল ভালো, মেয়েটা কোনও কিছু সন্দেহ করেনি। ঘটনা এখন পুরোপুরি ওর নিয়ন্ত্রণে।

ভুল হলো, ঠিক পুরোপুরি না। পিলগুলো যেন ক্যামেরার উপরেও প্রভাব ফেলেছে। কুয়াশার মাঝে মামার চেহারা দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে তার কষ্ট।

সব পাগল। পাগলাটে পিল, পাগলাটে ক্যামেরা। কিন্তু মামা মিয়া, আমি পাগল না।

না, ভিজিনি উন্নাদ নয়। কেননা ওর হাতেই এখন সব ক্ষমতা। যেই ক্ষমতা ওর তলপেটকে উষ্ণ করে তুলেছে।

প্রস্তুতি শেষে, ড্রেসিং রুমের দিকে এগোল স্যান্টো ভিজিনি।



চৌত্রিশ

রয় আমেসকে গলা কাটা লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখলেন ক্লেইবর্ন।

ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটেছে-প্রথমে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া রক্তাঙ্গ মাথা দেখে তাদের চোখ বিস্ফারিত হবার জোগাড়! তারপর আবার মুভুবিহীন ধড়ের দেখা পাওয়া। ক্লেইবর্ন পেশায় একজন চিকিৎসক; মৃত লাশ তিনি আগেও দেখেছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন পেশাদারিত্বের সাথেই। কিন্তু রয় অ্যামেস নিজের প্রতিক্রিয়ায় অবাক! ভয় অথবা আতঙ্ক ওকে গ্রাস করতে পারেনি, শুধু কিছুটা দুর্বল অনুভব করছে। এমনকি কষ্টস্বরেও কোনও পরিবর্তন আসেনি, কথা বলছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই।

‘তেমন রক্ত দেখতে পাচ্ছি না,’ সে বলল।

ক্লেইবর্ন মাথা নাড়লেন। ‘শরীরে কাটাছড়ার চিহ্ন নেই।’ উঠে গিয়ে কাঠের ঝুকটার সামনে ঝুকে দাঢ়ালেন তিনি। রয় উল্টোদিকে ঘুরে তার কথায় মনোযোগ দিল।

‘মাথার পেছনে আর পাশে প্রচুর ক্ষত দেখতে পাচ্ছি। কাটারির ভারী হাতল দিয়ে পেছন থেকে আঘাত করেছে কেউ। মেরেতে লুটিয়ে পড়ার আগেই মারা গিয়েছে ড্রিসকল। এরপর মাথা কেটে নেয়ার সময় ধমনী অথবা শিরা থেকে তেমন রক্তপাত হতে পারেনি—’

ডাঙ্কারের কথাটা বুঝতে পারল রয়। হ্রৎপিণ্ড থেমে গেলে, ক্ষতস্থান থেকে আর রক্ত ঝরতে পারে না। ক্রিপ্ট লেখার সময় এসব টুকটাক তথ্য সে ভালোভাবেই যাচাই করে নিয়েছিল। এই অংশটা গল্লের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষত্বের কারণেই নরম্যানকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনি; পোশাকে রক্তের ছিটাফোঁটা না থাকায় সে নিজেও সম্ভবত নিজেকে সন্দেহ করেনি। খুন করতে গিয়ে হাতে রক্ত লেগে যায়, তবে তা শুধু মৃতদেহকে স্পর্শ করার কারণেই হয়ে থাকে। খুব সহজেই ধুয়ে ফেলা যায় সেটা।

নিজেকে বেসিনের দিকে এগিয়ে যেতে আবিক্ষার করল সে। সাদা পোর্সিলিনের বেসিনটা এখন গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে। নীচের দিকে পানি গড়িয়ে যাওয়ার রাস্তাটা কালচে লাল হয়ে আছে। রক্ত...

‘কোনও সমস্যা?’ ক্লেইবর্ন পাশে এসে দাঢ়ালেন। হাত তুলে রক্ত জমাট বাঁধা জায়গাটার দিকে দেখাল রয়। ডাঙ্কার মাথা নাড়লেন, আর কিছু বুঝতে বাকি নেই। নরম্যান বহাল তবিয়তেই আছে, মাথা কেটে নিয়েছে ড্রিসকলের, আর এখন...

নিজেকে শান্ত করে মুখ খুলল রয়, ‘এখানে আসার আগে জ্যানের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ওর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। সেজন্যেই আমার আসতে দেরী হয়েছে। ওখানে গিয়ে কনিং সাথে দেখা হয়েছিল। ওর কাছে শুনলাম, ভিজিনির সাথে রিহার্সেল করতে আগেই বেরিয়ে গিয়েছে জ্যান।’

‘স্টুডিওতে?’ রয়ের হাত চেপে ধরলেন ক্লেইবর্ন। ‘কতক্ষণ আগে?’

‘আধ ঘন্টা হবে। এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা। আপনার কী ধারণা নরম্যান--?’

‘এই কথাটা আমাকে আগে বলোনি কেন?’ ক্লেইবর্ন ছুটে গেলেন দরজার দিকে। ‘পুলিশে ফোন করো, এখানে আসতে বলে দাও। তারপর স্টুডিওতে ফোন করে, জ্যান আর ভিজিনির সাথে যোগাযোগ করতে বল নিরাপত্তা কর্মীদের। আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর ওখানে পৌঁছে যাব।’

‘দাঁড়ান...’

কিন্তু হলঘরে ফিরে আসার আগেই, সামনে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল রয়। সিফোনি অর্কেন্টার শব্দকে ছাপিয়ে বাড়ির বাইরে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ কানে এল।

তাড়াতাড়ি টেলিভিশন বন্ধ করে দিল ও। আশেপাশে তাকাতেই দরজার পাশে ঘরের কোনায় একটা টেলিফোন সেট ঢোকে পড়ল। দোড়ে গিয়ে হাতে নেবার আগেই বাজতে শুরু করে দিল ফোনটা।

রয় রিসিভার তুলল। ‘হ্যালো,’ অপরিচিত একটা পুরুষ কর্ত শুনতে পেল। ‘মিস্টার ড্রিসকল?’

‘না’ তড়িঘড়ি করে উত্তর দিল রয়। ‘ফোন রেখে দিন, পিজ। এখুনি পুলিশকে ফোন করতে হবে।’

‘আপনি পুলিশের সাথেই কথা বলছেন।’

‘কী?’

‘মিল্ট অ্যাংস্ট্রাম, ফেয়ারভিলের কান্ট্রি শেরিফ। কার সাথে কথা বলছি আমি?’

রয় নিজের পরিচয় দিল। তারপর আবার বলল, ‘পিজ, ব্যাপারটা খুবই জরুরী। মিস্টার ড্রিসকল খুন হয়েছেন...’

‘খুন হয়েছেন! কীভাবে?’

‘আমি এখন কথা বলতে পারছি না...’

‘তাহলে ভালো করে শুনুন।’ রয়ের জবাবের জন্য অপেক্ষা করলেন না শেরিফ। ‘আমি সারা সন্ধ্যা ক্লেইবর্নের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছি। ডা. স্টেইনার আমাকে ড্রিসকলের ফোন নম্বর দিয়ে বলেছেন, ক্লেইবর্নকে এখানে পাওয়া যেতে পারে। যাই হোক, ওনার কাছে একটা খবর পৌঁছে দিতে হবে। বলবেন, আমরা বো কেলার-কে খুঁজে পেয়েছি।

‘কাকে খুঁজে পেয়েছেন?’

‘বো কেলার। সেই পথচারী, যাকে গত রবিবার ভ্যানে তুলে নিয়েছিলেন নান। ওর বর্ণনা অনুসারে, মহিলা নাকি লোহার রড দিয়ে তাকে মারতে এসেছিল। বেশ খানিকক্ষণ ধন্তাধন্তির পর নানকে পরান্ত করতে সক্ষম হয় সে। আত্মরক্ষার জন্য মেরে ফেলে মহিলাকে, তারপর ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওখান থেকে পালিয়ে এক বদ্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয় বো। বিবেকের তাড়নায় কাল রাতে পুলিশের কাছে ঘোষায় দ্বীকারোক্তি দিতে আসে। নান-কে খুন করার চিন্টাটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তবে এই নান যে আসলে নান নয়, তা তার জানা ছিল না।’

‘বুবাতে পারলাম না।’

‘আজ বিকাল পর্যন্ত আমরাও কিছু বুবাতে পারছিলাম না। অবশ্যে করোনার ডেন্টাল রেকর্ড মিলিয়ে লাশ সনাক্ত করার পর সবকিছু পরিষ্কার হয়েছে। ক্লেইবর্নকে জানাবেন, তার ধারণা ভুল ছিল। গাড়িতে খুঁজে পাওয়া লাশটা কোনও অজ্ঞাত পথচারীর নয়, এমনকি কোনও নানের-ও নয়। নরম্যান বেটসের দেহ ওটা।

রয়ের মনে হলো, ফোনটা ওর হাত থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। সবকিছু কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে চোখের সামনে। নরম্যান মৃত, তার মানে ড্রিসকল-কে খুন করেছে ভিজিনি।

আর লোকটা এখন জ্যানের সাথে আছে!



পঁয়ত্রিশ

ভিজিনিকে দরজা খুলতে দেখে, জ্যান চিত্রনাট্য বন্ধ করল।

‘আমি তৈরি।’ বলল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল জ্যান। ‘পল এসে পড়েছে?’

‘রাস্তায় আছে। ওকে ছাড়াই আমরা শুরু করতে পারি।’ চলার গতি বাড়িয়ে দিল পরিচালক। ‘আমি নরম্যানের অংশটা অভিনয় করব।’

জ্যান লোকটার দিকে চিত্রনাট্যটা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু মাথা নাড়ল ভিজিনি। ‘দরকার নেই। শাওয়ারের দৃশ্যটা করব আজকে। ওখানে তোমার বা ওর, কারও কোনও ডায়লগ নেই।’

‘প্রথমেই শাওয়ারের দৃশ্য?’

‘হ্যাঁ, ওটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই না?’

‘প্রমট কে করবে?’

‘আমি তোমাকে বলে দিব কখন কী করতে হবে।’ দেঁতো হাসি হাসল ভিজিনি। ‘তবে আগে তোমাকে কাপড় খুলে ফেলতে হবে।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও—’

‘ক্যামেরা যখন চলবে, তখন তোমার আচরণ কল্পনা করতে সুবিধা হবে এতে।’ এখনও মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়নি ওর।

‘ভুলে যাও, আমি তোমার সামনে কাপড় খুলছি না।’

‘বেহুদা নাটক করো না তো,’ হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছে। ‘আমি আগেও অনেক ন্যাংটা মেয়ে দেখেছি। আর তুমিও এই প্রথম কোনও পুরুষের সামনে কাপড় খুলছ না।’

‘তার সাথে রিহার্সেলের কী সম্পর্ক?’

‘সব কিছুই সম্পর্কযুক্ত।’ আলোতে এসে দাঁড়াল ভিজিনি। লোকটার চোখের ছোট ছোট হয়ে আসা চোখের মণি পরিষ্কার দেখতে পেল জ্যান। পরিচালক ওর দিকে এগিয়ে এলে, নাকে এসে তার পারফিউমের গন্ধ লাগল। সেই সাথে আরেকটা মিষ্টি গন্ধ। লোকটা কিছু একটা খেয়ে এসেছে।

‘তুমি নারী,’ বলল ভিজিনি। ‘আর আমি পুরুষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই—’

এক মুহূর্তের জন্য জ্যানের মনে হলো, হাসিটাকে আটকে রাখতে পারবে না ও। মনে মনে প্রশ্নটা করেই ফেলল সে, তোমার ডায়ালগগুলো কে লেখে? কিন্তু সেই মুহূর্তেই হাত বাড়িয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল ভিজিনি, ঠোঁট দুটো ফাঁকা হয়ে আছে। জ্যান মাথা সরিয়ে নিল, লোকটাকে চুমু খেতে দিতে চায় না। কিন্তু সাথে

সাথে বুঝতে পারল, পরিচালকের উদ্দেশ্য অন্য। তার হাত দুটো ওর পিঠে, ব্লাউজের ভাজগুলো আকরে ধরেছে। জ্যান বুঝতে পারল, কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে ব্লাউজের। এরপর ব্রাঁ'র উপর হাতের স্পর্শ অনুভব করল। এক মুহূর্ত পরেই ব্রাটা খুলে পরে গেল মাটিতে। চিৎকার করে লোকটার চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচা দেবার প্রয়াস পেল ও। কিন্তু মাথা সরিয়ে, ওর হাত ধরে ফেলল লোকটা।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে দিল হাতটা। নড়ার প্রয়াস পেল জ্যান, কিন্তু ভিজিনির ডান হাতের জোরালো এক থাপ্পড় খেয়ে টলে উঠল। এদিকে বাঁ হাতটা দিয়ে আঁকড়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলল ব্লাউজের সামনের দিকটা। শক্ত হাতে ভিজিনি খামচে ধরল জ্যানের বুক। এখনও সামলে উঠতে পারেনি, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখেছে-নোংরা হাতটা ওর বুকের উপর নড়চড়া করছে। হঠাৎ জ্যানের হাতে ধরা পড়ল একটা ফুলদানী। ওটাকে আকরে ধরে লোকটার মাথার পাশে আঘাত হানল ও। গোলাপের লাল পাঁপড়িগুলো ঝরে পড়ল শাওয়ারে। ভিজিনির মাথার পাশেও দেখা গেল লালের স্পর্শ। চিৎকার করে পিছিয়ে গেল সে।

দরজার দিকে দৌড়ে গেল মেয়েটা, নব আঁকড়ে ধরল। গতি না কয়িয়েই খোলা দরজা দিয়ে বের হলো ও, পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ওখানে যে একটা সিডির ধাপ আছে, সেটা ভুলেই গিয়েছিল। তীব্র ব্যথার একটা ঝলক যেন ওর ডান পা থেকে উরু পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল! গোড়ালি মচকে গিয়েছে না ভেঙে, তা বুঝতে পারছে না।

তবে তাতে কিছু যায় আসে না, পালাতে হবে জ্যানকে। ফৌপাতে ফৌপাতে নিজেকে মেঝে থেকে টেনে তুলল ও। সামনে এগোবে, এমন সময় পিঠে কিছু একটার আঘাত থেয়ে হৃদ্দি থেয়ে পড়ল। এবারের ব্যথাটা এতোটাই বেশি ছিল যে মনে হলো, জ্বান হারিয়ে ফেলবে। অনেক কষ্ট করে নিজেকে অজ্বান হবার হাত থেকে রক্ষা করল, কিন্তু ভিজিনির নোংরা হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না।

শক্তিশালী হাত জোড়া ছিঁড়ে ফেলল জ্যানের ক্ষাট, এক মুহূর্তে পর তার প্যান্ট। এরপর ওর চুল ধরে মাথাটাকে পেছন দিকে টানল ভিজিনি। মেয়েটা বুঝতে পারল, ওকে ঠাভা শীতল মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছে লোকটা। চোখ খুলে চেয়ে দেখল, ভিজিনির গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে! কিন্তু তাই বলে মুখ থেকে হাসিটা অদৃশ্য হয়ে যায়নি। হলদে দাঁত, আর মুখের দুই কোনা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকা লালা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ‘উঠে দাঁড়াও!’ আদেশ দিল সে।

‘পারছি না...আমার গোড়ালী...’

হাসি একদম মলিন হলো না ভিজিনির, উল্টা আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে টেনে তুলল মেয়েটাকে। ব্যথায় গুঙ্গিয়ে উঠল জ্যান। শব্দটা যেন আরও উত্তেজিত করে তুলল লোকটাকে। ‘বেশ্যা! মেয়েটার হাতের মাংস আঁকড়ে ধরল সে। ‘এগোও...’

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল জ্যান, কিন্তু ভিজিনি তা হতে দিলে তো! বাধ্য

হয়ে এগোল জ্যান। অন্দকার থেকে, আলোময় এলাকায় এসে উপস্থিত হলো ওর।
সেটের আলো-বাথরুম আর শাওয়ারের সেট!

পর্দা দিয়ে ঢাকা স্টলের দিকে ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভিজিনি। টাইলের
ওপরে আছড়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

‘ভেতরে যাও,’ আদেশ দিল সে। ‘আমি তোমাকে ভেতরে চাই।’

‘না।’ প্রতিবাদ জানাবার প্রয়াস পেল মেয়েটা। কিন্তু বুবাতে পারল, আহত
পশুর মতো কুইকুই করছে কেবল। এটাই চাচ্ছিল ভিজিনি। শাওয়ারের স্টলে
চোকার পর, আহত আর পরাজিত পশুর মতো আচরণ করা হবে ওর সাথে।
অসহায় জ্যানকে ধর্ষণ করবে ভিজিনি।

অসহায়! নাহ, জ্যান অসহায় নয়! ফুসফুস ভরে বাতাস টেনে নিল মেয়েটা।
দেহের সব শক্তি কাজে লাগিয়ে, মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। হাত মুক্ত
হওয়া মাত্র, ভিজিনির রক্তাক্ত মাথায় আঘাত হানা শুরু করল। গুঙ্গিয়ে টলে উঠল
ভিজিনি, নিজেকে সামলাবার জন্য আঁকড়ে ধরল ভারী পর্দাটা। বড় বড় করে
শ্বাস নিতে শুরু করল সে, দীর্ঘ একট সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো।

পরমুহৃত্তেই হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনে। ভয়ে ঘুরে দাঁড়াল জ্যান, কিন্তু
পালাতে পারল না। তার আগেই তীক্ষ্ণ নখগুলো কেটে বসল ওর কাঁধে। কিন্তু
সাথে সাথেই আবার ছেড়ে দিল।

আবারও ঘুরল মেয়েটা, থমকে গেল সাথে সাথে। ভিজিনি এখনও শাওয়ারের
দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখটা। ‘মামা মিয়া-’

আন্তে আন্তে মিইয়ে এল ভিজিনির গলা, মুখ খুবড়ে সামনের দিকে পড়ে গেল
লোকটা।

জ্যানের চোখে লোকটার দুই কাঁধের মাঝখান থেকে বের হতে থাকা রক্তের
ধারা ধরা পড়ল। ভিজিনির দেহের সাথে সাথে যখন ভারী পর্দাটা ছিঁড়ে গেল,
তখন স্টলে আশ্রয় নেয়া লোকটাকেও দেখতে পেল। হাতে ছেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে সে। লাফ দিয়ে সামনে এসে, জ্যানের গলায় ধরল ছুরিটা। চিংকার করে
উঠল ও। কিন্তু আওয়াজ ঢাকা পড়ল গুলির আওয়াজে।

শব্দ করে অ্যাডাম ক্লেইবর্নের হাত থেকে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ছুরিটা!



ছত্ৰিশ

ভয় পাচ্ছেন না ডা. স্টাইনার। ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই অবশ্য, ক্লেইবৰ্ন এখন একদম নিরীহ। লোকটার হাত থেকে গুলিটা বের করে নেয়া হয়েছে, ক্ষতটাও শুকাচ্ছে ভালোভাবে। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও কোনও অস্ত্র চালাবার সামর্থ্য হবে না তার, এমনকী ডান হাতটা দিয়ে কখনও একটা কলম পর্যন্ত ধরতে পারে নাকি সন্দেহ। অবশ্য এই ঘরটা থেকে কখনও বেরোতে পারবে বলেও মনে হচ্ছে না।

কোনও ট্রায়াল না হলেও, ঝামেলা কম হয়নি। অনেকগুলো কোর্ট অর্ডার আর শুনান্নির পর, স্টাইনার তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

ঘর, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন স্টাইনার। চারপাশে তাকালেন তিনি। ঘর বলতে ছোট একটা কিউবিকল, কয়েকটা প্লাষ্টিকের আসবাব, মেঝেতে আটকে রাখা একটা বিছানা আর একটা বৈদ্যুতিক বাতি। অন্তত পরিচিত তো জায়গাটা। অবশ্য সেটা ক্লেইবৰ্ন বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় লোকটা সব কিছু বুঝতে পারছে, তবে কখনও কিছু বলেন না তিনি। স্টাইনারকে চিনতে পারেন, তার সঙ্গও পছন্দ করেন। এই যেমন এখন, স্টাইনারকে দেখে হাসছেন ক্লেইবৰ্ন। অবশ্য এই হাসিটা সবসময় তার মুখে লেগেই থাকে। হাসিটাকে একটা বুহ হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি, দুনিয়ার কাছ থেকে নিজের সব রহস্য আর গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখেন।

স্টাইনার নড় করলেন, ‘হ্যালো অ্যাডাম।’

উত্তর পেলেন না। কেবল সেই হাসি আর নীরবতা!

বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন স্টাইনার। বসার আগেই বুঝতে পারছেন যে লাভ হবে না কোনও। কিন্তু তাই বলে তো আর হাল ছেড়ে দেয়া যায় না। এইটুকু ক্লেইবৰ্নের প্রাপ্ত্য।

‘যা হয়ে গেল তা নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে।’ বললেন তিনি। কিন্তু ক্লেইবৰ্নের চেহারার কোনও পরিবর্তন হলো ন। তবে চোখের দৃষ্টিটা একটু পরিষ্কার হয়ে এল যেন। হয়তো এবার তিনি বুঝতে পারবেন। স্টাইনারকে ধীরে ধীরে কথা বলতে হবে। তাদের মাঝখানের সম্পর্কটা এখন আর দুই ডাঙ্গারের সম্পর্ক নেই, বরঞ্চ ডাঙ্গার আর রোগীর সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। তবে সত্যটা বলতেই হবে তাকে। আর সত্যটা হলোঃ দীর্ঘদিন নরম্যানের চিকিৎসা করার কারণে, নরম্যানের মাঝে নিজের ছায়া খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন ক্লেইবৰ্ন। আন্তে আন্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বেটসের মাঝে। দুজনেই মাতৃহীন,

একা। নিজেদেরকে তারা এই হাসপাতালে আবন্দ বলে মনে করেন। হাসপাতালে কেইবর্ন। এসব কথা আগের সেশনগুলোতে হয়েছে। এবার আরেকটু সামনে এগোতে চান।

‘আমার ধারনা, কিছুদিন যাবার পর তোমার মনে হচ্ছিল-কেইবর্নের ভাগ্য, তার ভবিষ্যৎ এসব কিছু নির্ভর করছে নরম্যান বেটসের উপর। ওকে সুষ্ঠ করা, সেটাকে নিয়ে একটা বই লেখা এসব করে তুমি তোমার জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারবে। মানসিক সুস্থিতা নরম্যানকে মুক্তি দিবে, আর বইটা তোমাকে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যখন নরম্যান পালিয়ে গেল, তখন সাথে নিয়ে গেল তোমার সব পরিকল্পনা। সে পালিয়ে গিয়েছে, তোমাকে অনিদিষ্ট কালের জন্য এখানে বন্দি রেখে!

নিশ্চয় তখন থেকে শুরু হয়েছিল সমস্যাটা। তোমার মনে হচ্ছিল, এখান থেকে পালাতে হলে তোমাকে নরম্যানের মতো হতে হবে। আমি জানি, তুমি ওকে ধরতে উদ্বৃত্তি হয়ে ছিলে। কিন্তু অবচেতন মনে চাচ্ছিলে, ও যেন পালিয়ে যায়। তারপর যখন বেটসের পোড়া দেহটা দেখতে পেলে, তখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তোমার সব আশা। নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে।

মাকে ছাড়া চলতে পারত না নরম্যান, তাই সে তার মায়ের রূপ নিয়েছিল। তুমি নরম্যানকে মরতে দিতে পারো না, তাই ওর রূপ নিলে তুমি। শুরু হলো মাঝে মাঝে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা।’ কেইবর্ন যুথে মোনালিসার হাসি আর সেই সাথে স্ফিংসের নীরবতা। ‘ভ্যানে যখন দেহটাকে দেখতে পেলে, তখনও তাই হয়েছিল। নরম্যানের রূপ ধরে তুমি চলে গিয়েছিলে ফেয়ারভিলে, খুন করেছিলে লুমিস দম্পত্তিকে।’ একটু বিরতি নিলেন স্টাইনার। ‘য়ানা তদন্তের প্রতিবেদন আসার পর, তোমার গাড়ি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। লুমিসের দোকানের ক্যাশ রেজিস্টার থেকে চুরি হওয়া ডলারগুলো খুঁজে পেয়েছে ওরা। ঠিক ফ্লোর-বোর্ডের নিচে ছিল। মনে পড়ে?’

কেইবর্ন চুপ করেই রইলেন, হাসিটা এখনও মিলিয়ে যায়নি। ‘নোটগুলো তোমার গাড়িতে লুকিয়ে রাখার পর, জ্ঞান ফিরে পাও তুমি। এরপর দোকানে গিয়েছিলে। ভুল বললাম?’

উত্তর এল না কোনও। ‘চিত্রনাট্যটা তোমাকে বাধ্য করেছিল হলিউডে যেতে। কেইবর্ন হিসেবে তুমি চেয়েছিলে চলচ্চিত্রটা বানানো বন্ধ করতে। ইচ্ছা ছিল বুবিয়ে শুনিয়ে কাজটা করা। কিন্তু নরম্যান হিসেবে, খুন করতেও আপত্তি ছিল না তোমার।

হলিউডে থাকার সময়, নিজের উপর ভালোই নিয়ন্ত্রণ ছিল তোমার। তবে নরম্যানও ছিল তোমার সাথে। মেরি ক্রেনের মতো দেখতে জ্যান হার্পার, অকুঙ্গলের অনুকরণে বানানো সেট-এসব তার জন্য দায়ী। আমি ওখানকার

অনেকের সাথেই কথা বলেছি-রয় অ্যামেস, জ্যান আর মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টে থাকা অন্য মেয়েটা, এদের সাথে। ওদের বলা কিছু কথা আমাকে পুরো ঘটনাটা বুঝতে সাহায্য করেছে। তবে কিছুটা আন্দাজও আছে। এই যেমন সুপারমার্কেটে তোমার নরম্যানকে দেখতে পাওয়া। হয়তো ভিজিনিকে দেখতে পেয়েছিলে, হয়তো দৃষ্টিভ্রম ছিল। তবে ওই ঘটনার পর থেকে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিলে। প্রথমে জ্যানের সাথে ঝগড়া হলো, এরপর নরম্যান হয়ে হত্যা করলে বিড়ালটাকে।

তবে নরম্যানের সময় ফুরিয়ে আসছিল। সেই সাথে সব ধরনের অযৌক্তিক আচরণ করতে শুরু করেছিলে। চলচ্চিত্রটাকে বন্ধ করতেই হতো নরম্যানের। সেজন্য প্রজেক্টর সাথে জড়িত সবাইকে খুন করতেও আপত্তি ছিল না তার।

টম পোস্টের সাথে ডিনার খাবার প্ল্যানটা ক্যাপ্সেল করেছিলে তুমি। আসলে তুমি না, করেছিল নরম্যান। এরপর ড্রিসকলের বাড়িতে গিয়ে সে তাকে খুন করে। যখন রয় অ্যামেস ওখানে গিয়ে পৌঁছায়, তখন ক্লেইবর্নকে সেখানে দেখতে পায়। কিন্তু আবার ভিজিনি আর জ্যানের কথা শোনার সাথে সাথে নরম্যান স্টুডিওতে ছুটে যায়। বাকিটা তো সবার জানা। অ্যামেস যদি পুলিশকে নিয়ে সময়মতো উপস্থিত না হতো তাহলে...’ চুপ করলেন স্টাইনার। ক্লেইবর্নের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি এখনও হাসছেন!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্টাইনার। ‘পরে আবার কথা হবে।’ বলতে বলতেই বুঝতে পারলেন, আরও একবার কেন, হাজারবার কথা বলেও কোনও লাভ হবে না। ক্লেইবর্নের হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা নৃশংসতাকে স্পর্শই করতে পারেননি তিনি। হয়তো এই নৃশংসতার কোনও ওষুধ নেই, হয়তো...হয়তো এই সমস্যার কোনও সমাধান নেই। কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়বেন না তিনি। যতক্ষণ শ্বাস আছে, চেষ্টা করে যাবেন।

‘দেখা হবে।’ বললেন তিনি।

তখনও হাসছেন ক্লেইবর্ন।



সাহিত্যিক

ক্লেইবন্রের কানে স্টাইনারের বলা একটা শব্দও প্রবেশ করেনি। আর স্টাইনার চলে যাবার পর থেকে কেবল নিজের অস্তরাত্মার কথাই শুনছেন তিনি।

তিনি অ্যাডাম ক্লেইবন...অ্যাডাম...প্রথম মানব। ক্লেইবন...কাদা থেকে যার জন্ম।

ঈশ্বর তাকে নিজ হাতে বানিয়েছেন। ঈশ্বর সবাইকে বানিয়েছেন, এমনকী নরম্যান বেটসকেও!

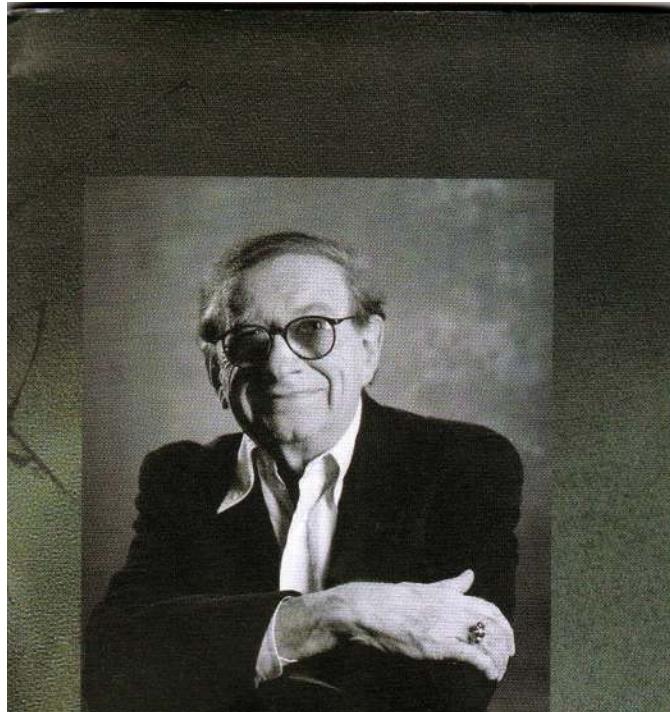
আমরা সবাই তার স্তান। আমি...নরম্যান...আমরা সবাই। একসময় ওকে আমিই দুনিয়ার হাত থেকে আগলে রেখেছিলাম। আমরা সবাই ভাই ভাই...এটা আমার না, ঈশ্বরের কথা! ঈশ্বরের সব কথা আমাদের মানতে হবে।

ঈশ্বর বলেছেন, প্রতিশোধ কেবল আমার জন্য। কেবল আমিই তা নেবার ক্ষমতা রাখি।

ক্লেইবন মারা যেতে পারে, তবে নরম্যান বেঁচে থাকবে। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন।

কেননা সে অশুভ বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অন্ত।

নরম্যান বেটস অমর...



স্বনামধন্য আমেরিকান লেখক রবার্ট অ্যালফ্রেড
ব্রকের জন্ম ১৯১৭ সালে, শিকাগোতে।
তার পিতা, রাফায়েল ব্রক ছিলেন পেশায়
ব্যাক্সের ক্যাশিয়ার। মা স্টেলা লোয়েব
সোশ্যাল ওয়ার্কার। শতাধিক ছোট গন্ত
আর বিশটিরও বেশি উপন্যাসের রচয়িতা
এই লেখকের পারদর্শিতা রয়েছে সব
জনরাতেই-ক্রাইম ফিকশন, সায়েন্স ফিকশন,
হরর ইত্যাদি। এইচ পি. লাভক্রাফটের
শিষ্য এই লেখক তার ‘সাইকো’ বইটির
জন্য অমর হয়ে আছেন।

এছাড়াও তার অন্যান্য রচিত বইয়ের মাঝে
আছে সাইকো-২, সাইকো হাউজ, আমেরিকান
গথিক, ফায়ারবাগ ইত্যাদি।

১৯৯৪ সালে, ক্যাসারে আক্রমিত হয়ে মারা
যান এই বিখ্যাত লেখক।

পেশার ডাক্তার, মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
জন্মগ্রহণ করেন সিরাজগঞ্জ শহরে। এরপর
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ঢাকা
রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ থেকে পাশ
করার পর ভর্তি হন শের-ই-বাংলা মেডিকেল
কলেজে। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী
হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

লেখালেখি শুরু করেন শখের বশে। রহস্য
পত্রিকায় তার অনুদিত বেশ কিছু ছোটগল্প
প্রকাশ পাবার পর, প্রথম অনুদিত বই
হিসেবে প্রকাশিত হয় ‘ট্রল মাউটেন’।

তারপর একে একে প্রকাশ পায়-
‘স্টেরিজ’, ‘স্যান্ডস্টেম’, ‘রামেসিসঃ সান
অফ লাইট’, ‘আর্টেমিস ফাউল’ এবং
মৌলিক রচনা ‘রাত এগারটা’। সাইকো-২
তার সপ্তম অনুবাদগ্রন্থ।

